॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

1785

ভাগবতের মণিমুক্তো

भागवतेर मणिमुक्तेर (बँगला)

গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

1785

ভাগবতের মণিমুক্তো

भागवतेर मणिमुत्को (बँगला)

গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর

Books are also available at–

1. **Gobind Bhavan**
   151, Mahatma Gandhi Road, Kol- 7
   Phone : 2268-6894 / 0251
2. **Howrah Station**
   (a) Opposite to 1-2 P.F. & Ticket counters.
   (b) (P.F. No. 23) New Complex
3. **Sealdah Station** (Near Main Enquiry)
4. **Kolkata Station**
   (P.F. No. 1, Near Over Bridge)
5. **Asansol Station**
   (P.F. No.5, Near Over Bridge)
6. **Kharagpur Station**
   (P.F. No. 3)
7. **Dum Dum Station**
   (P.F. No. 2/3)

Ninth Reprint 2019 3,000

Total 43,000

❖ **Price : ₹ 30**

(Thirty Rupees only)

Printed & Published by :

Gita Press, Gorakhpur—273005 (INDIA)

(a unit of Gobind Bhavan-Karyalaya, Kolkata)

Phone : (0551) 2334721, 2331250, 2331251

web : **gitapress.org** e-mail : **booksales@gitapress.org**

Visit gitapressbookshop.in for online purchase of Gitapress publications.

॥ শ্রীহরিঃ ॥

নিবেদন

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩১।৯)

হে প্রভু ! তোমার কথামৃত অমৃতস্বরূপ ; সংসার-তাপ দগ্ধ জীবের জন্য জীবনস্বরূপ। তাই ব্রহ্মাদি তত্ত্বদর্শীগণ তা সর্বোৎকৃষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন। তা পাপনাশক ও সন্তাপ-নিবারক। কথামৃত শ্রবণমাত্রেই জীবের মঙ্গল হয়—তাদের পরম কল্যাণ হয়। তোমার কথামৃত বিস্তারের সৌন্দর্য অনুপম ও সুমধুর। তোমার সেই লীলাকথা কীর্তনকারী জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

'ভাগবতের মণিমুক্তো' সেই কথামৃতের কণিকামাত্র। তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমলে নিবেদিত হল।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৭৩।১৬)

প্রণত জনগণের ক্লেশনাশক হে শ্রীকৃষ্ণ ! বাসুদেব, শ্রীহরি, পরমাত্মা, গোবিন্দ আদি অনন্ত নামধারীকে বার বার নমস্কার করি।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

অরুণদেব ভট্টাচার্য

ভূমিকা

ভোগবাদ ও স্বার্থপরতা যখন এই যুগের মানুষকে সংক্রামক ব্যাধির মতো আক্রমণ করে চলেছে তখন এর প্রতিষেধকরূপে আমাদের দেশের প্রাচীন মূল্যবোধকে জাগরিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে গীতা প্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারের উদ্যোগ দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। সেই প্রয়াসেরই নবতম অবদান এই **'ভাগবতের মণিমুক্তো'** গ্রন্থটি। গ্রন্থকার শ্রীঅরুণদেব ভট্টাচার্য মহাশয় এর মধ্যে ভাগবতের কিছু বিখ্যাত উপাখ্যান তথা উপদেশ তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। আশা করি পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে।

—প্রকাশক

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচীপত্র

॥ শ্রীহরিঃ ॥

প্রাক্‌কথন

নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ সুদীর্ঘকাল ধরে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করছিলেন। সেই স্থানে রোমহর্ষণ-পুত্র সূত উগ্রশ্রবার আগমন হয়েছিল। সূত বক্তারূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। উপস্থিত ঋষিগণ তাঁর কাছে শ্রীহরির কথা শুনতে চাইলেন। ভগবৎ কথায় প্রীতি আছে জেনে ঋষিগণকে যে শ্রীহরিকথা সূত উগ্রশ্রবা শুনিয়েছিলেন তাই শ্রীমদ্ভাগবত।

মহামতি, অশেষ-বুদ্ধি ব্যাসদেব ভাগবতের রচনাকার। ব্যাসদেব সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে তিনি বেদান্তসূত্র, মহাভারত, পদ্মপুরাণ আদি সতেরোটি পুরাণ রচনা করে তৃপ্ত হতে না-পেরে সর্বশেষে ভাগবত রচনা করেন। অতএব ধরা যেতে পারে যে ভাগবত সকল পুরাণের সারবস্তুর সমন্বয়ে রচিত। ভাগবত রচনা করে ব্যাসদেব তাঁর আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী ও পরম ভক্ত পুত্র শুকদেবকে তা শিক্ষা দেন। সূত সেই ভাগবতকথাই শৌনকাদি ঋষিগণকে বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সূত বলেছেন—

বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।২৯)

'জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই লাভ করা যায়, তপস্যা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্যই করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্যই সমস্ত ধর্মানুষ্ঠান করা হয় আর সমস্ত গতিই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত।' অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হলেন এই

মহাপুরাণের হৃদয়। শ্রীহরির নাম ও তাঁর যশ কীর্তনই ভাগবতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ভাগবত একাধারে বেদান্ত সিদ্ধান্তের আকর ও বেদান্তবেদ্য তত্ত্বকে সরস ভক্তিরসে সিক্ত করে রাগানুরাগ ভক্তিরূপে সহজলভ্য সুমিষ্ট ফল। বেদবৃক্ষের এই সুমিষ্ট ফলের রসাস্বাদন কেবলমাত্র শুকচঞ্চু দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। শুক যে সুমিষ্ট ফল ছাড়া অন্য ফলে চঞ্চু প্রহার করে না তা সর্বজনবিদিত।

অতএব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠা প্রাসঙ্গিক যে সূত উগ্রশ্রবা তা হলে শ্রীমদ্ভাগবত জানলেন কেমন করে ? এই তথ্যের মূলে গমন করে আমরা জানতে পারি যে মহাত্মা শুকদেব যখন ভাগবতকথা মৃত্যুপথযাত্রী পরীক্ষিৎকে শোনাচ্ছিলেন তখন সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন সূত উগ্রশ্রবাও। সভাতে অন্য ব্যক্তিগণের মধ্যে শুকদেবের পিতা শ্রীমদ্ভাগবত রচনাকার ব্যাসদেব ও পিতামহ পরাশরও উপস্থিত ছিলেন। পরমহংস চূড়ামণি শুকদেবের কৃপায় সূত উগ্রশ্রবার মাধ্যমে সেই সুমিষ্ট ফলের রস আজ ভক্তদের হৃদয়ে ভাগবতধারা রূপে সঞ্চালিত। আমরা জানি ভক্তগণ ভগবানকে দর্শন করেন সাধারণত মন্দিরে গিয়ে। মন্দিরে গিয়ে শ্রীভগবানকে দর্শন করতে হলে কিছু রীতিনীতি পালন করতেই হয়—মন্দির খোলা থাকবার সময়ে স্নানাদি করে পবিত্র হয়ে যেতে হয়। মন্দির পর্যন্ত গিয়ে শ্রীবিগ্রহকে দূর থেকে দর্শন করতে হয়, কিন্তু ধারাপ্রবাহ বা ভাগবতগঙ্গায় অবগাহন করবার জন্য এইসকল কিছুই প্রয়োজন হয় না। গোমুখ থেকে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভাগবতগঙ্গায় অবগাহন করবার জন্য যে কোনো স্থানে যাওয়া যায় অর্থাৎ তা সর্বত্র উপলভ্য। তার সঙ্গে দূরত্ব থাকে না, কোনো বিশেষ সময়ে যেতে হয় না আর বিশুদ্ধ হয়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই নেই, অবগাহনেই বিশোধন হয়ে যায়। এমনই মাহাত্ম্য এই ভাগবতকথার যা ধারারূপে কর্ণপথেই ভক্তগণ পান করে থাকেন।

চক্রবর্তী সম্রাট পরীক্ষিৎ পাণ্ডবদের পৌত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন অশেষ গুণসম্পন্ন ও পরমভাগবত মহাভক্ত। এই পরীক্ষিৎকেই মার্তগর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে রক্ষা করেছিলেন। শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে সেই দুর্নিরোধ্য ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল। অতএব পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভেই

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেছিলেন। ধৈর্যশালী, পরমভক্ত, সর্ববিদ্যায় পারদর্শী পরীক্ষিৎ ধর্মানুসারেই রাজ্যপালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন জনমেজয় আদি রাজর্ষিদের জনক ও ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘনকারীদের শাসনকর্তা। এমন সর্বগুণাধার পরমভাগবত, জনমনোরঞ্জনকারী মহারাজ পরীক্ষিৎও একটি ভুল করে মুনিপুত্রের অভিশাপের মুখে পড়েন।

একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ ধনুর্বাণ নিয়ে মৃগয়া করতে বনগমনের পূর্বে তাঁর রত্নভাণ্ডারে প্রবেশ করেছিলেন। রত্নভাণ্ডারে অন্যান্য বস্তুসকলের সঙ্গে একটি সুবর্ণ নির্মিত কিরীটও ছিল। সেই কিরীট ছিল জরাসন্ধের যা মহারাজ পরীক্ষিতের পিতামহ মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন জরাসন্ধ বধের সময়ে অনুচিত ভাবে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। সেই কিরীট মস্তকে ধারণ করে পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় গমন করলে তাঁর মধ্যে জরাসন্ধের রজোগুণের সংক্রমণ হয়েছিল। মৃগয়ায় হরিণের অনুসরণ করতে করতে তিনি ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। জলাশয়ের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে তিনি শমীক ঋষির আশ্রমে উপনীত হন ও ঋষিকে নিমীলিত নয়নে শান্তভাবে আসনে উপবিষ্ট থাকতে দেখেন। রাজা পরীক্ষিৎ তাঁর কাছে জল প্রার্থনা করে কোনো সাড়া পেলেন না। সামান্য ভদ্রতা, উপবেশন করতে অনুরোধ, সাদর অভ্যর্থনা—এই সকলের একান্ত অভাব রাজা পরীক্ষিৎকে ক্রোধান্বিত করল। ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর মহারাজ পরীক্ষিৎ ক্রোধ ও মাৎসর্য দ্বারা পরিচালিত হয়ে ঋষিকে অপমান করবার উদ্দেশ্যে ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা একটি মৃত সর্প মাটি থেকে তুলে ঋষির গলায় পরিয়ে দিলেন। জরাসন্ধের কিরীট ধারণের প্রভাবে তাঁর এই মহাপরাধ হয়ে গেল। শমীকনন্দন শৃঙ্গী যখন জানলেন যে রাজা তাঁর পিতাকে অপমান করেছেন, তখন তিনি ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে কৌশিকী নদীর জলে আচমন করে তাঁর বজ্রতুল্য অভিশাপ-বাক্য উচ্চারণ করলেন। তাঁর অভিশাপে মহারাজ পরীক্ষিতের সপ্তম দিবসে তক্ষক দংশনে মৃত্যু ধার্য হয়ে গেল।

শমীক ঋষি কিন্তু পুত্রের এই আচরণ সমর্থন করলেন না। তিনি পুত্রকে বললেন যে সামান্য অপরাধে এত বড় শাস্তির প্রয়োজন ছিল না। মহারাজ পরীক্ষিৎকে তিনি ঘটনা-বিবরণ দূত দ্বারা অবহিত করালেন। মহাযশস্বী ও

ভক্তচূড়ামণি মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন রাজধানীতে ফিরে এসে কিরীট খুলে রেখেছিলেন। নিন্দিত কৃতকর্মের জন্য তখন তিনি অনুতপ্ত। ক্ষণিকের জন্য ক্রোধান্বিত হওয়ায় তিনি নিরপরাধ ও প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ব্রাহ্মণের প্রতি যে অনার্যোচিত ব্যবহার করেছেন তা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। এমন সময়ে শমীক ঋষি প্রেরিত দূত তাঁকে ব্রহ্ম অভিশাপের কথাও নিবেদন করল। অভিশাপ তাঁর মঙ্গলপ্রদ বৈরাগ্যের মূল কারণ হয়ে দাঁড়াল। তিনি ঐহিক সুখ ও স্বর্গসুখ পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ জ্ঞানে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করলেন। রমণীয় তুলসী বিমিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণচরণরেণুধারী গঙ্গাবারি ত্রিলোকের পবিত্রতা প্রদানকারী ও মৃত্যুপথযাত্রীর পরম আশ্রয়স্থল।

গঙ্গাতীরে আমরণ অনশনের সংকল্প নিয়ে তিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করে শম-দমাদি ব্রতধারণ করে অনন্যচিত্তে শ্রীগোবিন্দ চরণকমল ধ্যানে প্রবৃত্ত হলেন। সেই সময় ত্রিলোকপাবন মহানুভব ঋষিমুনিগণ তাঁদের শিষ্যমণ্ডলীসহ সেই স্থানে সমবেত হলেন। বিশিষ্ট মুনিগণকে সমাবিষ্ট দেখে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রত্যেকের যথাযোগ্য অর্চনা করে ভূলুণ্ঠিত হয়ে তাঁদের প্রণাম করলেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, দেবল, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ব্যাস আদি মহাঋষি পরিশোভিত এই বিশাল সমাবেশে দিব্যজ্যোতি ব্যাসনন্দন ভগবান শুকদেবের আগমন হল। সকলে সেই দিগম্বর অবধূতকে আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন। সকলের দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে শুকদেব রাজপ্রদত্ত শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করলেন। সেই মহাসনে উপবিষ্ট হয়ে সুমহান ভগবান শুকদেব ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিদের মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে শুক্রাদি গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকা পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মতন শোভা পেতে লাগলেন। শুকদেব শান্তভাবে আসনে উপবিষ্ট হলে পরম ভাগবত পরীক্ষিৎ তাঁর সম্মুখে এসে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন। তিনি মহাত্মা শুকদেবের কাছে জানতে চাইলেন যে আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির করণীয় ও শ্রীকৃষ্ণলাভরূপ পরমসিদ্ধির স্বরূপ ও সাধন কী ? মহাত্মা শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাই সূত উগ্রশ্রবা পরে শৌনকাদি ঋষিদের যজ্ঞস্থলে শ্রীমদ্ভাগবত রূপে বিতরণ করেছিলেন। গঙ্গাতীরের সেই

শুকদেব কথিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রুতিধর সূত উগ্রশ্রবা কৃপা করে ভক্তদের পান করিয়েছিলেন যা আগামী দিনে ভক্তিপথের পথিকদের আকর গ্রন্থ ও মহাপুরাণরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

গঙ্গাতীরে গীত এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ, যমুনাতীরে অভিনীত শ্রীকৃষ্ণের অনুপম লীলার বিবরণে সমৃদ্ধ। আবার যদি আমরা সেই সৃষ্টির স্থান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই তবে দেখব যে তা ব্যাসদেব দ্বারা সরস্বতী নদীর তীরে সৃষ্ট। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিবেণী সঙ্গমের মহিমা বর্তমান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বৃন্দাবনলীলার শেষে মথুরা গমনের সময়ে তাঁর ভক্ত গোপিনীদের কথা দিয়েছিলেন যে তিনি লীলার সমাপনে আবার তাঁদের কাছে ফিরে আসবেন। তাই শোনা যায় যে দ্বারকালীলা অবসানে তিনি বৈকুণ্ঠে গমন না করে শ্রীমদ্ভাগবতে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীহরির বাঙ্ময় শরীররূপে ভক্তদের কাছে পূজার্চনা পেয়ে থাকে। দ্বাদশ স্কন্ধবিশিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারী রূপে দেখা হয়ে থাকে। গিরিধারী রূপে আমরা দেখে থাকি যে শ্রীভগবানের দক্ষিণ হস্ত কটিতে থাকলেও বাম হস্ত সব থেকে উপরে গিরিগোবর্ধন ধারণ করে আছে। তাই দ্বাদশ স্কন্ধযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের এক একটি স্কন্ধকে শ্রীভগবানের দেব শরীরের এক এক অঙ্গরূপে গণনা করা হয়। প্রথম থেকে দ্বাদশ স্কন্ধ তাই শ্রীভগবানের যথাক্রমে দক্ষিণ পাদ, বাম পাদ, দক্ষিণ ঊরুদেশ, বাম ঊরুদেশ, দক্ষিণ কটিদেশ, বাম কটিদেশ, দক্ষিণ হস্ত, দক্ষিণ স্কন্ধ, বাম স্কন্ধ, হৃদয়, ললাট ও বামহস্ত রূপে পরিচিত। তাই দ্বাদশাঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবান স্বয়ং — যাঁর অন্তঃকরণ হল দশম স্কন্ধ। অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকবিশিষ্ট এই মহাপুরাণে আছে ৩৩৫ অধ্যায়। সর্বত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ মহিমায় বর্তমান। তাই এর স্পর্শলাভ করলেই পবিত্রতা অর্জন সুনিশ্চিত।

ভাগবত-ভক্ত-ভগবান এক ও অভিন্ন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীভগবানের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।

(৯।৪।৬৮)

'আমার প্রেমী ভক্ত আমার হৃদয় এবং সেই প্রেমী ভক্তদের হৃদয় আমি স্বয়ং। তারা আমাকে ছাড়া আর কিছু জানে না আর আমিও তাদের ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না।'

বিশাল শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের আদি ও অন্তে আমরা দেখি **'সত্য পরং ধীমহি'**—অর্থাৎ পরমসত্যরূপ পরমাত্মাকে আমরা ধ্যান করি। তাই এই আকর গ্রন্থের মূল বক্তব্য—পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, যা সর্বত্র গীত হয়েছে। তাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল—শ্রীভগবান ছাড়া জগতে আর কিছুই নেই। তিনি **'সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি'** নিজে বলেছেন।

যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮।৭৮)

তাই মানবজন্ম সফল করতে প্রয়োজন ভগবৎকৃপা ও পুরুষকার যা তাঁর কৃপাতেই লাভ করা সম্ভব। তাই শ্রীভগবানকে বারে বারে প্রণাম নিবেদন করা। মনে রাখতে হবে প্রণামে জ্ঞানযোগ (মস্তকের), কর্মযোগ (হস্তের) ও ভক্তিযোগের (চিত্তের) সমন্বয় হয়ে থাকে। মস্তক অবনত হয়, হস্তদ্বয় যুক্ত হয় আর চিত্ত প্রণত হয়। তাই যোগেশ্বরকে স্মরণ যোগত্রয়ের সমন্বয়েই হয়ে থাকে।

মহাত্মা শুকদেবের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে মহাভাগবত পরীক্ষিৎ যোগারূঢ় হয়ে সপ্তম দিবসান্তে তক্ষক দংশনে ভস্ম হয়ে শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলিত হয়ে গিয়েছিলেন। পরীক্ষিৎ পরম ভাগ্যবান ছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে তিনি মাত্র সাত দিন বেঁচে থাকবেন ; অন্য কোনো জীব তা জানতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁকে মুক্তির পথে নিয়ে গিয়েছে যা আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ। জয়-বিজয়কে উদ্ধার করবার জন্য তিনি অবতাররূপে তিনবার এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। ভক্তের জন্য তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। তিনি চান ভক্ত যেন তাকে মনে রাখে।

॥ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥

———o———

শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য

তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে এক অনুপম সুন্দর নগরে সর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আত্মদেব বাস করতেন। ধুন্ধুলী ছিলেন তাঁর পত্নী। পত্নীর অনেক গুণের মধ্যে একটি দোষ ছিল যে তিনি ক্রূর স্বভাবসম্পন্না ছিলেন। অর্থ ও ভোগবিলাসের কোনো অভাব না থাকা সত্ত্বেও তাঁদের গৃহস্থজীবনের অশান্তির মূল কারণ ছিল সন্তানের অভাব। পুণ্যকর্ম ও দানাদি কর্মসকল কোনোভাবেই তাঁদের এই অভাব মোচন করতে সমর্থ হল না। তখন ব্রাহ্মণ অতিশয় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একদিন গৃহত্যাগ করে বনগমন করলেন। অরণ্যে এক জলাশয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে ব্রাহ্মণ সেইখানেই বসে রইলেন। বহুক্ষণ পরে জলাশয়ে এক সন্ন্যাসীর আগমন হল। তৃষ্ণা নিবারণান্তে সন্ন্যাসী বিষণ্ণ ব্রাহ্মণকে উপবিষ্ট দেখলেন।

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করে ব্রাহ্মণের বিষণ্ণতার কারণ জানলেন। তিনি যখন জানালেন যে ব্রাহ্মণের প্রারব্ধ অনুসারে আগামী সাতজন্ম সন্তান লাভের সম্ভাবনা নেই, তখন ব্রাহ্মণও জানালেন যে এই জন্মেই সন্তানের ব্যবস্থা না করতে পারলে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন। ব্রাহ্মণকে কোনোভাবে সন্তুষ্ট করতে না পেরে সন্ন্যাসী তাঁকে একটি ফল দিয়ে বললেন—'এই ফলটি তুমি তোমার স্ত্রীকে খাইয়ে দিলে তার এক পুত্রসন্তান জন্ম নেবে।'

সন্ন্যাসী চলে গেলে সেই ফল নিয়ে ব্রাহ্মণ গৃহে এলেন ও স্ত্রীকে ফল দিয়ে খেতে বললেন। কুটিল স্বভাব স্ত্রী অদ্ভুত সকল যুক্তি উদ্ভাবন করে ফল নিজে খেলেন না আর নিজ ভগিনীর সঙ্গে কথা বলে স্থির করে নিলেন যে সন্তানসম্ভবা ভগিনী সন্তান জন্ম দিলে সেই সন্তানকে নিজ সন্তানরূপে পতিকে দেখাবেন। ভগিনী এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে জানালেন যে তিনি নিজ সন্তানকে মৃত বলে প্রচার করে ধুন্ধুলীর গৃহে এসে শিশুকে লালন পালন করবেন।

ভগিনীর পরমর্শানুসারে ধুন্ধুলী সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফলের শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য তা গোরুকে খাইয়ে দিলেন আর পতিকে জানালেন যে তিনি ফল ভক্ষণ করেছেন।

যথাসময়ে ভগিনী পুত্রসন্তান প্রসব করলে তা ব্রাহ্মণপত্নী ধুন্ধুলীর পুত্ররূপে পরিচিত হল। আত্মদেব জানলেন যে তিনি পুত্রসন্তান লাভ করেছেন। ব্রাহ্মণ, সন্তানের জন্ম উপলক্ষে দান ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি করলেন। ধুন্ধুলী মাতৃদুগ্ধ দানে অক্ষম জেনে তাঁর ভগিনী ধুন্ধুলীর গৃহে সন্তান লালনপালনের জন্য বসবাস করতে লাগল। এতক্ষণ পর্যন্ত সবই পরিকল্পনা অনুসারেই চলছিল। মাতা ধুন্ধুলী, পুত্রের নাম রাখলেন ধুন্ধুকারী। কিছুদিন পরে যে গোরুকে ফল খাওয়ানো হয়েছিল তারও প্রসব হল। গোমাতার মানবসন্তান প্রসব করবার মতন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। এই সন্তান সর্বাঙ্গসুন্দর দিব্যকান্তি নির্মল সুবর্ণকান্তি ছিল। তাকে দেখে ব্রাহ্মণ খুবই আনন্দিত হলেন। ঘটনা সকলকেই আশ্চর্য করল। দৈবযোগে এই গুপ্ত রহস্যের কথা কেউই জানতে পারল না। ছেলেটির কান দুটি গোরুর কানের মতন দেখতে হওয়াতে আত্মদেব তাঁর নাম রাখলেন গোকর্ণ। গোকর্ণ শব্দের প্রকৃত অর্থ অবশ্য অন্য—যে কর্ণ জ্ঞান পান করে থাকে তা গোকর্ণ।

বালক যুগল ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করল। তাদের মধ্যে গোকর্ণ খুব বড় পণ্ডিত ও জ্ঞানী হল কিন্তু ধুন্ধুকারী সৎপথে গেল না। অনাচার, চৌর্যবৃত্তি, অত্যাচার আদি সব বদগুণই তাকে গ্রাস করল। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সে ঘুরত, শিশুদের কোলে তুলে নিয়ে কুয়োয় ফেলে দিত আর সে চণ্ডালদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদের মতো হাতে জাল নিয়ে কুকুরের পাল সঙ্গে নিয়ে পশুপাখি শিকার করে বেড়াত। বারাঙ্গনাদের কুসঙ্গে সে তার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি তছনছ করে ফেলল। একদিন ধুন্ধুকারী তার বাবা-মাকে প্রহার করে বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেল। পুত্রের ব্যবহারে পিতা হাহাকার করে উঠলেন। তিনি বিলাপ করতে লাগলেন।

এই সময়ে সেই স্থানে জ্ঞানী গোকর্ণের আগমন হল। গোকর্ণ পিতাকে প্রকৃত সুখের সন্ধান দিলেন। পুত্রের উপদেশে প্রভাবিত হয়ে আত্মদেব

গৃহত্যাগ করলেন আর অরণ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে তাঁকেই লাভ করলেন। গোকর্ণ তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন।

পিতার বনগমনের পর ধুন্ধুকারী মাতার উপর অত্যাচার শুরু করল। ধুন্ধুলী মাতা এক রাতে কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে মারা গেলেন। ধুন্ধুকারীর মাতার অভাবে কিছু এসে গেল না। সে পাঁচজন বারবণিতাকে বাড়িতে এনে তাদের সঙ্গে বাস করতে লাগল। তাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য একদিন সে নানা স্থান থেকে অনেক ধনরত্ন চুরি করে নিয়ে এল। সেই ধনসম্পদ আহরণের জন্য সেই মলিন চিত্ত বারবণিতাগণ তাকে এক রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করল, কারণ তাদের ভয় হয়েছিল যে চুরির অপরাধে ধুন্ধুকারীর সঙ্গে তারাও ধরা পড়তে পারে। মৃতদেহকে গর্তে প্রোথিত করে তারা ধনসম্পত্তি নিয়ে সরে পড়ল। এদিকে ধুন্ধুকারী নিজ কুকর্মের ফলে প্রেতযোনি লাভ করল।

গোকর্ণ লোকমুখে তার মৃত্যুসংবাদ পেলেন। শ্রাদ্ধাদি কার্য তাঁকেই করতে হল। একসময়ে তিনি নিজ গৃহে এলেন। একদিন তিনি সেখানে একটি ভয়ানক প্রেত দেখতে পেলেন। সে ছিল ধুন্ধুকারী। সে ভ্রাতাকে নিজ ভয়ংকর রূপসকল প্রদর্শন করতে লাগল। গোকর্ণ তার পরিচয় জানতে চাইলেন। পরিচয় দিয়ে সকল কুকর্মের কথা স্বীকার করে ধুন্ধুকারী গোকর্ণকে জানাল যে কর্মফলে সে প্রেতযোনিতে বাস করছে। গোকর্ণ যখন জানালেন যে গয়াতীর্থে শাস্ত্রমতে তার পিণ্ডদান হয়েছে, তখন ধুন্ধুকারী জানাল যে শত গয়াতীর্থেও তার মুক্তি হবে না। গোকর্ণ তখন তাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করবার আশ্বাস দিলেন।

গোকর্ণ বহু জ্ঞানী যোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সকলের পরামর্শ অনুসারে গোকর্ণ সূর্যদেবের বিধানের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। নিজ তপোবলে গোকর্ণ সূর্যের গতি রুদ্ধ করে দিলেন। অতঃপর সূর্যদেবকে স্তুতি করে ধুন্ধুকারীর উদ্ধারের উপায় জানতে চাইলেন। গোকর্ণের প্রার্থনা শুনে সূর্যদেব দূর থেকেই পরিষ্কারভাবে বললেন — 'শ্রীমদ্ভাগবতে মুক্তি হতে পারে। সুতরাং তুমি তার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ পারায়ণ করাও।'

অতঃপর গোকর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহব্যাপী পারায়ণের ব্যবস্থা

করলেন। ঘটনাস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের পারায়ণ হচ্ছে শুনে বহু পাপী-তাপীর আগমন হল। গোকর্ণ স্বয়ং ব্যাসপীঠে বসে কথা পাঠ করতে লাগলেন। তখন সেই প্রেতও সেইখানে এসে উপস্থিত হল আর বসবার জন্য এদিক-ওদিক জায়গা খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে সে একটা সোজা করে রাখা সাত গাঁটযুক্ত বাঁশের উপর এসে তার নীচের ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়ল আর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনতে লাগল। একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে গোকর্ণ মুখ্য শ্রোতারূপে ঠিক করলেন। পাঠ শুরু হল। সন্ধ্যাকালে পাঠ বিশ্রাম হওয়ার সময়ে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের সম্মুখেই সেই বাঁশটির একটি গাঁট ফেটে গেল। পাঠ চলতে লাগল। নিত্য পাঠান্তে একটি করে গাঁট ফেটে যেতে লাগল। এইভাবে সাতদিনে সাতটি গাঁট ভেদ করে ধুন্ধুকারী বারোটি স্কন্ধ শ্রবণ করে পবিত্র হয়ে প্রেতযোনি থেকে মুক্ত হয়ে গেল আর দিব্যদেহ ধারণ করে সকলকে দর্শন দিল।

এই শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম প্রদানকারী। ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণে বিশেষভাবে প্রীত হন ও অনুষ্ঠানকারীকে নিজে গোপপ্রিয় গোলোকধামে নিয়ে যান। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য অপরিসীম। এই কথা বড়ই পবিত্র। শ্রীমদ্ভাগবত একবার মাত্র শ্রবণেই সমগ্র পাপরাশি ভস্মীভূত হয়ে যায়।

—— o ——

পিতামহের শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্।
মোহয়ন্মায়য়া লোকং গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু॥ (১।৯।১৮)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। শ্রীভগবানের কৃপায় পাণ্ডবগণ যুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু সেই জয়লাভে আনন্দ নেই। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। চতুর্দিকে স্বজন বিয়োগ এবং অসংখ্য মৃত্যু তাঁকে এই প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে—'এত মৃত্যুর প্রতিদানে কী পেলাম ? কেন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের বিনাশের কারণ হলাম ? এত অক্ষৌহিণী সৈন্য বধ করে রাজসুখ ভোগ প্রয়োজন ছিল কি ?' তাঁর মনে হল যেন অনন্তকাল ধরে নরক-বাস করেও তাঁর নিষ্কৃতি নেই। যদিও শাস্ত্র অনুসারে প্রজা পালনের জন্য রাজার ধর্মযুদ্ধে পাপ না হওয়ার কথা বলা হয়, তবুও শাস্ত্রবচন ধর্মরাজকে বিষাদগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হচ্ছিল না। যুদ্ধের পরিণাম এত ভয়াবহ তা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে ধর্মরাজ বুঝতে পারেননি।

ধর্মরাজের বিষাদে সকলেই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিরত করবার জন্য উপদেশাদি দিলেন ; কিন্তু তারও সুফল দেখা গেল না। তখন সকলে মিলে ঠিক করলেন যে ধর্মরাজের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে শরশয্যায় শায়িত সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্ববিদ্ ভীষ্মের কাছে যাওয়াই শ্রেয়। ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব জানলে সকলের সন্দেহ দূর হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তাই পিতামহ ভীষ্মের কাছে যেতে ধর্মরাজ রাজি হয়ে গেলেন।

স্বর্ণালংকারে সজ্জিত উত্তম অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করে পাণ্ডবগণ ধর্মরাজের অনুগমন করলেন। তাঁদের সঙ্গে ব্যাস, ধৌম্য আদিও গেলেন। ভীষ্মের কাছে উপদেশের জন্য গমন প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই

ওঠে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকতে ভীষ্মের উপদেশ কেন দরকার হয়ে পড়ল ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় যার জ্ঞান হয় না তার জ্ঞান হবে ভীষ্মের উপদেশে ! এই প্রসঙ্গে আরও এক সঙ্গত প্রশ্ন—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ভীষ্মের কাছে যেতে চাইলেন ? বস্তুত শ্রীভগবানের লীলার তাৎক্ষণিক বিচার করলে প্রকৃত উদ্দেশ্য জানা অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে রথে করে তাঁদের অনুগমন করলেন।

পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণ ও অনুচরদের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে উপনীত হয়ে দেখলেন যে পিতামহ ভীষ্ম সেখানে স্বর্গ থেকে পতিত দেবতার ন্যায় শায়িত রয়েছেন। তাঁরা পিতামহকে প্রণাম করলেন। তখন ভরতকুলতিলক ভীষ্মকে দর্শন করবার জন্য সমস্ত ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিদেরও আগমন হয়েছিল। পিতামহ ভীষ্ম তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সেইসকল মহান ঋষিদের উপস্থিত হতে দেখে তিনি তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং শ্রীভগবান, পিতামহ তা সম্যকভাবে জানতেন। তাই লীলায় নররূপে তথায় উপবিষ্ট ও শ্রীভগবানরূপে অন্তরে বিরাজমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তিনি অন্তরে ও বাইরে উভয়ভাবেই পূজা করলেন।

তাঁর নিকটে বিনয় ও শ্রদ্ধাযুক্তভাবে পাণ্ডবদের উপস্থিত দেখে পিতামহ ভীষ্মের নয়নযুগল অশ্রুজলে ভরে গেল ; আর যাঁকে ধ্যান করেও দর্শন পাওয়া যায় না সেই জগদীশ্বর পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে স্বশরীরে উপনীত হয়েছেন, তাতে আনন্দ পাওয়াই তো স্বাভাবিক ঘটনা।

ভীষ্ম পিতামহ পাণ্ডবদের বলতে লাগলেন—'ধর্মপুত্র পাণ্ডবগণ ! তোমরা ব্রাহ্মণ, ধর্ম ও শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিত ; কষ্টকর জীবনযাপন করতে তোমরা বাধ্য হয়েছ যা তোমাদের জন্য উপযুক্ত নয়। এ বড় দুঃখ ও পরিতাপের কথা।'

পাণ্ডবগণ বিষণ্ণবদনে ভীষ্মের কাছে বসে রয়েছেন। ভীষ্ম আবার বললেন—'শ্রীভগবানের লীলা বুঝতে পারা কঠিন। তাঁর নাম স্মরণ করলেই যেখানে সর্বদুঃখের অবসান হয় সেই শ্রীভগবান সঙ্গে অথচ তোমাদের দুঃখ নিবারণ হচ্ছে না। আমার ধারণা যে তোমাদের জীবনে যা কিছু অপ্রিয় ঘটনা

ঘটেছে এ সবই তাঁর লীলামাত্র। নাহলে যেখানে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, গদাযুদ্ধে নিপুণ ভীম, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী গাণ্ডিবধারী অর্জুন এবং পরমবান্ধব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বর্তমান, সেখানেও বিপদ আসে—এ অতি আশ্চর্যের কথা ! সকল সুখের কারণ উপস্থিত থাকলেও তোমাদের দুঃখের নিবৃত্তি হচ্ছে না, এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে !

এই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান। সকলের আদি কারণ ও পরমপুরুষ নারায়ণ। কিন্তু মায়াবলে জগৎকে মোহিত করে যদুকুলে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করছেন। এঁর মহাপ্রভাব অগম্য ও রহস্যময় ; তা কেবল ভগবান শংকর, দেবর্ষি নারদ ও স্বয়ং ভগবান কপিলই জানেন। তোমাদের মাতুল সম্পর্কিত ভ্রাতা, প্রিয় মিত্র ও হিতৈষী—যাঁকে তোমরা মন্ত্রী, কখনো দূত আবার কখনো সারথি করতেও ইতস্তত করনি, তিনি আসলে স্বয়ং পরমাত্মা। এই সর্বাত্মা, সমদর্শী অদ্বিতীয়, নিরহংকার এবং নিষ্পাপ পরমাত্মাতে ছোটবড় কোনো কার্যেরই শ্রেণীবিচার নেই। এইরূপ সর্বত্র সমভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অনন্যপ্রেমী ভক্তদের প্রতি তাঁর কী অসীম কৃপা ! তাই আমার মৃত্যুকালেও তিনি দর্শন দান করবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। এঁর নাম কামনাবাসনা ও কর্মবন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তি প্রদান করে থাকে। ইনি দেবাদিদেব শ্রীভগবান যাঁর প্রসন্ন চতুর্ভুজ রূপ দর্শন কেবল ধ্যানযোগেই হয়। আমার একান্ত প্রার্থনা যে তিনি যেন আমার দেহত্যাগ পর্যন্ত আমার কাছে উপস্থিত থাকেন।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের উপদেশ শুনে সমবেত ঋষিগণের সম্মুখেই ধর্মবিষয়ে নানাবিধ প্রশ্ন করলেন। তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্ম তখন বর্ণাশ্রম স্বীকৃত স্বাভাবিক ধর্ম এবং বৈরাগ্যরূপ নিবৃত্তিমার্গ ও আসক্তিরূপ প্রবৃত্তিমার্গ, দানধর্ম, রাজধর্ম, মোক্ষধর্ম, স্ত্রীধর্ম ও ভগবদ্‌ধর্ম তাঁকে বুঝিয়ে বললেন। এরই সঙ্গে তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে উপদেশ দিলেন। ভীষ্মের ধর্ম ব্যাখ্যা শুনে যুধিষ্ঠিরের সকল সংশয়ের অবসান হল। পিতামহ ভীষ্ম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সোজা কথায় বুঝিয়ে দিলেন যে পাণ্ডবদের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রেমে বশীভূত আর পাণ্ডবদেরও তাঁর উপর প্রেমপ্রীতি কম নয়। পাণ্ডবদের পিতামহ বলেই তিনি কৃপা করে মৃত্যুর সময় এসেছেন।

মৃত্যুকালে স্বয়ং শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করা তো অতি সৌভাগ্যের কথা।

ধর্ম প্রসঙ্গে কয়েকদিন কাটল এবং উত্তরায়ণকাল উপস্থিত হল। তাঁর দেহত্যাগের কাল সমাগত দেখে পিতামহ ভীষ্ম তখন অপলক নয়নে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে দেখতে তাঁতে চিত্ত সমর্পণ করে তাঁর স্তবস্তুতি করতে লাগলেন।

ভীষ্ম বলতে লাগলেন— 'আমার শুদ্ধ ও নিরাসক্ত বুদ্ধি আমি যদুকুল শিরোমণি অনন্ত শক্তির আধার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করছি। তাঁর যোগমায়া দ্বারাই সমগ্র সৃষ্টি হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণে আমার তৃষ্ণারহিত, কামনারহিত চিত্তবৃত্তি নিবেদন করছি।'

ত্রিলোকে যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ কাম্য সেই তমাল সদৃশ নীলবর্ণ, সূর্যকিরণ সদৃশ উজ্জ্বল পীতবসন পরিবৃত, মুখপদ্ম যাঁর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কুঞ্চিত কেশ দ্বারা অলংকৃত সেই অর্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণে আমার অকপট মতি হোক।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রের সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যব্রত, পরমজ্ঞানী ও পরমযোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিরূপে আমার চিত্তে অঙ্কিত হয়ে আছেন। তাঁর মুখমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত অলকরাজি যুদ্ধক্ষেত্রের ধূলিতে মলিন হয়ে গিয়েছিল আর তাঁর মুখমণ্ডলে শ্রমজনিত ঘর্মবিন্দুর অপূর্ব শোভা ছিল। আমার শরাঘাতে সেই দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। সেই সুন্দর বর্মপরিহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আমার দেহ, মন ও আত্মা সমর্পিত হোক।

নিজসখা অর্জুনের কথা স্বীকার করে যিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করে নিজ দৃষ্টিদ্বারা শত্রুপক্ষের আয়ু হরণ করেছিলেন, সেই পার্থসখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আমার পরম প্রীতি হোক।

শত্রুসৈন্যদের মধ্যে আত্মীয়স্বজনকে দেখে স্বজন বধে ভীত অর্জুনকে যিনি গীতারূপে আত্মবিদ্যা উপদেশ দান করে তার সাময়িক অজ্ঞানতা দূর করেছিলেন, সেই পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার পরমানুরক্তি হোক। মৃত্যুকালে সারূপ্য দান শ্রীভগবানের অনন্ত কৃপা।

আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য যিনি (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে রথচক্র ধারণ করেছিলেন, তখনও তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ ও ভক্তবাৎসল্যে পরিপূর্ণ ছিলেন ; তিনিই আমার একমাত্র গতি, আশ্রয় হোন।

অর্জুনের রথের রক্ষণে সতর্ক বাম হস্তে ঘোড়ার রাশ ও দক্ষিণ হস্তে চাবুক ধারণকারী যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব রূপ ধারণ করেছিলেন সেই পার্থসারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আমার পরম প্রীতি হোক।

যাঁর সুন্দর গমন, পরিহাসবাক্য, মধুর হাস্য, সপ্রেম কৃপাকটাক্ষ দান দ্বারা পরম পূজনীয়া গোপীগণ রাসলীলার মধ্যে তাঁর অন্তর্ধানে মহাপ্রেম-বিকারগ্রস্তা হয়ে লীলার অনুকরণে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আমার পরম প্রীতি হোক।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিগণ ও রাজাগণ উপস্থিত ছিলেন। সেই সভা মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানের ঘটনা আমি দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ সকলের আত্মা ও প্রভু। সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব মূর্তি দর্শন করে তাঁর পূজা করেছিলেন। সেই পরমাত্মা আজ আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। আমি কৃতকৃতার্থ।

আকাশের সূর্য যেমন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত, তেমন ভাবেই জন্মমৃত্যুরহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ সৃষ্ট বিভিন্ন দেহীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক এবং অভিন্ন—সকল জীবের মধ্যেই বিরাজমান। আমি সম্যকরূপে অনুভব করেছি যে জন্মরহিত পরমাত্মাই হচ্ছেন এই শ্রীকৃষ্ণ। সকল জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে তিনিই বিরাজমান।

হে ভগবান ! আপনার কৃপায় আজ আমি মোহমুক্ত ; আপনার অনন্ত প্রকাশ ও অনন্ত মূর্তিতে কোনো ভেদ নেই। আপনিই যে অচিন্ত্য মহাশক্তির বলে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তা আমি জেনেছি।'

পিতামহ ভীষ্ম এইভাবে অন্তরে কৃষ্ণধ্যান, মুখে কৃষ্ণগুণকীর্তন ও নয়নে কৃষ্ণরূপ দর্শন করতে করতে নিজেকে আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে লীন করে দিলেন। তাঁর স্বরূপ লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল। পিতামহ ভীষ্মের ইচ্ছা পূর্ণ হল। যুধিষ্ঠিরের মনে স্বজন বধের যে গ্লানি উপস্থিত হয়েছিল তা ভীষ্মের উপদেশে অপসৃত হল। মহাজ্ঞানী অষ্টবসুর অন্যতম পিতামহ ভীষ্মের নয়নযুগল অশ্রুসজল কেন হয়ে উঠেছিল তা ভক্তগণ জেনে কৃতকৃত্য হয়ে গেলেন। পিতামহ মৃত্যুকালে শ্রীভগবানকে চিনিয়ে দিয়ে গেলেন।

———o———

অবতাররূপে আগমন

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী।
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্ ॥ (১।৩।২৩)

সৃষ্টির আরম্ভে শ্রীভগবান লোকসমূহ নির্মাণের ইচ্ছা করেছিলেন। তাই তিনি মহত্তত্ত্বাদিসম্পন্ন পুরুষরূপে দশ ইন্দ্রিয়, মন আর পঞ্চভূত — এই ষোড়শ কলাযুক্ত হলেন। তিনি যখন যোগনিদ্রায় শায়িত ছিলেন তখন তাঁর নাভিহ্রদ থেকে এক পদ্মের সৃষ্টি হয় ; সেই পদ্ম থেকে প্রজাপতিদের অধিপতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হলেন। শ্রীভগবানের সেই বিরাটরূপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের মধ্যেই সমস্ত লোকের কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর সেই রূপ বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় সত্ত্বময় শ্রেষ্ঠরূপ। যোগিগণ দিব্যদৃষ্টি দিয়ে শ্রীভগবানের সেইরূপ দর্শন করেন। অসংখ্য পদ, ঊরুদেশ, হস্ত, মুখ থাকায় তা আশ্চর্যজনক ; তার মধ্যে অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য কর্ণ, অসংখ্য চক্ষু ও অসংখ্য নাসিকা বর্তমান এবং সেই রূপ অসংখ্য মুকুট, বস্ত্র ও কুণ্ডলাদি অলংকারে শোভিত। শ্রীভগবানের সেই পুরুষরূপ, যাঁকে নারায়ণ বলা হয়, বহু অবতারের বীজস্বরূপ—তাতেই অবতারের আবির্ভাব। এই রূপের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ দ্বারা দেবতা, পশুপক্ষী ও মনুষ্যাদির সৃষ্টি।

সেই প্রভু প্রথমে কৌমারসর্গে সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার —এই চার ব্রাহ্মণরূপে অবতার গ্রহণ করে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করেন।

দ্বিতীয়বার বিশ্বকল্যাণে সমস্ত যজ্ঞের অধীশ্বর সেই শ্রীভগবানই রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করেন বরাহাবতার রূপে।

ঋষিসর্গে তিনি দেবর্ষি নারদরূপে তৃতীয় অবতার ধারণ করেন—এই অবতারেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য কর্মের কথা বলা হয়েছে যা 'নারদ পঞ্চরাত্র' নামে পরিচিত।

ধর্মের পত্নী মূর্তির গর্ভে তিনি নর-নারায়ণরূপে চতুর্থ অবতার গ্রহণ

করেন। এই অবতারে ঋষিরূপে মন ও ইন্দ্রিয় সংযম এবং কঠিন তপস্যার কথা বলা হয়েছে।

পঞ্চম অবতারে তিনি সিদ্ধগণশ্রেষ্ঠ কপিলরূপে আবির্ভূত হন এবং অধুনা লুপ্তপ্রায় 'সাংখ্যশাস্ত্র আসুরি' উপদেশ দেন।

অত্রিপত্নী অনসূয়ার প্রার্থনায় ষষ্ঠ অবতারে তিনি অত্রিমুনির পুত্র দত্তাত্রেয় নামে জন্মগ্রহণ করেন। এই অবতারে তিনি অলর্ক, প্রহ্লাদ প্রমুখকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দিয়েছিলেন।

তিনি সপ্তমবার রুচিনামক প্রজাপতির পত্নী আকূতির গর্ভে যজ্ঞ নাম নিয়ে অবতরণ করেছিলেন। এই অবতারে তিনি নিজ পুত্র যাম প্রমুখ দেবগণের সঙ্গে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর প্রতিপালন করেন।

রাজা নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবরূপে শ্রীভগবান অষ্টম অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই অবতারের প্রয়োজন ছিল পরমহংস পথকে সমস্ত আশ্রমশ্রেষ্ঠ আখ্যা প্রদান করা।

ঋষিদের প্রার্থনায় নবমবার তিনি রাজা পৃথুরূপে এসেছিলেন। এই অবতারে তিনি পৃথিবী থেকে সমস্ত ঔষধি প্রভৃতি বস্তু দোহন করেন।

চাক্ষুষ মন্বন্তরের শেষে যখন সমস্ত ত্রিভুবন প্লাবিত, তখন তিনি মৎস্যরূপে দশম অবতার হয়ে এসেছিলেন এবং পৃথিবীরূপ নৌকাতে আরোহণ করিয়ে পরবর্তী মন্বন্তরের অধিপতি বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করেছিলেন।

সমুদ্র মন্থনকালে কূর্মরূপ ধারণ করে তিনি একাদশ অবতাররূপে মন্দার পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন।

দ্বাদশবার তিনি ধন্বন্তরি মূর্তি ধারণ করে অমৃতভাণ্ড নিয়ে সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিলেন এবং ত্রয়োদশ অবতারে মোহিনী রূপ ধারণ পূর্বক দানবদের মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছিলেন।

চতুর্দশ অবতারে নৃসিংহরূপ ধারণ করে তিনি প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন।

পঞ্চদশ অবতারে বামনরূপ ধারণ করে দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞস্থলে

আগমন এবং বলির কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের জন্য তিন পা ভূমি যাচনা করেছিলেন।

ষোড়শ অবতারে তাঁর আগমন হয়েছিল পরশুরামরূপে। ক্ষত্রিয় নৃপতিদের ব্রহ্মবিদ্বেষী ও ব্রাহ্মণহন্তারূপে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন।

অতঃপর শ্রীভগবানের সপ্তদশ অবতারে পরাশর মুনির পুত্ররূপে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসদেব নামে আবির্ভাব হয়। সীমিত বুদ্ধি মানবের বিকাশে তাঁর অক্ষয় কীর্তি বেদ বিভাজন।

দেবকার্য সম্পাদন হেতু অষ্টাদশ অবতারে রাজা শ্রীরামরূপে তাঁর আগমন হয়। আদর্শ চরিত্রের উপমা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর আগমন। সেতুবন্ধন, রাবণ-কুম্ভকর্ণ বধ আদি লীলা সম্পাদন এই অবতারেই হয়েছিল।

ঊনবিংশ ও বিংশ অবতার গ্রহণ তাঁর যদুবংশে হয়েছিল। তখন তাঁর পরিচিতি ছিল বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণরূপে। ভূভার হরণই এই অবতার ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

কলিযুগাগমনে একবিংশ অবতারে মগধদেশে দেবদ্বেষী দানবদের মোহিত করবার জন্য তাঁর অজনপুত্র বুদ্ধরূপে আগমন হয়।

অতঃপর যখন কলিযুগের প্রভাব চরম সীমায় পৌঁছাবে আর রাজারাও দস্যুসম হয়ে উঠবে তখন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জগৎপালক শ্রীভগবান দ্বাবিংশ অবতারে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মার ঘরে কল্কিরূপে অবতারিত হবেন।

দ্বাবিংশ অবতারের বর্ণনা থাকলেও লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে অবতারের সংখ্যা চব্বিশ (চতুর্বিংশতি)। বিজ্ঞব্যক্তিদের মতে উক্ত দ্বাবিংশ অবতারের সঙ্গে হংস ও হয়গ্রীব যুক্ত করলে চতুর্বিংশতি অবতারই হয়।

সাধারণত যে দশাবতারের কথা বলা হয়ে থাকে তাঁরা হলেন : মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। এই অবতারগণ উক্ত চতুর্বিংশতি অবতারের অন্তর্ভুক্ত।

———০———

বরাহ অবতার

তং ব্যগ্রচক্রং দিতিপুত্রাধমেন স্বপার্ষদমুখ্যেন বিষজ্জমানম্।
চিত্রা বাচোঽতদ্বিদাং খেচরাণাং তত্রাস্মাসন্ স্বস্তি তেঽমুং জহীতি॥ (৩।১৯।৬)

ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ আকাশ পথে নিস্পৃহ হয়ে বিচরণ করতে করতে ভগবান শ্রীহরির সর্বলোকপূজিত বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হলেন। বৈকুণ্ঠে বেদপ্রতিপাদিত ষড়ৈশ্বর্যশালী ধর্মমূর্তি শ্রীআদি নারায়ণ ভগবান ভক্তগণকে সুখপ্রদানের জন্য শুদ্ধসত্ত্বময় স্বরূপ ধারণ করে সর্বদা বিরাজ করেন। পরমসৌন্দর্যশালিনী লক্ষ্মীদেবী, যাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য নিত্য দেবতাগণও প্রযত্নশীল থাকেন ও চঞ্চলা বলে পরিচিত, তিনিও বৈকুণ্ঠে স্থির থেকে শ্রীহরির সেবা করেন।

ভগবদ্দর্শনের আকুলতায় সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার বৈকুণ্ঠধামের ছয়টি প্রাচীর দ্বার অতিক্রম করে যখন সপ্তম দ্বারে উপস্থিত হলেন তখন সেখানে জয় ও বিজয় নামক দুইজন দ্বারপাল দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। তারা দেবতাসম গদাধারী, মহার্ঘ কেয়ূর কুণ্ডল ও কিরীট আভরণে ভূষিত এবং বনমালা ধারণ করেছিলেন। তাঁদের ভ্রূযুগলের ঈষৎ বক্রতা, বিস্ফারিত নাসাবিবর ও আরক্তলোচন মুখমণ্ডলে ক্রোধের ভাব প্রস্ফুটিত করেছিল। আত্মতত্ত্ববিদ মুনিগণ পঞ্চম বর্ষীয় বালকদের মতন দিগম্বর ছিলেন। সপ্তম দ্বারে নির্ভীক নিঃসংকোচভাবে প্রবেশ করার মুখে দ্বারপালগণ কর্তৃক তাঁরা বাধাপ্রাপ্ত হন। বৈকুণ্ঠবাসী দেবতাদেরও পূজ্য, অতীব সম্মাননীয় সনকাদি মুনিগণ প্রিয়তম প্রভু শ্রীহরির দর্শনে বাধা পড়াতে কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হলেন আর জয় ও বিজয়কে অভিশাপ দিয়ে বললেন—'শ্রীভগবানের পার্ষদ হয়েও তোমরা দুষ্টবুদ্ধি। তোমাদের অপরাধের সমুচিত দণ্ড দেওয়া উচিত। এই ভেদবুদ্ধির অপরাধে তোমরা এই

বৈকুণ্ঠলোক থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সেই পাপযোনিতে যাও যেখানে কাম, ক্রোধ ও লোভ জীবের এই তিন রিপু বাস করে।

সনকাদি মুনিগণের এই কঠোর অভিশাপ শুনে ও শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের অভিশাপের কোনো প্রতিকার নেই জেনে শ্রীহরির দুই পার্ষদ মহাভয়ে অতীব কাতর হয়ে তৎক্ষণাৎ মুনিদের শরণাগত হন। তাঁরা জানতেন যে শ্রীহরি ব্রাহ্মণপ্রদত্ত এইরকম দণ্ডকে স্বীকৃতি দেবেনই। এমন সময়ে ঘটনা বৃত্তান্ত জেনে প্রভু স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। ধ্যেয় বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন দেখে সনকাদি মুনিগণ তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। সকলেই পরম সুন্দর বিগ্রহ শ্রীহরিকে প্রণাম করলেন।

শ্রীভগবান বললেন—'হে মুনিগণ ! এই জয়-বিজয় আমার পার্ষদ। তোমাদের সঙ্গে অনুচিত ব্যবহার প্রকৃত অর্থে আমাকেই অবজ্ঞা করা। যে দণ্ড দিয়েছ তাতে আমার অনুমোদন আছে। ব্রাহ্মণ আমারও আরাধ্য। পার্ষদযুগল আমার ব্রাহ্মণভক্তির কথা না মনে রেখে তোমাদের অপমান করেছে। তাই আমার অনুরোধ যে তোমরা এইটুকু মাত্র কৃপা কর যে এদের নির্বাসনকাল যেন শীঘ্রই শেষ হয়। এরা নিজেদের অপরাধের উপযুক্ত ফল ভোগ করে অতি শীঘ্রই যেন আমার কাছে ফিরে আসে। এদের শাস্তি বিধান আমিই নির্দিষ্ট করেছিলাম। এরা শীঘ্রই অসুর যোনিতে জন্ম নেবে এবং সেখানে ক্রোধান্বিত চিত্তে একাগ্র ও সুদৃঢ় যোগসম্পন্ন হয়ে আবার আমার কাছে ফিরে আসবে।'

অতঃপর শ্রীভগবান অনুচরদের বললেন—'যাও, ভয় পেও না। তোমাদের মঙ্গল হবে। আমি সব কিছু করতে সমর্থ হলেও ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ করতে চাই না কারণ তা আমারই অভিপ্রেত। একবার যখন আমি যোগনিদ্রায় শায়িত ছিলাম তখন দ্বারপথে প্রবেশোদ্যতা লক্ষ্মীদেবীকে তোমরা বাধা দিয়েছিলে। তিনিই তখন ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সনকাদি তো নিমিত্তমাত্র। এখন অসুরযোনিতে জন্ম নিয়ে আমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোবৃত্তির ফলে আমার প্রতি তোমাদের যে একাগ্রতা জন্মাবে তার ফলে ব্রাহ্মণের অপমানজনিত পাপ থেকে তোমরা মুক্ত হয়ে যাবে এবং

অল্পকালের মধ্যেই আমার কাছে ফিরে আসবে।'

জয়-বিজয় প্রথমবার হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে, দ্বিতীয়বার রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে এবং তৃতীয়বার শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং প্রতিবারই তাঁরা শ্রীভগবানের হাতে মৃত্যু বরণ করেন। বৈরীভাব অবলম্বন করে শ্রীভগবানকে গভীরভাবে চিন্তা করে তাঁরা আবার শ্রীভগবানের কাছেই ফিরে গেলেন।

যথাসময়ে দিতির গর্ভে যমজ পুত্র জন্ম নিল। এই সময় ত্রিলোকে ভয়াবহ অশুভ লক্ষণ দেখা গেল। উল্কাপাত, বজ্রপাত হতে লাগল, অমঙ্গলজনক ধূমকেতু দেখা গেল। প্রবল ঘূর্ণী ঝড় হতে লাগল। নিবিড় ঘনঘটায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল আর চন্দ্র-সূর্যের প্রকাশ রুদ্ধ হয়ে গেল। বজ্রপাত ও ঝড়ে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠলে সামুদ্রিক প্রাণীসকল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। চন্দ্র-সূর্য বারে বারে রাহুগ্রস্ত হতে লাগল আর তাদের চারদিকে অমঙ্গলসূচক মণ্ডল সৃষ্টি হল। সেই দুই আদি দৈত্য জন্মগ্রহণ করেই সহসা দুইটি পাষাণতুল্য কঠোর দেহবিশিষ্ট হয়ে পর্বতের মতন বিশাল শরীর ধারণ করল। তাদের উচ্চতায় সুবর্ণময় কিরীটির অগ্রভাগ গগন স্পর্শ করল আর তাদের বিশাল শরীর দ্বারা সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছাদিত হয়ে গেল। তাদের প্রতি পদক্ষেপে ভূকম্পন অনুভূত হতে লাগল। কশ্যপ নামকরণ করলেন হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু।

একদিন সেই হিরণ্যাক্ষ দৈত্য গদা হাতে যুদ্ধ করবার অভিপ্রায়ে ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গলোকে গিয়ে উপস্থিত হল। হিরণ্যাক্ষ দৈত্য দুঃসহবেগশালী ছিল। তার পায়ে সোনার নূপুর বাজছিল, গলায় বৈজয়ন্তীমালা দুলছিল আর কাঁধে ছিল বিশাল গদা। মানসিক, দৈহিক ও ব্রহ্মার বরে দৈবশক্তিতে গর্বিত হিরণ্যাক্ষ অপ্রতিহত গতিতে চতুর্দিক দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। তার ত্রাসে দেবতাগণ এধার-ওধার লুকিয়ে পড়তে লাগলেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ যখন দেখল যে তার তেজ-প্রতাপে ইন্দ্রাদি দেবগণও স্থান ত্যাগ করেছেন তখন সে তাঁদের সামনে দেখতে না পেয়ে গর্জন করতে লাগল। অতঃপর মহাবলী দৈত্য হিরণ্যাক্ষ জলক্রীড়া উদ্দেশ্যে স্বর্গ থেকে নেমে মত্ত হস্তীসম গভীর

সমুদ্রে প্রবেশ করল। তার ফলে সাগরে প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দিল আর সমুদ্রাধিপতি বরুণদেবের সৈন্য জলচর জীবজন্তুগণ ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ল। তারা হতবুদ্ধি হয়ে সভয়ে দূরে পলায়ন করল। মহাবলী হিরণ্যাক্ষ বহুকাল সমুদ্রে বিচরণ করেও কোনো প্রতিপক্ষ না পেয়ে উত্থিত জলরাশিকেই নিজ লৌহগদা দ্বারা আঘাত করতে লাগল। এইভাবে বিচরণ করতে করতে সে বরুণদেবের রাজধানী বিভাবরীপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হল। পাতালাধিপতি জলজন্তুগণের প্রভু বরুণদেবকে দেখে ব্যঙ্গ করে হিরণ্যাক্ষ তাঁকে প্রণাম করে বলল—'হে মহারাজ ! আপনি আমাকে যুদ্ধ ভিক্ষা দিন।'

মদমত্ত শত্রুদ্বারা অপমানিত হয়েও বরুণদেব ক্রোধ সংবরণ করে উত্তর দিলেন—'হে অসুররাজ ! আমরা এখন যুদ্ধ খেলা ছেড়ে দিয়েছি। একমাত্র পুরুষ শ্রীহরিই তোমার মতন নিপুণ যোদ্ধাকে সন্তুষ্ট করতে আর যুদ্ধক্ষেত্রে শয়নকে সুনিশ্চিত করতে সমর্থ।' বরুণদেবের কথা শুনে হিরণ্যাক্ষ ব্যঙ্গের হাসি হাসল। সে দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে শ্রীহরির তখনকার অবস্থানের ঠিকানা জেনে রসাতলে গিয়ে উপস্থিত হল। রসাতলে গিয়ে সে দেখল যে বিশ্ববিজয়ী ধরাধর অর্থাৎ পৃথিবীকে ধারণকারী শ্রীভগবান বরাহমূর্তিতে দন্তের অগ্রভাগ দিয়ে পৃথিবীকে উপরে তুলে আনছেন আর তাঁর দুটি রক্তচক্ষু দিয়ে তিনি প্রতিপক্ষের তেজ হরণ করে নিচ্ছেন।

হিরণ্যাক্ষ তাঁকে দেখে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উপহাস করে বলে উঠল—'আরে ! এই বন্য পশু জলের মধ্যে কোথা থেকে এল।' বরাহরূপী শ্রীহরি হিরণ্যাক্ষকে কোনো উত্তর দিলেন না। তখন সে আবার বলল —'ওরে শূকররূপী দেবাধম ! আমার সামনে দিয়ে তুই এই পৃথিবীকে নিয়ে যেতে পারবি না। তোর অসুরবধ তো সব কপট আশ্রয় করেই ; সব তো যোগমায়াই করে। আমার গদাঘাতে তোর ভবলীলা সাঙ্গ করব আর তোর পূজক দেবতা ও ঋষিরা তাতেই শেষ হয়ে যাবে।'

হিরণ্যাক্ষের বাক্যবাণ শ্রীভগবানকে বিচলিত করল না। দন্তাগ্রে ধারণ করা পৃথিবীকে শান্ত রাখতে তিনি উত্তর না দিয়ে জল থেকে বেরিয়ে এলেন।

পিঙ্গলকেশ তীক্ষ্ণদন্ত হিরণ্যাক্ষ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে বলতে লাগল—'পালাতে তোর লজ্জাও করে না?'

জলের উপর যথাযোগ্য স্থানে পৃথিবীকে সংস্থাপন করে তার মধ্যে বরাহমূর্তি শ্রীহরি নিজ আধারশক্তি নিহিত করলেন। হিরণ্যাক্ষের উপস্থিতিতেই ভগবান ব্রহ্মা শ্রীহরির স্তবস্তুতি আর দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। এইবার ভগবান শ্রীহরি একটি বিশাল গদা ধারণ করে উচ্চহাস্যে বলে উঠলেন—'ওরে দুষ্ট! আমি বন্য জীব, বধ করবার জন্য তোর মতন সারমেয়কে খুঁজে বেড়াই। তুই বলছিস আমি পালিয়ে এসেছি তোর গদার ভয়ে! তুই তো অদ্বিতীয় বীর, পদাতিক বীরদের অধিপতি। পারিস তো আয় আমাকে পরাজিত কর।'

শ্রীভগবান ক্রোধান্বিত হয়ে দৈত্যকে এইভাবে উপহাস ও তিরস্কার করলেন। ক্রুদ্ধ হিরণ্যাক্ষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভগবান শ্রীহরির উপর গদাঘাত করল। স্থানচ্যুত হয়ে গদাঘাত এড়িয়ে যেতে দৈত্য মহাক্রোধে মুহুর্মুহু গদা ঘোরাতে ঘোরাতে ওষ্ঠ দংশন করতে লাগল। তখন ভগবান শ্রীহরি কুপিত হয়ে তীব্রবেগে তার দিকে ধাবিত হলেন। এইভাবে ভগবান শ্রীহরি ও দৈত্য হিরণ্যাক্ষের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ হতে লাগল। শ্রীভগবানের লীলা দর্শনে তখন ঘটনাস্থলে ঋষিগণসহ ভগবান ব্রহ্মাও উপস্থিত হলেন। ভগবান ব্রহ্মা দেখলেন যে হিরণ্যাক্ষ নির্ভয়ে শ্রীভগবানকে প্রতিহত করতে সক্ষম। তিনি আদিপুরুষ ভগবান নারায়ণকে বললেন—'হে দেব! আমার বর লাভ করে এই দুষ্ট দৈত্য অপরাজেয় হয়ে উঠেছে। এ অত্যাচারী, মায়াবী, গর্বিত ও দুর্দমনীয়। এই ভয়ংকর দৈত্য অতি ভীষণ; সন্ধ্যাকাল বা আসুরীবেলা পর্যন্ত জীবিত থাকলে এই দৈত্য আরও প্রবল হয়ে উঠবে অতএব তার পূর্বেই আপনি আপনার মায়াশক্তি অবলম্বন করে একে বধ করুন। এখন অভিজিৎ মুহূর্ত উপনীত হয়েছে; সকলের মঙ্গলের জন্য আপনি এই দুর্জয় অসুরকে বধ করুন। এর মৃত্যু আপনার হাতে লিখিত। দৈত্য নিজেই কালস্বরূপ হয়ে আপনার কাছে এসে পড়েছে।'

নয়ন কটাক্ষ সংকেতে ভগবান ব্রহ্মাকে আশ্বস্ত করে ভগবান শ্রীহরি

সম্মুখে উপস্থিত নির্ভীক শত্রু হিরণ্যাক্ষকে তার গণ্ডস্থলের নীচে গদাঘাত করলেন কিন্তু হিরণ্যাক্ষের গদার প্রহারে শ্রীভগবানের গদা হস্তচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হিরণ্যাক্ষ কিন্তু যুদ্ধরীতি অনুসরণ করে শ্রীভগবানকে প্রহার করল না। শ্রীভগবান হিরণ্যাক্ষের ধর্মবুদ্ধির প্রশংসা করে নিজ সুদর্শন চক্র স্মরণ করলেন। এইবার শ্রীভগবানের সঙ্গে তাঁর ভূতপূর্ব পার্ষদপ্রবর দৈত্যাধম হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধক্রীড়া চলতে লাগল। হিরণ্যাক্ষ দেখল যে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি তার সম্মুখে সুদর্শন চক্র হস্তে দাঁড়িয়ে আছেন। তার সর্বাঙ্গ ও সর্বেন্দ্রিয় ক্রোধে জ্বলে যেতে লাগল। সে শ্রীহরির উপর গদা প্রহার করল।

যজ্ঞমূর্তি ভগবান আদিবরাহ গদাঘাতকে অনায়াসে একবার বামপদ দ্বারা ও দ্বিতীয় বার হস্ত দ্বারা নিবারণ করলেন। হিরণ্যাক্ষ নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নিসম গ্রাসোদ্যত ভয়ংকর ত্রিশূল শ্রীভগবান তীক্ষ্ণধার চক্রদ্বারা ছেদন করলেন। অতঃপর ভগবানের শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষের উপরে দৈত্য মুষ্ট্যাঘাত করল ও গর্জন করতে লাগল। শ্রীভগবান তা হেলায় সহ্য করলেন।

সব কৌশল বিফল হওয়ায় মহামায়াবী দৈত্য মায়াপতি শ্রীহরির উপর নানাভাবে মায়া বিস্তার করতে লাগল। প্রলয়কালসম প্রচণ্ড বায়ুতে ভুবন অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকারে প্রস্তর বর্ষণ আদি হতে লাগল। নিজ মায়াজাল সফল হল না দেখে হিরণ্যাক্ষ বরাহদেবের কাছে গমন করে তাঁকে বাহুবেষ্টনে নিপীড়িত করতে চাইল কিন্তু অবাক হয়ে সে দেখল যে শ্রীহরি তো বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন। দৈত্য এইবার বজ্রমুষ্টিতে শ্রীভগবানকে আঘাত করতে লাগল। এইবার ভগবান শ্রীহরি দৈত্যের কর্ণমূলে হস্তপ্রহার করলেন। সেই আঘাতেই বিধ্বস্ত বৃক্ষসম দৈত্য মাটিতে আছড়ে পড়ল। মুক্তি কামনাকারী যোগিগণ সমাধি অবস্থায় যে মূর্তি দর্শন করেন তাই দেখতে দেখতে দৈত্যরাজ দেহত্যাগ করল। এইভাবে মহাপরাক্রমশালী হিরণ্যাক্ষকে বধ করে ভগবান আদিবরাহ তাঁর অখণ্ড আনন্দময় পরমধামে চলে গেলেন।

ব্রাহ্মণের অভিশাপে অসুরজন্ম লাভ করে শ্রীভগবানে বিদ্বেষপূর্বক নিত্যযুক্ত থেকে মুক্তি লাভ করবার এই এক অনবদ্য ঘটনা। বরাহ অবতারে

হিরণ্যাক্ষ বধের পর নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপু বধ একই কারণে হয়। শ্রীরাম অবতারে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমনে শিশুপাল ও দন্তবক্র বধও এই কারণেই হয়েছিল। জয়-বিজয় তারপর ভগবান অচ্যুতের কাছে আবার ফিরে গিয়েছিলেন। পূজার্চনা সাধনা করে যেমন নিত্যযুক্ত হওয়া সম্ভব, তাঁর সঙ্গে বিদ্বেষ করেও নিত্যযুক্ত থাকা সম্ভব। গঙ্গাস্নান মাঘ মাসে করা হোক অথবা বৈশাখ মাসে, উভয়তেই সমান পুণ্য হয়। তবে বৈশাখ মাসের স্নানে যে আনন্দ ও তৃপ্তি হয়, মাঘ মাসের স্নানে তা সম্ভব নয়। তদনুরূপ ভক্তিভাবে ভগবানে নিত্যযুক্ত হলে যে আনন্দ, দ্বেষ-ভাবে নিত্যযুক্ত হলে সেই অনুভূতি থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। উপরন্তু দ্বেষভাবের ভক্তিতে এমন সামর্থ্য অর্জন করতে হয়, যাতে একমাত্র শ্রীভগবান ভিন্ন কারো হাতে যেন মৃত্যু না হয়, নচেৎ অধোগতি অনিবার্য। অতএব প্রেমপূর্বক ভগবানের ভজনা করাই শ্রেয়। শ্রীভগবানের কী অদ্ভুত কৃপা ! তিনি চান শরণাগতি। ভক্ত যেমন করেই হোক তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকুক, তা হলেই তিনি কৃপা করবেন ; ভক্তকে নিজের শরণাগত করে নেবেন। তিনি যে অহেতুক কৃপাসিন্ধু !

———○———

কপিলদেব

যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।

যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্।। (৩।২৬।২১)

ব্রহ্মার আদেশে কর্দম মুনির দাম্পত্য ধর্মানুসারে প্রজাবৃদ্ধি করা এক ভয়ানক সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল। সমস্যা সমাধানে কর্দম মুনি সরস্বতী নদীর তীরে সুদীর্ঘ দশ সহস্র বৎসরকাল তপস্যা করেছিলেন। সত্যযুগ আরম্ভের প্রাক্‌কালে কমলনয়ন ভগবান শ্রীহরি কর্দম মুনির তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শব্দব্রহ্মময় রূপ ধারণ করে তাঁকে দর্শন দান করেন। শ্রীহরি দর্শন দান কালে মস্তকে সুবর্ণনির্মিত কিরীট, কর্ণে দেদীপ্যমান কুণ্ডল ও হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শ্বেতপদ্ম ধারণ করেছিলেন। তাঁর চরণকমল গরুড় স্কন্ধে সংস্থাপিত ছিল। বক্ষঃস্থলে ছিলেন শ্রীলক্ষ্মীদেবী আর গলায় ছিল কৌস্তুভমণি। শ্রীভগবান তখন অনিন্দ্যসুন্দর জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কর্দম মুনি শ্রীভগবানকে জানালেন যে তিনি কোনো উপযুক্ত ও গার্হস্থ্য ধর্মানুকূল শীলবতী রমণীকে ভার্যারূপে লাভ করবার অভিলাষে তাঁর শরণাগত হয়েছেন। কর্দম মুনি শ্রীভগবানের স্তবস্তুতিও করলেন।

শ্রীভগবান বললেন—'হে কর্দম ! তোমার আত্মসংযম ও আরাধনায় আমি প্রসন্ন হয়েছি। তোমার অভিলাষ পূর্ণ করবার ব্যবস্থা তো হয়েই আছে। আগামী পরশু পৃথিবীর শাসক বিরাটকীর্তি স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর ভার্যা শতরূপাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার নিকট আসবেন। তাঁদের কন্যা রূপ-যৌবনসম্পন্না, সুশীলা, সদ্‌গুণান্বিতা, কৃষ্ণলোচনা ও বিবাহযোগ্যা। তাঁরা সেই যোগ্য কন্যাই তোমাকে সম্প্রদান করবেন। তোমার বীর্যে নয়টি কন্যা-সন্তান হবে। মরীচি আদি তাঁদের বিবাহ করবেন। তুমিও আমার আজ্ঞায় কর্মসকল সম্যকরূপে অনুষ্ঠান করে শুদ্ধসত্ত্বময় হয়ে সকল কর্মফল

আমাতেই সমর্পণ করে আমাকেই লাভ করবে। সর্বজীবে দয়া করে তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করবে এবং সকলকে অভয় দান করে তোমার নিজের সঙ্গে সম্পূর্ণ জগৎ আমার মধ্যে এবং আমাকে তোমার মধ্যে স্থিত দেখবে। হে মহামুনি ! আমিও নিজ অংশকলা রূপে তোমার বীর্যবিন্দুতে তোমার পত্নী দেবহূতির গর্ভে অবতীর্ণ হয়ে তত্ত্বসংহিতা (সাংখ্য শাস্ত্র) প্রণয়ন করব।'

শ্রীভগবান নিজ ধামে গমন করলেন আর মহর্ষি কর্দম শ্রীহরির উপদিষ্ট সময়ের জন্য তপস্যাক্ষেত্র বিন্দু সরোবরের তীরেই অবস্থান করে রইলেন। যথাসময়ে আদিরাজ স্বায়ম্ভুব মনু কন্যাসহ শ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ সেই আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন যে মুনিবর কর্দম অগ্নিতে হোম সম্পাদন করে আসনে উপবিষ্ট। মহর্ষি তখন উন্নতকায়, পদ্মপলাশলোচন, জটাজুট সুশোভিত ও চীরবসনেও দ্যুতিসম্পন্ন। মহর্ষি কর্দম স্বায়ম্ভুব মনুর নানাবিধ গুণ ও কর্মের উৎকর্ষ কীর্তন করলেন। আত্মপ্রশংসায় লজ্জিত সম্রাট মনু তখন বললেন—'হে মুনিপ্রবর ! নারদমুনির কাছ থেকে আপনার সুখ্যাতি শ্রবণ করে আমার কন্যা আপনাকে পতিত্বে বরণ করতে অভিলাষী। আমি অতীব শ্রদ্ধা সহকারে এই কন্যাকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করছি। আপনি একে গ্রহণ করুন। গার্হস্থ্য ধর্মের সমস্ত কর্মে সর্বতোভাবে এই কন্যা আপনার উপযুক্ত।' মহর্ষি কর্দম কন্যাকে গ্রহণ করবার সময়ে বললেন—'সন্তান উৎপাদনকাল পর্যন্ত আমি গার্হস্থ্য ধর্মানুসারে এঁর সঙ্গে থাকব। অতঃপর শ্রীভগবানের উপদিষ্ট সন্ন্যাসপ্রধান অহিংসা ধর্মের সঙ্গে শম-দমাদি ধর্মসকল পালন করব।'

মহর্ষি কর্দম ও দেবহূতির বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেলে কন্যার পিতা ও মাতা মনু ও শতরূপা স্বদেশে প্রস্থান করলেন। দেবহূতি কাম, দম্ভ, বাসনা, লোভ, পাপ ও গর্ব পরিত্যাগ করে বিশ্বাস, পবিত্রতা, গৌরব, সংযম, শুশ্রূষা, প্রেম ও মধুরবাক্যাদি সদ্‌গুণ দ্বারা পরম তেজস্বী পতিদেবতাকে সন্তুষ্ট করতে লাগলেন। কমলনয়না দেবহূতি পতি মহর্ষি কর্দমের আদেশ অনুসারে সরস্বতী নদীর পবিত্র জলের আধার বিন্দু সরোবরে স্নান করে পতির যোগশক্তির বিভূতি দেখে বিস্মিতা হয়ে

গেলেন। দেব-দাম্পত্য লীলা শুরু হল।

অনন্তর দেবহূতি সর্বাঙ্গসুন্দর নয়টি কন্যাসন্তান প্রসব করলেন। এইসময় শুদ্ধসত্ত্বা সতী দেবহূতি দেখলেন যে পূর্বপ্রতিজ্ঞানুসারে তাঁর পতিদেব সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে বনগমনে উদ্যত হয়েছেন। তখন দেবহূতি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে স্বামীকে বললেন—'আপনি সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলে আপনার এই কন্যাদেরই তাদের যোগ্য পাত্র জোগাড় করতে হবে এবং আমার জন্ম-মরণরূপ বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য সদ্গুরুর প্রয়োজন হয়ে পড়বে। আমি শ্রীভগবানের মায়ায় আপনার মতো পতিদেবতাকে লাভ করেও সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিনি।'

দেবহূতির কথায় মহর্ষি কর্দমের শ্রীভগবানের দেওয়া আশ্বাস-বাণী মনে পড়ল। তিনি তখন দেবহূতিকে বললেন—'শ্রীভগবান স্বয়ং অংশকলারূপে তোমার গর্ভে আবির্ভূত হয়ে তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দান করবেন। অতএব তুমি এখন শ্রীভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।'

যথাসময়ে শ্রীভগবান দেবহূতির গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। এই পুত্রই কপিল নামে পরিচিত। অতঃপর কর্দম মুনি তাঁর নয়টি কন্যার উপযুক্ত পতি সন্ধান করে তাদের সম্প্রদান করে সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসংকল্প হলেন। কর্দম ঋষি তাঁর কলা নাম্নী কন্যাকে মরীচির হস্তে, অন্সূয়াকে অত্রির হস্তে, শ্রদ্ধাকে অঙ্গিরার হস্তে , হবির্ভূকে পুলস্ত্যের হস্তে, গতিকে পুলহের হস্তে, ক্রিয়াকে ক্রতুর হস্তে, খ্যাতিকে ভৃগুর হস্তে, অরুন্ধতীকে বশিষ্ঠ ও শান্তিকে অথর্বা ঋষির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন।

এদিকে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব শ্রীহরিই তাঁর গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন বুঝতে পেরে কর্দম ঋষি একান্তে তাঁকে প্রণাম করে বললেন—'তোমাকে আমার গৃহে অবতরণ করতে দেখে ধন্য হয়েছি। হে প্রভু ! তুমি ভক্তের সম্মান বৃদ্ধি করে থাক। তুমি নিজ সত্য পালনার্থে এবং সাংখ্যযোগ প্রচার করবার জন্যই আমার গৃহে পদার্পণ করেছ। সাধকগণ তত্ত্বজ্ঞানলাভের ইচ্ছায় সর্বদাই তোমার পাদপীঠ বন্দনা করেন। ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, যশ, জ্ঞান, বীর্য ও শ্রী—এই ষড়ৈশ্বর্যে তুমি পরিপূর্ণ। আমি তোমার শরণাগত হলাম। হে প্রভু ! তোমার

কৃপায় আমি ঋণত্রয় থেকে মুক্ত। এইবার আমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে তোমার চিন্তা করতে করতে সমস্ত দৈন্য থেকে মুক্ত হয়ে ভূমণ্ডলে বিচরণ করব। অনুমতি দাও।'

শ্রীভগবান বললেন—'হে মুনিবর ! বৈদিক ও লৌকিক সমস্ত রকমের কর্মে আমার বাক্যই প্রামাণ্য। এই জগতে মুক্তিকামী মুনিদের আত্মদর্শনের উপযোগী তত্ত্বাদি জ্ঞান সম্পাদনের জন্য ও তা পুনঃপ্রবর্তিত করবার জন্যই আমার আগমন। হে মুনিবর ! আমি অনুমতি দিলাম। তুমি স্বেচ্ছায় প্রস্থান করো আর সমস্ত কর্মফল আমাতে আহুতি দিয়ে দুর্জয় মৃত্যুকে অতিক্রম করে মোক্ষপদ লাভের জন্য আমার ভজনায় নিত্যযুক্ত হও।'

আদেশ পেয়ে প্রজাপতি কর্দম ঋষি শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ করে হৃষ্টচিত্তে বনগমন করলেন। বনগমনের পূর্বে তিনি তাঁর কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি লাভ করেছিলেন যে ভার্যা দেবহূতিকেও সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে নিষ্কৃতি প্রদানকারী আত্মজ্ঞান তিনিই দেবেন। কালে কর্দম ঋষির বুদ্ধি অন্তর্মুখী ও নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতন শান্ত হয়ে গেল। পরমভক্তিভাবের দ্বারা সর্বান্তর্যামী সর্বজ্ঞ ভগবান বাসুদেবে চিত্ত স্থির হয়ে যাওয়াতে তিনি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। সর্বভূতে নিজ আত্মা শ্রীভগবানকে এবং শ্রীভগবানের মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করে তিনি ইচ্ছাদ্বেষরহিত সমদর্শী হয়ে ভক্তিযোগের সাধনদ্বারা শ্রীভগবানের পরমপদ লাভ করলেন।

পিতা কর্দম ঋষি সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনে চলে যাওয়ার পর ভগবান কপিল জননীর কল্যাণ সাধনের জন্য সেই বিন্দু সরোবর তীর্থেই অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন তত্ত্ববেত্তা ভগবান কপিল কর্ম সম্পাদন করে নিজাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন দেবহূতি তাঁকে প্রশ্ন করলেন।

দেবহূতি বললেন—'হে বিরাট ! হে প্রভু ! দুষ্ট ইন্দ্রিয়বর্গ ভোগের আসক্তিতে আমাকে অস্থির করছে আর আমাকে ঘোর অন্ধকারময় অজ্ঞানে আবদ্ধ রেখেছে। তুমি সমস্ত জীবের প্রভু ভগবান আদিপুরুষ তথা অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ জীবের কাছে নেত্রস্বরূপ সূর্যের মতন উদিত হয়েছ। এই দেহ-গেহের প্রতি 'আমি, আমার' রূপ দুরাগ্রহ তোমারই দেওয়া, তাই

তুমিই এই মহামোহ দূর করো। তুমি তোমার ভক্তজনের সংসাররূপ বৃক্ষ ছেদনের কুঠারস্বরূপ। আমি তোমার শরণাগত—প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান লাভের অভিলাষী। তুমি শ্রেষ্ঠ ভাগবতবেত্তা। তোমাকে প্রণাম করছি।'

ভগবান কপিলদেব বললেন—'হে মাতা ! অধ্যাত্মযোগই মানুষের আত্যন্তিক কল্যাণের মুখ্য সাধন। এই যোগ প্রাকৃত সুখ ও দুঃখ নিবারণ করে। জীবের চিত্তই তার বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয় চিত্ত বন্ধনের কারণ আর পরমাত্মায় চিত্তের মুক্তি। মানব মন যখন দেহাদিতে অহংবুদ্ধি ও গেহাদিতে মমত্ববুদ্ধিজনিত কাম, লোভ আদি বিকার থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ নির্মল হয়ে যায় তখন সেই মন সুখ-দুঃখরহিত হয়ে সমভাবাপন্ন অবস্থায় এসে যায়। তখন জীব নিজ জ্ঞান-বৈরাগ্য ও ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে আত্মাকে সম্পর্করহিত, একমেবাদ্বিতীয়, ভেদরহিত, অখণ্ড, স্বয়ং প্রকাশ, নির্লিপ্ত ও সুখ-দুঃখরহিত রূপে দর্শন করে এবং প্রকৃতিকে দুর্বল বলে মনে করে। যোগীদের কাছে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সর্বাত্মা শ্রীহরির প্রতি একান্ত ভক্তি ছাড়া অন্য কোনো কল্যাণকর পথ নেই। বিবেকযুক্ত ব্যক্তি জানতে পারে যে আসক্তি হল জীবাত্মার দৃঢ় বন্ধনপাশ আর তা সাধুমহাত্মাদের দিকে ঘুরিয়ে দিলে তবে মোক্ষ দ্বার উন্মুক্ত হয়। যারা সহিষ্ণু, দয়ালু, জীবে সমভাবাপন্ন, দ্বেষরহিত, শান্ত, সরল ও সজ্জনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী, অনন্য ভক্তিসম্পন্ন, ঈশ্বর লাভের জন্য স্বজন ও কর্ম পরিত্যাগী এবং মদ্‌গতচিত্তে ভগবানের পবিত্র লীলা শ্রবণ-কীর্তন করে, তাদের ত্রিতাপ ব্যথিত করতে সক্ষম হয় না।

হে মাতা ! এই সর্বসঙ্গপরিত্যাগী মহাপুরুষগণই সাধু। সাধুসঙ্গই আসক্তি জনিত সমস্ত দোষ হরণ করে নেয়।'

দেবহূতি প্রশ্ন করলেন—'হে ভগবান ! ভক্তির স্বরূপ কী ? যে যোগের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তার লক্ষণ কী ? সরল করে বলো।'

শ্রীভগবান বললেন—'হে মাতা ! বেদবিহিত কর্মে নিরত ও বিষয়াদির জ্ঞানপ্রকাশকারী ইন্দ্রিয়াদির ও একাগ্রচিত্ত পুরুষের শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীহরির প্রতি যে নিষ্কাম আকর্ষণ তার নামই ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি। এই ভক্তি মুক্তির

চেয়েও শক্তিশালী কারণ তা কর্মসংস্কারের আধাররূপ লিঙ্গ শরীরকেও অবিলম্বে ভস্মীভূত করে। ভগবানের সেবায় নিত্যযুক্ত, তাঁর প্রসন্নতা অর্জনের জন্য কর্মানুষ্ঠানকারী একনিষ্ঠ ভক্তগণ সমবেত হয়ে লীলা সংকীর্তন কালে আমার সাযুজ্য মোক্ষও কামনা করে না। এই ভক্তিই তাদের ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়ে থাকে। তারা ঐশ্বর্য কামনা করে না কিন্তু বৈকুণ্ঠধামে গমন করে সেই সকল বিভূতি স্বাভাবিকভাবেই লাভ করে থাকে। অনন্য ভক্তকে আমি ভবসাগর পার করিয়ে দিয়ে থাকি। তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা আমাতে চিত্ত সমাহিত করাই হল এই জগতে মানুষের পক্ষে পরম পুরুষার্থ লাভ।

'হে মাতা ! পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব জানলে পুরুষ প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ অহংকারাদি থেকে মুক্ত হতে পারে। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এইরকম—পুরুষ এবং পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম), পঞ্চতন্মাত্র (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ), অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্)।'

'পুরুষ অনাদি (নিত্য), নির্গুণ, সর্বব্যাপী ও অনন্ত। তিনি হলেন স্বপ্রকাশ ও চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জড় জগতের প্রকাশ পুরুষের শক্তিদ্বারাই হয়ে থাকে। এই পরমাত্মস্বরূপ পুরুষ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হলে নিজ ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি যা প্রকৃতি নামে পরিচিত তা তার সম্মুখে উপস্থিত হয়। পুরুষ তাকে স্বীকার করলে সৃষ্টি হয়।'

''সত্ত্বগুণপ্রধান, নির্মল, শান্ত (বাসনাদিরহিত), ভগবৎ উপলব্ধি স্থান যে চিত্ত তাই মহত্তত্ত্ব এবং তাকেই 'বাসুদেব' বলা হয়। ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনরূপ অহংকারকেই পণ্ডিতগণ সাক্ষাৎ 'সংকর্ষণ' নামক সহস্রশীর্ষ অনন্তদেব বলে থাকেন। মনের সংকল্প ও বিকল্প দ্বারাই কামনার উৎপত্তি হয়। মনস্তত্ত্বই ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর 'অনিরুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ।''

''হে মাতা ! তৈজস অহংকার বিকারপ্রাপ্ত হলে তার থেকে 'বুদ্ধি' নামক তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। বিষয়ের প্রকাশরূপ বিজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়বিষয়ে

সহায়ক হওয়া ও পদার্থসমূহের বিশেষ জ্ঞান উৎপাদন—এই হল বুদ্ধিতত্ত্বের কার্য। বৃত্তিভেদ অনুসারে সংশয়, বিপর্যয় (বিপরীত জ্ঞান), নিশ্চয়, স্মৃতি এবং নিদ্রাও বুদ্ধিরই লক্ষণ। এই বুদ্ধিতত্ত্বই 'প্রদ্যুম্ন'।"

তদনন্তর কপিলদেব মাতাকে মনের মালিন্য দূর করবার জন্য পরিমিত আহার, শ্রীভগবানের স্মরণ-মনন, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন ইত্যাদির উপদেশ দিলেন। শ্রীভগবানের যে মূর্তিতে সাধক মন স্থির করে থাকেন, তার বর্ণনা দিলেন।

কপিলদেবের সবিস্তারে দান করা উপদেশসকল মাতা দেবহূতি মন দিয়ে শুনলেন। পুত্ররূপে অবতীর্ণ শ্রীভগবান কপিলদেব মাতাকে মুক্তিমার্গের সন্ধান দিলেন। ধ্যানযোগ অবলম্বন করে শ্রীভগবানের নির্দেশিত পথে সাধনা করে মাতা অচিরেই বাঞ্ছিত মুক্তি লাভ করেছিলেন।

মহাযোগী ভগবান কপিলদেবও মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য করে পিতার আশ্রম থেকে বেরিয়ে ঈশানকোণের দিকে চলে গেলেন। সেখানে স্বয়ং সমুদ্র তাঁর পূজার্চনা করেন ও তাঁকে স্থান দেন। ত্রিলোকে শান্তি প্রদানের জন্য তিনি যোগযুক্ত হয়ে সমাধিস্থ হন।

———o———

দক্ষযজ্ঞনাশ

তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।

ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥ (৪।৭।৫২)

সতী তখন পিত্রালয়ে গমন করতে কৃতসংকল্প। পতি দেবাদিদেব ভোলানাথ তাঁকে দক্ষালয়ে গমন করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তাঁর যে প্রজাপতি দক্ষ আয়োজিত 'বাজপেয়', 'বৃহস্পতিসব' আদি সকল যজ্ঞে উপস্থিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পিতার যজ্ঞ সম্পাদন কার্য যে একমাত্র তাঁর অজর অমর পরব্রহ্ম পতি দেবাদিদেব মহাদেবকে নিমন্ত্রণ না করে যজ্ঞভাগে বঞ্চিত করা ও তাঁকে অপমান করা। সতীর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই ছিল কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল পিতা প্রজাপতি দক্ষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁকে এই কর্ম থেকে বিরত করা, কারণ তিনি পিনাকপাণির মাহাত্ম্য জানেন না—তা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া কন্যার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নীলকণ্ঠ পতিদেবতা যে সে ব্যক্তি নন। হতে পারে তিনি সম্পর্কে জামাতা কিন্তু এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সমুদ্র মন্থনকালে যে অমৃত উঠেছিল তা নীলকণ্ঠ মহাদেবের অমর হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয়নি কারণ তিনি কালকূট বিষ ধারণ করেও অমর হয়ে থাকতে সমর্থ। তাঁকে অপমান করা মানে তো বিশ্বেশ্বরকে অপমান করা, যার ফল অতি ভয়ানক হতে বাধ্য।

প্রজাপতি দক্ষের জামাতার উপর অপ্রসন্ন হওয়ার কারণ ঘটেছিল প্রজাপতিগণ আয়োজিত এক যজ্ঞে। ভগবান সেই যজ্ঞসভায় আত্মারাম হয়ে যখন বসেছিলেন তখন প্রজাপতি দক্ষের আগমনকে অন্য সকলে দণ্ডায়মান হয়ে স্বাগত অভ্যর্থনা করেছিলেন। পরব্রহ্ম ভোলানাথ আবার কাকে সম্মান জানাবেন ? তিনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর তাই প্রজাপতি

দক্ষের সভাতে আগমনে কোনো ভাবপরিবর্তন হয়নি। প্রজাপতি দক্ষ জামাতার আচরণকে লৌকিক দৃষ্টিতে দেখলেন। তিনি প্রথমে শিবের অনেক নিন্দাবাদ করলেন তারপর যখন দেখলেন যে শিব তার কোনো প্রতিবাদ করলেন না, তখন তাঁর ক্রোধ এত ভয়ংকর হয়ে উঠল যে তিনি হস্তে জল নিয়ে তাঁকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। তিনি দেবাদিদেবকে ভূতদের দলপতি, আচার-বিচাররহিত অপবিত্র দুরাত্মা ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে অভিশাপ দিয়ে বসলেন—'এই শিব দেবতাদের মধ্যে সর্বাধম। এখন থেকে দেবযোগে ইন্দ্র, উপেন্দ্র প্রমুখ দেবতার সঙ্গে এ কোনো যজ্ঞভাগ পাবে না।' ভোলা মহেশ্বর তখনও চুপচাপ বসে রইলেন কিন্তু তাঁর প্রধান অনুচর নন্দীশ্বর ক্রোধে রক্তবর্ণনয়ন হয়ে দক্ষকে ছাগমুণ্ড হওয়ার অভিশাপ দিলেন। শিববিদ্বেষীকে ক্ষমা করা যে তাঁর পক্ষে কখনই সম্ভব ছিল না। শিব অতঃপর সেই যজ্ঞসভা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

সতীকে নিরস্ত করতে না পেরে বিশ্বেশ্বর তাঁকে বললেন—'দক্ষ তোমার জন্মদাতা পিতা হলেও তিনি যখন শিববিদ্বেষী, তোমার পক্ষে তাঁর ও তাঁর অনুগামীদের মুখদর্শন করাও উচিত নয়। আর আমার কথা অমান্য করলে তোমার পক্ষে তা মঙ্গলজনক হবে না। আত্মীয়স্বজন দ্বারা অপমানিত হওয়া সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে।' সতী তখন উভয় সংকটে। নানাদিক বিচার করে বিষকণ্ঠ মহাদেব আবার বিষপান করতে বাধ্য হলেন। এই বিষপান করতে ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণ সতত অভ্যস্ত থাকেন কারণ তাঁরা তা ধারণ না করলে সেই বিষ অন্যের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকর হয়ে যাবে ! মহাদেব সতীকে হাসিমুখে অনুমতি দিলেন আর তাঁর সঙ্গে অনুচর, পার্ষদ ও বৃষরাজকে দিলেন।

পিত্রালয়ে সতী উপস্থিত হলে দক্ষ তাঁকে দেখেও দেখলেন না। পিতার কাছ থেকে সমাদর লাভ না করে তিনি অন্দরমহলে গেলেন। মাতা ও ভগিনীদের কাছ থেকে অবশ্য সাদর আলিঙ্গন সতী পেলেন। অতঃপর সতী যজ্ঞমণ্ডপে গমন করলে অধীশ্বরী দেবী সতী হয়েও অপমানিতা হলেন। যজ্ঞে ভগবান শংকরের আসন ও যজ্ঞভাগ নেই দেখে তিনি পিতা দক্ষ

প্রজাপতিকে বললেন—'ভগবান দেবাদিদেব মহাদেব যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহ নেই, তিনি স্বরূপত সকল দেহধারীর প্রিয় আত্মা। তাঁর প্রিয়-অপ্রিয় নেই। তাঁর কারো সঙ্গে শত্রুতা নেই। কোনো সজ্জন তাঁর বিরোধিতা করেন না। আপনি কেন করছেন ? আপনি যদি এই দোষ এখনই না পরিহার করেন তাহলে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধিত এই শবতুল্য দেহ আমি এখনই পরিত্যাগ করব।' পিতা কন্যার অনুরোধ রাখলেন না।

যজ্ঞমণ্ডপে দক্ষকে এই কথা বলে দেবী সতী মৌন হয়ে গেলেন ও উত্তরদিকে ভূমিতলে উপবিষ্ট হলেন। তিনি আচমন করে পীতবস্ত্র পরিধান করে নিমীলিত নয়নে শরীর ত্যাগের উদ্দেশ্যে যোগপথ অবলম্বন করে সমাধিমগ্ন হয়ে গেলেন। অতঃপর যোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে তিনি সর্বাঙ্গে বায়ু ও অগ্নি ধারণা করলেন। অবশেষে তাঁর নিষ্কলুষ দেহে যোগাগ্নি প্রজ্বলিত হল। তিনি শশীশেখর মহাদেবের অপমান সহ্য না করে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

ভগবান সতীন্দ্র যখন নারদের মুখে শুনলেন যে সতী তাঁর পিতা দক্ষ প্রজাপতি কর্তৃক অপমানিত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন তখন তিনি ভয়ংকর উগ্ররূপ ধারণ করলেন। সক্রোধে তাঁর উৎপাটিত জটাখণ্ড ভূমিতে স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গেই এক অতিকায় পুরুষ উৎপন্ন হল। তার বিশাল দেহ আকাশস্পর্শী ছিল। তার সহস্র বাহু, মেঘবৎ ঘনকৃষ্ণ বর্ণ, সূর্যসম দীপ্তিমান ত্রিনয়ন, ভয়ংকর দন্তশ্রেণী, জ্বলন্ত অগ্নিশিখাসম রক্তবর্ণ কেশরাশি, গলায় নরমুণ্ড মালা ও হস্তে বহুপ্রকারের অস্ত্র ছিল। সেই বীরভদ্রকে ভগবান ভূতনাথ বললেন—'বীর রুদ্র ! তুমি আমার অংশসম্ভূত। আমার পার্ষদদের অধিনায়করূপে তুমি দ্রুত গমন করো এবং যজ্ঞসমেত দক্ষকে বিনাশ করো।' অতঃপর যজ্ঞশালা তছনছ হয়ে গেল। রুদ্রানুচর মণিমান ভৃগুমুনিকে, বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষকে, চণ্ডীশ পূষাকে এবং নন্দীশ্বর ভগ-দেবতাকে বন্ধন করল। ভৃগুমুনি স্রুব নামক যজ্ঞপাত্রে আহুতি দিচ্ছিলেন, বীরভদ্র তাঁর শ্মশ্রু-গুম্ফ উৎপাটিত করে ফেলল কারণ তিনি পূর্বে প্রজাপতির যজ্ঞসভায় শ্মশ্রু প্রদর্শন করে মহাদেবকে উপহাস করেছিলেন।

ভগদেবতা ও পূষার বীরভদ্রের হাতে চরম দুর্গতি হল। অগ্নিসংযোগ করে যজ্ঞশালা ধ্বংস করা হল। দক্ষ প্রাণ হারালেন।

দক্ষযজ্ঞনাশের মূল উদ্দেশ্য হল, এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা যে অহংকার জীবের পতনের মূল কারণ হয়ে থাকে। দক্ষ প্রজাপতি অহংকারী, তার অহংনাশ করবার প্রয়োজন ছিল। যে মুখে শিবনিন্দা—সেই মুণ্ড নষ্ট করে ছাগমুণ্ড করা হল। অবশ্যই সতীর সতীত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠাও দক্ষযজ্ঞ নাশের অন্যতম কারণ। স্বয়ং পিনাকপাণি শক্তির অধীন। তিনি শক্তির অবমাননা সহ্য করেন না, তাই দম্ভ অহংকারের প্রতীক প্রজাপতি দক্ষের বিনাশ সাধন। আর মহাদেব তাঁর অর্ধাঙ্গিনী দেবী সতীর পূত দেহ কাঁধে নিয়ে বিষ্ণুর চক্রের সাহায্যে সেগুলির খণ্ডিত অংশে একান্ন পীঠ সৃষ্টি করলেন—জগতে পতিভক্তি, সতীত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই।

ভগবান ব্রহ্মা ও সর্বান্তর্যামী নারায়ণ পূর্বেই এই ঘটনার কথা জানতেন তাই তাঁরা প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞে গমন করেননি। ভগবান ব্রহ্মা দেবতাদের মুখে সমস্ত ঘটনা বিবরণ শুনে দেবতাদের সত্বর ভগবান আশুতোষ শিবের কাছে গমন করে তাঁকে প্রসন্ন করতে বললেন। ভগবান ব্রহ্মাও ভগবান শংকরকে পরিতুষ্ট করবার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। ভগবান মহাদেব প্রসন্ন হলেন। প্রজাপতি দক্ষ ছাগমুণ্ড নিয়ে ভগবান মহাদেবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সদ্যসুপ্তোত্থিতের মতন পুনর্জীবিত হয়ে উঠলেন ও সম্মুখে বিরাজমান কল্যাণমূর্তি ভগবান শিবকে দর্শন করলেন। তাঁর হৃদয় থেকে তখন শিববিদ্বেষ অন্তর্ধান করেছে। তিনি শিবের স্তুতি করতে লাগলেন। অতঃপর সকলে সম্মিলিত হয়ে শিবের স্তুতি ও প্রার্থনা করলেন।

অতঃপর সেখানে যজ্ঞ আবার আরম্ভ করা হল। এইবার যজ্ঞে সর্বান্তর্যামী ভগবান শ্রীহরির আগমন হল। তিনি সকল দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সর্বযজ্ঞভাগেরই ভোক্তা, তবুও তাঁর জন্য বিশেষরূপে প্রকল্পিত ত্রিকপাল-পুরোডাশরূপী বিশিষ্ট হবিঃ লাভ করে যেন বিশেষ প্রীতি সহকারে দক্ষকে বললেন—

অহং ব্রহ্মা চ শর্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ॥
আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥

(৪।৭।৫০-৫১)

'জগতের পরম কারণস্বরূপ, সকলের আত্মা, ঈশ্বর, সাক্ষীস্বরূপ তথা স্বপ্রকাশ এবং উপাধিশূন্য আমিই ব্রহ্মা ও মহাদেব। নিজ ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে আশ্রয় করে আমিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার করে থাকি এবং সেই কর্মের অনুরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর—এই তিন নাম ধারণ করি।'

অতএব শ্রীভগবানের কাছ থেকেই আমরা জানি যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অভিন্ন। শ্রীভগবানের এই শিব রূপ সম্বন্ধে বলা হয়—'**শিবং কল্যাণং বিদ্যতে হি অস্য শিবঃ**' যাতে সমস্ত মঙ্গল বিদ্যমান তিনিই শিব। অথবা যিনি সমস্ত অমঙ্গল খণ্ডন করেন তিনিই শিব।

অতঃপর শ্রীভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে প্রজাপতিশ্রেষ্ঠ দক্ষ বিশেষরূপে শ্রীভগবানের জন্যই আয়োজিত সেই 'ত্রিকপাল' যাগদ্বারা তাঁর অর্চনা করে তারপর বিভিন্ন প্রকার অঙ্গভূত ও প্রধান— এই উভয়বিধ যাগদ্বারা অন্যান্য সকল দেবতার পূজা করলেন। অনন্তর একাগ্রচিত্তে ভগবান রুদ্রদেবকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট যজ্ঞশেষরূপ ভাগের দ্বারা অর্চনা করলেন এবং যজ্ঞ সমাপ্তিসূচক 'উদবসান' নামক কর্মদ্বারা সোমপায়ী এবং অন্যান্য দেবতাদের যজন করে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে ঋত্বিকগণের সঙ্গে 'অবভৃথ-স্নান' করলেন।

দক্ষকন্যা সতীদেবী এইভাবে নিজ পূর্ব শরীর ত্যাগ করে পুনরায় হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। প্রলয়াবস্থায় সুপ্তভাবে অবস্থিতা শক্তি যেমন সৃষ্টি সূচনায় পুনর্বার ঈশ্বরকে আশ্রয় করেন ঠিক তেমনই অনন্য পরায়ণা দেবী অম্বিকা এই পরবর্তী জন্মেও নিজের একমাত্র আশ্রয় এবং প্রিয়তম ভগবান শংকরকেই পতিরূপে বরণ করেছিলেন।

অতএব এই দক্ষযজ্ঞনাশ লীলা শ্রীভগবানের এক অনুপম লীলা যাতে তিনি শিবরূপে সতীর সতীত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই

শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদিত হল।

কর্পূরগৌরং করুণাবতারং সংসারসারং ভূজগেন্দ্রহারং।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানী সহিতং নমামি॥

কর্পূরের মতো উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ, কৃপাসাগর করুণাঘন মূর্তি, জগতের একমাত্র অবলম্বন, কণ্ঠে বাসুকীনাগ ভূষিত—তিনি আমার হৃদয়পদ্মে স্বয়ং দেবী ভবানীর সঙ্গে নিত্য অধিষ্ঠিত হোন।

———o———
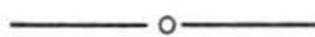
ধ্রুব উপাখ্যান

শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈরভিব্যক্তচতুর্ভুজম্ ॥ (৪।৮।৪৭)

মহারানী সুরুচি সতিনপুত্রকে বিষাদগ্রস্ত করেছেন। তাঁর সুন্দর বস্ত্রালংকার সুরুচি নামের মর্যাদা রাখে আর তিনি রাজা উত্তানপাদকে মনোমুগ্ধকর কথা বলে মোহিত করে রাখেন। কিন্তু সতিন সুনীতি ও তাঁর পুত্র ধ্রুবের প্রতি তাঁর ব্যবহার সুরুচির পরিচয় দেয় না। সুনীতি-পুত্র ধ্রুব পাঁচ বৎসরের বালক মাত্র। সে যখন দেখল যে তার সৎভাই উত্তম পিতার অঙ্কে আদর খাচ্ছে তখন তার মনেও পিতার কাছে আদর খাওয়ার ইচ্ছা জেগেছিল। বিমাতা সেই দৃশ্য সহ্য না করতে পেরে বালক ধ্রুবকে বললেন—'তোর স্পর্ধা দেখে অবাক হই। তুই রাজার কোলে ওঠবার ভাগ্য নিয়ে আসিসনি। তোকে রাজার কোলে ওঠবার জন্য শ্রীহরির তপস্যা করে আমার সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে।' অতএব বিমাতার ব্যবহার সুরুচির পরিচয় দিল না।

মর্মাহত বালক ধ্রুব দণ্ডের আঘাতে আহত ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পসম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে মাতা সুনীতির কাছে এসে সকল ঘটনা বলল। ঘটনা হৃদয়বিদারক কারণ পিতা স্বয়ং উপস্থিত অথচ দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করলেন না। পিতা উত্তানপাদ রানীর বশীভূত। তাঁর তো রানী সুরুচির উপর দুর্বলতা ছিল। পিতা উত্তানপাদের অবহেলায় শিশুপুত্রের অন্তরে যে কী ভয়ানক আঘাত লেগেছিল তা রাজা ভেবেও দেখলেন না।

ঘটনা মহারানী সুনীতি ও পুত্র ধ্রুবকে অশ্রুসজল করে তুলল। পুত্রকে আদর করে তিনি কষ্ট লাঘব করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু দুঃখের প্রতিকার পথ তাঁর অজানা ছিল। কিন্তু কথায় বলে—কেউ গোলাপে কাঁটা দেখে আর কেউ

কাঁটায় সুরক্ষিত গোলাপ দেখে। সুনীতি তো গোলাপ দেখে ভাববেনই যে গোলাপের কাঁটা গোলাপের রক্ষকরূপে থাকে, কারণ তিনি যে সুনীতি। তাই সুরুচি প্রদত্ত হলাহল সুনীতির মুখ দিয়ে মহৌষধিরূপে আবির্ভূত হল। তিনি পুত্রকে বললেন—'হে ধ্রুব ! তোমার বিমাতার কথাও সত্য। সকলকেই তপস্যার দ্বারা শ্রীহরির আরাধনায় যুক্ত থাকা উচিত। অতএব তাঁর উপর বিদ্বেষ ত্যাগ করে তাঁর উপদেশানুসারে আচরণ করো। শ্রীভগবানকে ডাকো ; তাঁকে তোমার দুঃখের কথা বলো। তিনি অবশ্যই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।'

সুনীতি আরও বললেন—'তিনি বিশ্বচরাচর পালনের জন্য সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে থাকেন। জিতাত্মা যোগিগণও তাঁকেই বন্দনা করে থাকেন। সেই ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্ম আরাধনা করেই ব্রহ্মা উত্তম ব্রহ্মপদ লাভ করেছেন।'

সুনীতি আবার বললেন—'হে ধ্রুব ! তোমার পিতামহ ভগবান স্বায়ম্ভুব মনু বহু যজ্ঞ সম্পাদন করে একাগ্রচিত্তে তাঁরই আরাধনা করেছিলেন। তাতে তিনি দুর্লভ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ ও শেষে মোক্ষলাভ করেছিলেন। অতএব তুমিও সেই ভক্তবৎসল ভগবানেরই শরণাগত হও। জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি লাভেচ্ছু মুমুক্ষুগণ নিরন্তর তাঁর পাদপদ্মের অনুসন্ধান করে থাকেন। স্বধর্মপালনের দ্বারা নিজ চিত্ত নির্মল করো আর হৃদয়পদ্মে পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকেই স্থাপন করে সব চিন্তা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র তাঁরই ভজনা করো।

হে ধ্রুব ! ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যে লক্ষ্মীদেবীর অনুসন্ধান করেন সেই পদ্মধারিণী লক্ষ্মীদেবীও ভগবান শ্রীহরির অন্বেষণে নিত্য যুক্ত থাকেন। অতএব মনস্কামনা পূর্ণ করবার জন্য পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনা করা প্রয়োজন।

মাতা সুনীতির উপদেশ বালক ধ্রুবের অভীষ্ট সিদ্ধির পথ নির্দেশ করে দিল। মাতার উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করে ধ্রুব পিতার নগর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অরণ্যে গমন করে ধ্রুব একমনে ভগবানকে ডাকতে

লাগলেন—'কোথায় তুমি পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি ! দেখা দাও।'

দেবর্ষি নারদ ধ্রুব-বৃত্তান্ত শুনলেন আর যোগবলে ধ্রুবের মনোগত অভিপ্রায় জেনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন—'আহা ! ক্ষত্রিয়দের কী অদ্ভুত তেজ ! এরা সামান্যতম অপমানও সহ্য করতে পারে না। এই ধ্রুব তো বালকমাত্র ! তবুও বিমাতার কটুবাক্যসকল মনের মধ্যে ধরে রেখেছে। তিনি ধ্রুবের মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন এবং তাকে উপদেশ দিলেন।

দেবর্ষি নারদ বললেন—'হে ধ্রুব ! তুমি এখন অল্পবয়সী বালক মাত্র। এই বয়সে তোমার তো খেলাধুলায় মত্ত থাকাই স্বাভাবিক। মান-অপমান বোঝবার বয়স তো তোমার হয়নি।

'যদিও তোমার মান-অপমান বোধ থাকে তবুও মানবের অসন্তোষের কারণ মোহ ছাড়া আর কিছুই নয় ; জগতে সকলেই নিজ নিজ কর্মফলে মোহের বশে মান-অপমান, সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকে। সৎ কর্ম করলে শুভ ফল লাভ হয় আর অসৎ কর্ম করলে অশুভ ফল তথা দুঃখ ভোগ করতে হয় ; এই তো নিয়ম। জ্ঞানিগণ জানেন যে ঈশ্বরই একমাত্র গতি—তাঁরই ইচ্ছায় মানুষ শুভাশুভ ফল ভোগ করে থাকে। অতএব নিজ ভাগ্যানুসারে যখন যা ঘটে তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন ; মান-অপমানের জন্য অপরকে দায়ী করেন না।

'মাতার উপদেশ অনুসারে তুমি যোগসাধনার দ্বারা যে ভগবানের কৃপার জন্য উদ্যোগী হয়েছ আমার মতে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তা অত্যন্ত কঠিন। যোগী মুনিগণ বহুজন্ম ধরে নিষ্কামভাবে কঠোর যোগসাধনা করেও তাঁকে জানতে পারেন না। তুমি কেমন করে পারবে ? তোমার এই ভগবৎ আরাধনার ইচ্ছা ত্যাগ করে গৃহে প্রত্যাগমন করো। সাধনা করবার সময় তো পরে আরও পাবে।'

ধ্রুবের মনোবল পরীক্ষা করবার জন্য দেবর্ষি তাকে অনেক যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়ে ভগবৎ আরাধনা থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়োচিত তেজস্বিতায় ধ্রুবর হৃদয় তখন পূর্ণ। তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল

থেকে নম্রভাবে দেবর্ষি নারদকে উত্তর দিলেন।

ধ্রুব বললেন—'হে দেবর্ষি ! আপনার উপদেশসকল অতি সুন্দর। আমি কিন্তু ক্ষত্রিয়জাত অনমনীয় স্বভাবের ; আপনার উপদেশ পালনের অধিকারী নই। বিমাতার অপমান বিস্মরণ করা আমার পক্ষে কঠিন। আমি সেই পদ অধিকার করতে আগ্রহী যা ত্রিভুবনে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যা আমার পিতৃপুরুষগণ অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কখনো লাভ করতে সমর্থ হননি। সেই সর্বোৎকৃষ্ট পদলাভের জন্য শ্রীভগবানের আরাধনা কীভাবে করতে হবে আপনি কৃপা করে আমাকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিন।'

দেবর্ষি নারদ বললেন—'তোমার মাতাই শ্রেষ্ঠ পথের সন্ধান বলে দিয়েছেন। তুমি একাগ্র চিত্তে শ্রীহরির আরাধনায় যুক্ত হও। শ্রীভগবানের কৃপা হলে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এ সবই সাধকের লাভ করা সম্ভব ; অতএব তুমি একাগ্রচিত্তে তাঁরই আরাধনা করো।

'হে বৎস ! যমুনার পবিত্র তটে মধুবন নামক যে সুন্দর স্থান রয়েছে সেখানে শ্রীহরি সর্বদা বিরাজ করেন, সেইখানে গমন করো। সেখানে গিয়ে ত্রিসন্ধ্যা যমুনার জলে স্নান করে, আসন রচনা করে প্রাণায়াম দ্বারা মনের শক্তিগুলিকে একাগ্র করে প্রত্যাহার অর্থাৎ মনের বিষয়াভিমুখী গতিকে ফিরিয়ে মনকে ভগবন্মুখী করে ধারণা অর্থাৎ মনের একাগ্রতা অভ্যাস করবে। মন একাগ্র হলে তবেই ধ্যান সম্ভব এবং এই ধ্যানই ক্রমে সমাধি অবস্থায় পৌঁছে দেবে।'

দেবতাদের মধ্যে তিনি পরম সুন্দর ; তাঁর নাসিকা, ভ্রূ ও কপোল অতি মনোহর, নয়নে ও বদনে তাঁর নিত্য প্রসন্নতার দ্যুতি। ভক্তদের অনুগ্রহ বর্ষণে তিনি সদা সদয়। মধুর বিগ্রহ সেই শ্রীভগবান সর্বাঙ্গসুন্দর। নয়নে, অধরে ঈষৎ রক্তাভা। তিনি প্রণতজনের আশ্রয়স্থল, নিত্যসুখধাম, শরণাগত-বৎসল, করুণাসাগর।

তাঁর বক্ষদেশে শ্রীবৎস চিহ্ন। তিনি নবনীরদ কান্তি শ্যামসুন্দর কিশোর বালকসম। তাঁর গলদেশে বনমালা এবং চার হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করে থাকেন। তাঁর শ্রীঅঙ্গ কিরীট, কুণ্ডল, কেয়ূর, কঙ্কণাদি

অলংকারে সুশোভিত, গ্রীবা কৌস্তুভমণির সৌন্দর্যে অলংকৃত। তাঁর পরিধানে কৌষেয় পীতাম্বর থাকে। তাঁর কটিদেশে চন্দ্রহার, চরণে উজ্জ্বল স্বর্ণ নূপুর। তাঁর শ্রীবিগ্রহ দর্শনকারীদের জন্য অতি মনোহর। তাঁর উজ্জ্বল মণিসদৃশ চরণ নখরের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত পাদপদ্মযুগল ভক্তহৃদয়ের পরম সম্পদ।

'তিনি যেন সস্মিত মুখে অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টিতে আমারই দিকে তাকিয়ে আছেন—এইরূপে সেই সর্বোত্তম বরদানকারী শ্রীভগবানকে ধ্যান করবে। এইভাবে নিরন্তর শ্রীভগবানকে ধ্যান করতে থাকলে অল্পকালের মধ্যেই মন পরমানন্দে মগ্ন হয়ে যাবে।

'হে রাজকুমার ! এইপ্রকারে ধ্যানের সঙ্গে যে পরম গোপনীয় মন্ত্র জপ করতে হয় তাও আমি তোমাকে বলছি। এই মন্ত্র সাত রাত্রি জপ করলে মানুষ আকাশচারী সিদ্ধগণকে দর্শন করবার ক্ষমতা লাভ করে থাকে। সেই পরম পবিত্র মন্ত্র হল— '**ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।**' বিশুদ্ধ জল, পুষ্পমাল্য, বন্য ফল-মূল, তুলসী আদি দ্বারা তাঁর পূজা করতে হয়। পূজকের সংযতচিত্ত, মননশীল, শান্ত, মিতভাষী হওয়া প্রয়োজন। আহার বন্য ফল-মূলাদি হবে। শ্রীভগবানের লীলাসকল একাগ্রচিত্তে স্মরণ-মনন করতে হবে। উপাচার ও মন্ত্রসকল শ্রীহরির উদ্দেশে সমর্পিত হবে। এইভাবে একাগ্রচিত্তে ভক্তিভাবে পূজা করলে শ্রীভগবানে প্রীতির স্পর্শলাভ হবে আর শ্রীভগবান ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে যেটি কল্যাণকর সেইটি প্রদান করবেন।'

দেবর্ষি নারদের নিকট এইরূপ উপদেশ লাভ করে রাজপুত্র ধ্রুব তাঁকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মরজে মণ্ডিত পবিত্র ভূমি মধুবনের উদ্দেশে গমন করলেন।

এদিকে ধ্রুব রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ায় রাজার মন অনুশোচনায় ভরে গেল। তিনি ধ্রুবর জন্য নিত্য ব্যাকুল হয়ে বিষণ্ণ চিত্তে কালাতিপাত করতে লাগলেন। সুরুচির প্রতি তাঁর মোহ দূর হয়েছে।

যোগদৃষ্টির সাহায্যে দেবর্ষি নারদ রাজা উত্তানপাদের মনের অবস্থা জেনে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। অনন্তর তিনি রাজাকে বললেন।

দেবর্ষি বললেন—'হে মহারাজ ! আপনি অনেকক্ষণ ধরে বিষণ্ণ মুখে কী চিন্তা করে যাচ্ছেন ? আপনার তো ধর্ম, অর্থ, কাম—এই তিনটির কোনো অভাব নেই ; তাহলে দুশ্চিন্তার হেতু কোথায় ?'

রাজা উত্তর দিলেন—'হে পূজনীয় ব্রাহ্মণ ! আমি অত্যন্ত স্ত্রৈণ ও দয়ামায়াহীন। আমি আমার পঞ্চম বর্ষীয় বালকপুত্রের গৃহত্যাগের কারণ। আমার শিশুপুত্রটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল। আমার সেই পুত্র ধ্রুব আদর করে আমার কোলে উঠতে চেয়েছিল ; কিন্তু সুরুচির ভয়ে আমি তাকে কোলে নিইনি। অভিমান করে সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। জানি না বনের মধ্যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে সে শ্রান্ত দেহে বনের মধ্যেই শুয়ে পড়েছে হয়তো ; তাকে হিংস্র জন্তুরা মেরে ফেলেনি তো ?'

দেবর্ষি নারদ বললেন— 'আপনি আপনার পুত্রের জন্য এত চিন্তা বা শোক করবেন না। দেবতারা তাকে রক্ষা করছেন। আপনি তার মাহাত্ম্য এখনও জানেন না। তার যশে সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ হবে। আপনার এই প্রভাবশালী পুত্র ইন্দ্রাদি লোকপালদের সাধ্য কর্ম সাধন করে অচিরেই আপনার কাছে ফিরে আসবে। আপনার পুত্রের কারণে আপনার বংশের গৌরবও চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।'

দেবর্ষির মুখে এই সকল কথা শুনে রাজা উত্তানপাদ রাজকার্যে উদাসীন থেকে কেবলমাত্র পুত্র চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রইলেন।

ওদিকে ধ্রুবও মধুবনে উপস্থিত হয়ে যমুনায় স্নান করলেন এবং পবিত্রভাবে সেই রাত্রে উপবাসী থেকে দেবর্ষির উপদেশানুসারে একাগ্র চিত্তে পরমপুরুষ নারায়ণের উপাসনায় রত হলেন। তিনি তিন দিন অন্তর কেবল মাত্র শরীরধারণ নিমিত্ত কয়েত বেল ও বদরীফল ভক্ষণ করে শ্রীহরির আরাধনায় একমাস যাপন করলেন। দ্বিতীয় মাসে সেই বালক ধ্রুব ছয়দিন অন্তর শুধু শুষ্ক ঘাসপাতা খেয়ে শ্রীভগবানের অর্চনা করে চললেন। এরপর নয় দিন অন্তর কেবলমাত্র জলপান করে সমাধিযোগে তিনি পুণ্যশ্লোক শ্রীভগবানের আরাধনায় তৃতীয় মাস অতিবাহিত করলেন। চতুর্থ মাসে তিনি শ্বাস জয় করে বারো দিন অন্তর কেবলমাত্র বায়ুপান করে ধ্যানযোগের দ্বারা

শ্রীভগবানের উপাসনায় নিমগ্ন রইলেন। পঞ্চম মাসে সেই জিতশ্বাস রাজপুত্র পরব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন হলেন এবং স্তম্ভের মতন নিশ্চলভাবে এক পায়ের উপরে দণ্ডায়মান হলেন। রাজপুত্র এক পায়ের উপর দণ্ডায়মান হতেই তাঁর অঙ্গুষ্ঠের চাপে অর্ধেক পৃথিবী টলমল করতে থাকল। ধ্রুব নিজের ইন্দ্রিয় দ্বারসকল ও প্রাণবায়ুকে নিরুদ্ধ করে অনন্য বুদ্ধিযোগে বিশ্বাত্মা শ্রীহরির ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। এর ফলে বিশ্বভুবনের সমষ্টিপ্রাণের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা সিদ্ধ হওয়ায় সর্বজীবের শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল। তখন লোকপালগণ ও সর্বলোকের প্রাণীকুল সভয়ে পীড়া অনুভব করে শ্রীহরির শরণাগত হল।

তাঁদের আশ্বস্ত করে শ্রীভগবান বললেন—'হে দেবগণ ! ভয় পেয়ো না। উত্তানপাদ-পুত্র ধ্রুব নিজ চিত্তকে বিশ্বাত্মা আমার মধ্যে লীন করে দিয়েছে। আমার সঙ্গে তার অভেদ ধারণা সিদ্ধ হয়েছে। ফলে তার প্রাণ নিরোধে তোমাদের সকল প্রাণবায়ুই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তোমরা ফিরে যাও, আমি বালককে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করব।' সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে বিদায় গ্রহণ করলে শ্রীভগবান গরুড়ে আরোহণ করে নিজভক্তকে দর্শনের ইচ্ছায় মধুবনে গমন করলেন।

মধুবনে ভক্ত ধ্রুব সম্পূর্ণ সমাধিস্থ ছিলেন ; বহির্জগতের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিন্ন হয়েছিল। সেই সময় ধ্রুব নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মতন অতি উজ্জ্বল ইষ্টমূর্তি হৃদয়ে দর্শন করে একেবারে তন্ময় ছিলেন। হঠাৎ ধ্রুব দেখলেন যে হৃদয় মধ্যস্থ সেই ইষ্টমূর্তি অন্তর্ধান করেছে। তখনই ধ্রুবর সমাধি ভঙ্গ হয়ে গেল। নয়নকপাট উন্মোচনে তিনি দেখলেন যে হৃদয়স্থিত শ্রীহরির সেই মূর্তি সাক্ষাৎ বিগ্রহরূপে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান। ধ্রুবর সাধনার সার্থক পরিণতি হল।

শ্রীভগবানকে দর্শন করে বালক ধ্রুব ভক্তি ও আনন্দে অধীর হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তাঁকে অভিবাদন করলেন। নয়ন পথে ঈশ্বর দর্শন, শ্রীপাদপদ্ম চুম্বন, শ্রীপাদপদ্ম আলিঙ্গন আদি ভক্তি ও আনন্দ আতিশয্য হতে লাগল। স্তব কেমন করে করতে হয় ভক্ত ধ্রুব জানেন না তাই শ্রীভগবান ধ্রুবর মনস্কামনা পূর্ণ করবার জন্য দয়াপরবশ হয়ে তাঁর হাতের বেদময় শঙ্খ

দিয়ে ধ্রুবর গণ্ডস্থল স্পর্শ করলেন। ধ্রুব তখন শ্রীভগবানের স্তবস্তুতি করতে লাগলেন।

ধ্রুব তখন শ্রীভগবানের শরণাগত। শ্রীভগবান জানেন তার মনোগত অভিলাষের কথা। শ্রীভগবান ধ্রুবকে সেই বর দিলেন যার উদ্দেশ্যে সাধনা আরম্ভ হয়েছিল। সস্নেহে তিনি ভক্তপ্রবরকে আপনার করে নিলেন।

শ্রীভগবান বললেন—'হে ক্ষত্রিয়নন্দন ! অতি দুর্লভ হলেও পরমার্থরূপ নিরন্তর ভগবৎভজনের অধিকার লাভের জন্য তুমিই যোগ্য ব্যক্তি। যে স্থানে পূর্বে কখনো কেউ যায়নি আর যে স্থানকে কেন্দ্র করে গ্রহনক্ষত্রসমূহ আবর্তিত হয়, সেই অবিনশ্বর বাসস্থানরূপ উৎকৃষ্ট পদ আমি তোমার জন্য নির্দিষ্ট করলাম ; সেই লোক ধ্রুবলোক নামে পরিচিত হবে।

ইহলোকে তোমার পিতৃদেব তোমাকে পৃথিবীর ভার অর্পণ করে বানপ্রস্থে গেলে তুমি ছত্রিশ সহস্র বৎসর ধর্মপথে থেকে পৃথিবীকে শাসন করবে। এই কালে তোমার ইন্দ্রিয়শক্তির অবক্ষয় হবে না।

তোমার বিমাতা তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে। তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ায় গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং তার মাতা সুরুচি পুত্রস্নেহে ব্যাকুল হয়ে তাকে অন্বেষণ করতে গিয়ে দাবানলে দগ্ধ হবে।

যথাবিধি রাজ্যপালন এবং বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের পর যখন এই পৃথিবীতে তোমার অন্তিম সময় উপস্থিত হবে তখন তুমি আমাকে স্মরণ করবে। অনন্তর তুমি সর্বলোকের বন্দনীয়, সপ্তর্ষিগণেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত আমার পরমধামে গমন করবে ও ধ্রুবলোকে অবস্থান করবে। সেইখানে গমন করলে আর সংসারে প্রত্যাগমন করতে হয় না।'

ধ্রুবকে বরদান করে শ্রীহরি ধ্রুবর সামনেই স্বধামে গমন করলেন। শ্রীভগবানের কৃপায় আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করেও তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হল না। ধ্রুব বরলাভ করবার সময় পর্যন্ত বিমাতার অপমান বিস্মরণ করতে সক্ষম না হওয়ায় মুক্তিদাতা শ্রীহরির কাছে মুক্তি প্রার্থনা করেননি। শ্রীহরির দর্শন লাভের পর মলিনতা অপগত হওয়ায় তাঁর মনে নিজের ভুলের জন্য অনুতাপ জন্মাল। তিনি বুঝেছিলেন যে বিমাতা ও ভ্রাতাকে শত্রু

জ্ঞান করা তাঁর পক্ষে ঠিক হয়নি।

অতঃপর ধ্রুবের পিতার নিকট আগমন হল। পিতা, মাতাদ্বয় ও ভ্রাতা সকলের কাছে উষ্ণ অভ্যর্থনা আর রাজভবনে বৈভবের আলিঙ্গন—সব কিছুই যথাযথভাবে অভিনীত হল। অবশেষে রাজা উত্তানপাদের বানপ্রস্থে গমনও হয়ে গেল।

ধ্রুব শিশুমার প্রজাপতির কন্যা ভ্রমিকে বিবাহ করলেন। তাঁর পুত্রদ্বয় যথাক্রমে কল্প ও বৎসর। বায়ুর কন্যা ইলা মহাবলী ধ্রুবের দ্বিতীয় পত্নী ছিলেন, তাঁর গর্ভে উৎকল নামে পুত্র ও এরা নামে কন্যারত্ন উৎপন্ন হয়।

ভ্রাতা উত্তম অবিবাহিত ছিলেন, এই সময়ে একদিন তিনি মৃগয়ায় গিয়ে হিমালয় পর্বতে এক বলশালী যক্ষদ্বারা নিহত হন। তাঁর মাতা সুরুচি বনমধ্যে দাবানলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে ধ্রুব দুঃখে কাতর হয়ে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত চিত্তে যক্ষপুরীতে গিয়ে যক্ষদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত হন। মহাবলশালী ধ্রুবের বাণে বহু নিরপরাধ যক্ষ নিহত হয়েছে দেখে ধ্রুবের পিতামহ তাঁকে এই যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার উপদেশ দিলেন। তিনি ধ্রুবকে বললেন যে এই জড় দেহকে আত্মা মনে করে পশুদের মতন প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া সাধু ব্যক্তির শোভা পায় না। তিনি মনে করিয়ে দেন যে শ্রীহরিই সর্বভূতে অবস্থান করছেন। তাই শ্রীভগবানের সেবক, ভক্তজনের আদরের পাত্র ধ্রুবকে তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত করলেন। ধ্রুব জানলেন যে যক্ষগণ তাঁর ভ্রাতৃহন্তা নয় কারণ জীবের সৃষ্টি ও বিনাশের কারণ একমাত্র ঈশ্বর ; তিনি অন্তর্যামী সকলের নিয়ন্তা ও সৃষ্টিকর্তা। পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশে ধ্রুব বৈরী ভাব ত্যাগ করলে, যক্ষরাজ কুবের এসে ধ্রুবকে বললেন—'হে ধ্রুব ! তুমি যে ক্রোধ পরিহার করেছ তাতে আমি খুশি। জীবের নিয়ন্তা কাল যক্ষরাও তোমার ভাইকে বধ করেনি আবার তুমিও যক্ষদের বধ করনি। তোমার মঙ্গল হোক। অতএব সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের জন্য সেই শ্রীভগবানের ভজনা করো। তিনি সগুণ অবস্থায় ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির সঙ্গে যুক্ত থাকেন আবার নির্গুণ অবস্থায় তিনিই মায়াতীত। অতএব তাঁরই আরাধনা করো।

কুবের বরদান করতে চাইলে ধ্রুব প্রার্থনা করলেন—'আমি যেন ভবসাগরের কাণ্ডারী শ্রীহরির চিন্তায় নিত্যযুক্ত থাকি।' কুবের তাই দিলেন আর ধ্রুব সন্তুষ্ট হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে যথোচিতভাবে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

বহু বৎসর রাজ্যশাসন করে ধ্রুব নিজ পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে জগতের বস্তুসকল অনিত্য জ্ঞানে বদরীকাশ্রমে চলে গেলেন। সেখানে তিনি মুহুর্মুহু সমাধিস্থ হতে লাগলেন ; তাঁর অহংভাব থেকে মুক্তিলাভ হল। হঠাৎ ধ্রুব একদিন দেখলেন যে একটি উজ্জ্বল রথ আকাশ পথে নেমে এল। সেই রথ তাঁকে সেই পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত করল যা ধ্রুবমণ্ডল নামে পরিচিত।

———o———

পৃথু উপাখ্যান

সুধিয়ঃ সাধবো লোকে নরদেব নরোত্তমাঃ।
নাভিদ্রুহ্যন্তি ভূতেভ্যো যর্হি নাত্মা কলেবরম্॥ (৪।২০।৩)

মহারাজ অঙ্গ রাজত্ব ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় প্রজাগণের মধ্যে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। তখন ব্রহ্মবাদী ভৃগু প্রমুখ মুনি মাতা সুনীথাকে আহ্বান করে ও তাঁর সম্মতি নিয়ে বেনকে পৃথিবীর অধিপতিপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করে বেন অষ্ট লোকপাল দেবতার মহিমার অংশভাগীরূপে পরিগণিত হয়ে ঔদ্ধত্য ও অহংকারের চরম সীমা অতিক্রম করল এবং নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে মহাপুরুষদের অপমান করতে লাগল। তার নির্দেশে সকল যজ্ঞ, দান বা হোম নিষিদ্ধ করা হল। বিপথগামী রাজা বেনকে অযোগ্য জ্ঞান করে মুনিগণ তার উপর অসন্তুষ্ট হলেন। শ্রীভগবান বিষ্ণুর নিন্দাকারী রাজা বেন মৃত্যুমুখে পতিত হলে মুনিগণের পরামর্শে অমাত্যগণ বেনের দেহজাত বালক পৃথুকে সিংহাসনে বসালেন। মুনিগণ দেখলেন যে বালক পৃথু ভগবান বিষ্ণুর ভুবনপালনকারী কলা ও লক্ষ্মীর অবতারস্বরূপ সংযোগ হতে উৎপন্ন। রাজাদের মধ্যে পৃথু অগ্রগণ্য হবেন। তাঁরা দেখলেন যে ভগবান শ্রীহরির অংশ পৃথুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন অর্থাৎ তিনি অংশাবতার।

যখন ব্রাহ্মণগণ পৃথুর স্তুতি কীর্তনে মুখর হলেন, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ গুণগান করতে লাগলেন, সিদ্ধগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন তখন পৃথু সেই অল্প বয়সেই সহাস্যে জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন—'হে সৌম্য সূত-মাগধ-বন্দীগণ ! এখনও ইহলোকে আমার কোনো গুণই প্রকাশিত হয়নি। তাহলে আপনারা আমার কোন্ গুণকে অবলম্বন করে স্তুতি করছেন ? আমার সম্পর্কে আপনাদের ব্যর্থ উক্তি না করে অন্য কারো স্তুতি করা উচিত। পুণ্যশ্লোক ভগবান শ্রীহরির গুণকীর্তনের মতো সাধুবাদযোগ্য বিষয়

থাকা সত্ত্বেও তুচ্ছ মানুষের স্তব করা কোনো শিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয় নয়।' উদারচরিত্র ব্যক্তিগণ ক্ষমতাসম্পন্ন ও খ্যাতিমান হলেও নিজের প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করা লজ্জাজনক মনে করে থাকেন ও তার নিন্দা করেন।

ব্রাহ্মণগণ মহারাজ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে তাঁকে প্রজাদের রক্ষকরূপে ঘোষণা করলেন। সেই সময় পৃথিবী অন্নহীন হয়ে গিয়েছিল ; চতুর্দিকে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর শীর্ণ দেহে প্রজারা তখন তাদের প্রভু পৃথুর কাছে এসে নিবেদন করলন—'আমরা নিরন্ন ও ক্ষুধার জ্বালায় পীড়িত। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।'

প্রজাদের দুর্দশার কথা মহারাজ পৃথু শুনলেন। অন্নাভাবের কারণও তিনি অবগত হলেন। তিনি বুঝলেন যে পৃথিবী সমস্ত অন্ন ও ঔষধির বীজ অন্তরে লুকিয়ে রেখেছে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তিনি পৃথিবীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ধনুর্বাণ তুললেন। উদ্যত অস্ত্র পৃথিবীকে ভীত ও কম্পিত করে তুলল। পৃথিবী তখন গোরূপ ধারণ করে পলায়ন করতে থাকলে মহারাজ তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন, পৃথুর ক্রোধ থেকে তাঁর রক্ষা পাওয়া কঠিন ছিল। অবশেষে পলায়নে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পৃথিবী মহাভাগ পৃথুকে সম্বোধন করে বললেন—'হে ধর্মজ্ঞ ও শরণাগত বৎসল মহারাজ ! আপনি সর্বপ্রাণীর রক্ষাকর্তা, আমাকেও রক্ষা করুন। আমি আপনার শরণাগত।'

মহারাজ পৃথু বললেন—'হে পৃথিবী ! তুমি আমার শাসন অতিক্রম করেছ। তুমি দেবতারূপে যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করো অথচ তার পরিবর্তে আমাদের অনুদান করছ না।'

মহারাজ পৃথু জানতে পারলেন যে পুরাকালে যে সকল (ধান্যাদি) ঔষধি সৃষ্ট হয়েছিল তা অসৎ দুরাচারযুক্ত ব্যক্তিগণ ভোগ করছে দেখে পৃথিবীই যজ্ঞের কারণে সমস্ত ঔষধি নিজের মধ্যে সঞ্চিত রেখেছে। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় তা জীর্ণ হয়ে পড়েছে। তা পূর্বাচার্যগণের প্রদর্শিত পথে উদ্ধার করা সম্ভব। পৃথিবী আরও বললেন—'হে লোকপালক মহাবাহু বীর ! আপনি সর্বপ্রাণীর রক্ষায় বলপ্রদায়ক খাদ্য লাভ করতে ইচ্ছা করলে উপযুক্ত বৎস, দোহনপাত্র ও দোহনকর্তা সংগ্রহ করুন। আমি সেই বৎসের প্রতি স্নেহবশত দুগ্ধরূপে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করব।

'হে প্রভু ! আরও একটি নিবেদন শুনুন। আপনি আমাকে সমতল করুন। আমি সমতল হলে জলসম্পদ ধারণ করতে সক্ষম হব।'

মহারাজ পৃথু পৃথিবীর এই প্রিয় ও কল্যাণকর উপদেশ স্বীকার করে নিলেন। তিনি স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস করে নিজের হাতে সমস্ত ধান্যাদি ঔষধি ও শস্য দুগ্ধরূপে দোহন করে নিলেন। অন্যান্য বিজ্ঞজনেরাও এইভাবে পৃথিবীর কাছ থেকে অভীষ্ট বস্তু দোহন করে নিয়েছিলেন। ঋষিগণ বৃহস্পতিকে বৎস করে ইন্দ্রিয় (বাক্, মন এবং শ্রোত্র) পাত্রে দেবী বসুন্ধরার কাছ থেকে বেদরূপ পবিত্র দুগ্ধ দোহন করে নিয়েছিলেন। কপিলদেবকে বৎস করে আকাশরূপ পাত্রে সিদ্ধগণ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও বিদ্যাধরগণ আকাশচারিতা প্রভৃতি বিদ্যা দোহন করেছিলেন। পৃথিবীর দ্বারা এইভাবে সর্বজনের সর্বকামনা পূর্তি হওয়ায় মহারাজ পৃথু স্নেহার্দ্রহৃদয় এই সর্বংসহা জীবধাত্রীকে নিজ আদরের কন্যারূপে স্বীকৃতি দিলেন। নিজ ধনুর প্রান্তভাগ দ্বারা বহু পর্বতের ঊর্ধ্বাংশ চূর্ণ করে ভূমির বিশাল অংশ সমতলে পরিণত করলেন। অতঃপর মহারাজ পৃথু প্রজাপালনে রত হলেন। এই সমতলভূমির বিভিন্ন স্থানে প্রজাদের জন্য যথাযোগ্য বাসভূমি বিভাগ করে দিলেন। তিনি গ্রাম, ছোট ও বড় নগর, বহুপ্রকারের দুর্গ, ঘোষপল্লি, গো-মহিষের বাসস্থান, সৈন্যশিবির, খনি ও তৎসন্নিহিত বাসভূমি, কৃষকপল্লি সবই সুনির্দিষ্টরূপে বিভাগ করে মানুষের বাসস্থানের পরিকল্পিত নির্মাণরীতি প্রবর্তন করলেন।

এইবার ভগবান মনুর ব্রহ্মাবর্ত ক্ষেত্র—যেখানে সরস্বতী নদী পূর্বমুখে প্রবাহিতা, সেইখানে মহারাজ পৃথু শত অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য দীক্ষিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। মহারাজ পৃথুর যজ্ঞে যজ্ঞাত্মা সর্বলোকগুরু জগদীশ্বর ভগবান শ্রীহরি যজ্ঞেশ্বররূপে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মা, শিব এবং নিজ নিজ অনুচরবৃন্দ সহ লোকপালগণও উপস্থিত হয়েছিলেন। গন্ধর্ব, মুনি এবং অপ্সরাগণ তখন শ্রীভগবানের স্তুতিগান করছিলেন। সিদ্ধ, বিদ্যাধর, দৈত্য, দানব, যক্ষ, সুনন্দ-নন্দাদি প্রধান পার্ষদগণ এবং যাঁরা সর্বদাই শ্রীভগবানের সেবার জন্য উৎসুক সেই কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয় এবং সনকাদি যোগেশ্বরগণ সকলে

শ্রীহরির অনুগমন করেছিলেন। যজ্ঞধেনুরূপে উপস্থিত পৃথিবী কামধেনুরূপে যজমান মহারাজকে প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই প্রদান করেছিলেন। নদীসকল ইক্ষু-দ্রাক্ষাদি সর্বপ্রকার রস বহন করে এনেছিল এবং অতি বৃহৎ মধুবর্ষী বৃক্ষসমূহ দুগ্ধ, দধি, অন্ন এবং ঘৃতাদি বিভিন্ন দ্রব্য প্রদান করেছিল। পর্বতসকল খাদ্যদ্রব্য ও লোকপালগণ বিবিধ উপহার দ্রব্য প্রদান করেছিলেন।

মহারাজ পৃথু কেবলমাত্র ভগবান শ্রীহরিকে নিজ প্রভু বলে মনে করতেন। শ্রীহরির কৃপায় তাঁর প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল যা ইন্দ্রের ঈর্ষার কারণ হয়। মহারাজ পৃথু যখন অন্তিম (শততম) যজ্ঞ দ্বারা ভগবান যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করছিলেন তখন ইন্দ্র ঈর্ষাবশে গুপ্তরূপে তাঁর যজ্ঞের অশ্ব হরণ করলেন। অশ্বটিকে নিয়ে পলায়নের সময়ে ভগবান অত্রিমুনি তাঁকে দেখতে পেলেন। ইন্দ্র তখন মস্তকে জটাজুট ধারণ করে থাকায় ও অঙ্গে ভস্ম ধারণ করায় পৃথু তনয় তাঁকে মূর্তিমান ধর্ম মনে করে বাধা দিলেন না। কিন্তু মহর্ষি অত্রি ইন্দ্রকে চিনিয়ে দিলে পৃথুকুমার আকাশপথে দ্রুতবেগে ইন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ইন্দ্র ভীত হয়ে অন্তর্ধান করলে বীর রাজপুত্র যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়ে আনলেন। অতঃপর রাজকুমার 'বিজিতাশ্ব' রূপে মুনিগণ কর্তৃক পরিচিত হলেন। ইন্দ্রের বারবার বাধাদান মহারাজ পৃথুকে ক্রোধান্বিত করল। তিনি রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। ঋত্বিকগণ দেখলেন যে পরাক্রমশালী মহারাজ পৃথু ইন্দ্রকে বধ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁরা মহারাজ পৃথুকে বললেন যে, যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার পর কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞপশু ভিন্ন অন্য কাউকে বধ করা অনুচিত। তাঁরা আরও বললেন যে অমোঘ মন্ত্রদ্বারা আবাহন করে ইন্দ্রকে তাঁরা বলপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিয়ে দেবেন।

যজমান মহারাজ পৃথুকে এই কথা বলে তাঁর ঋত্বিকগণ সক্রোধে ইন্দ্রকে আবাহন করলেন। তাঁরা আহুতি দিতে উদ্যত হলে স্বয়ং ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে বললেন—হে ঋত্বিকগণ ! ইন্দ্রকে আহুতি দান অনুচিত কার্য, কারণ ইন্দ্র তো যজ্ঞ নামে পরিচিত ; তা বস্তুত শ্রীভগবানের মূর্তি। তোমাদের যজ্ঞদ্বারা আরাধিত দেবতাগণও ইন্দ্রেরই অংশবিশেষ। তাই যজ্ঞদ্বারা ইন্দ্রকে বিনাশ করবার চিন্তা সঠিক নয়। মহারাজ পৃথুর বিপুল কীর্তিসমূহের মধ্যে একটি যজ্ঞ

না হয় অসম্পূর্ণই রইল তাতে কিছু এসে যাবে না। শতযজ্ঞ সম্পাদন না হয় না হল।'

ভগবান ব্রহ্মা অতঃপর মহারাজ পৃথুকে বললেন—'রাজন্ ! আপনি মোক্ষধর্মজ্ঞ। আপনার এই যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। আপনি ও ইন্দ্র দুইজনই পবিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীহরির মূর্তি, সুতরাং আপনার স্বরূপভূত ইন্দ্রের প্রতি আপনার কুপিত হওয়া উচিত নয়। তাঁর প্রতি বৈরীভাব পরিহার করুন।'

যজ্ঞভোক্তা যজ্ঞেশ্বর সর্বশক্তিমান ভগবান বিষ্ণুও মহারাজ পৃথুর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তখন ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে পৃথুর নিকটে উপস্থিত হলেন।

ভগবান বিষ্ণু বললেন—'রাজন্ ! এই ইন্দ্র তোমার যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করেছে তাই সে সন্তপ্ত। তুমি তাঁকে ক্ষমা করে দাও।'

হে নরদেব ! যাঁরা সাধুপ্রকৃতির ও সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন নরলোকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ। কোনো জীবের উপর তাঁরা দ্রোহ পোষণ করেন না। তোমার মতন ব্যক্তিও যদি আমার দৈবী মায়ায় মোহিত হয় তাহলে তো বলতে হয় যে জ্ঞানীজনের দীর্ঘকাল সেবা করে তুমি বৃথা পরিশ্রম করেছ। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি এই দেহকে কেবলমাত্র অবিদ্যা, বাসনা ও কর্মদ্বারা মোহিত জেনে এর প্রতি আসক্ত হয় না। এইভাবে যার দেহের উপরই আসক্তি নেই সেই বিবেকযুক্ত ব্যক্তি দেহের মাধ্যমে স্বীকৃত গৃহ, পুত্র অথবা ধনসম্পদের উপর কেমন করে আসক্ত হবে ?

আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ, নির্গুণ, গুণাশ্রয়, সর্বব্যাপী, আবরণরহিত, সর্ববিষয়ে সাক্ষী, অধিষ্ঠানরহিত। অতএব দেখা যাচ্ছে যে আত্মা দেহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। যার এই জ্ঞান হয়েছে, তার বিষয়াসক্তি থাকে না ; তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সে তখন ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়—মোক্ষ লাভ করে।'

শ্রীভগবান পৃথুকে আবার বললেন—'হে বীর ! তুমি উত্তম, মধ্যম ও অধম সকলের প্রতি সমদর্শী হয়ে, সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন থেকে এবং মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে জয় করে প্রজাপালন করো ; তাতেই তুমি পরম শান্তি ও পরমপদ লাভ করবে। অতএব পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণদের অনুমোদিত এবং সনাতন

ধর্মকেই প্রাধান্য দিয়ে ও অন্য সকল বিষয়ে নিরাসক্ত হয়ে এই পৃথিবী শাসন করো। সকলেই তোমার প্রতি অনুরক্ত হবে এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তুমি তোমার গৃহে সনকাদি সিদ্ধগণের দর্শন লাভ করবে। তোমার গুণ ও চরিত্রমাহাত্ম্য আমাকে প্রসন্ন করেছে। তুমি ইচ্ছা মতন বর প্রার্থনা করে নাও।'

শ্রীভগবানের আদেশে মহারাজ পৃথু ইন্দ্রের উপর তাঁর অসন্তোষ ত্যাগ করলেন। কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ইন্দ্র তাঁর পাদস্পর্শ করে ক্ষমা চাইতে উদ্যত হলে পৃথু তাঁকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর মহারাজ পৃথু বিশ্বাত্মা ভক্তবৎসল ভগবানকে পূজোপহার নিবেদন করে পরম ভক্তি সহকারে তাঁর চরণকমলযুগল ধারণ করলেন। বদ্ধাঞ্জলি আদিরাজ পৃথু নয়নযুগল প্রেমাশ্রুধারায় প্লাবিত হওয়ায় শ্রীভগবানকে দর্শন করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না, কণ্ঠ কল্পরুদ্ধ হওয়ায় কিছু বলতেও পারছিলেন না। তিনি শ্রীভগবানকে আলিঙ্গন করে নিজ হৃদয়ে ধারণ করলেন ও সেইভাবেই অবস্থান করতে লাগলেন। অবশেষে পৃথু নিজেকে সংযত করে অতৃপ্ত নয়নে শ্রীভগবানকে দেখতে লাগলেন। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ভূমি স্পর্শ করেছিল আর করাগ্র গরুড়ের উন্নত স্কন্ধে বিন্যস্ত ছিল।

অবশেষে পৃথু বলতে লাগলেন—'হে মোক্ষপতি প্রভু ! আপনি ব্রহ্মা আদি বরদাতা দেবতাগণকেও বরদানে সমর্থ। বিষয়সুখের মতন তুচ্ছ পদার্থ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি না। মহাপুরুষগণের মুখনিঃসৃত আপনার লীলাগুণগান যেখানে নেই তা যদি মোক্ষপদও হয়, তবে তাও আমি চাই না।'

হে অনন্তকীর্তি ! আপনার মঙ্গলময় কীর্তিকথা একবার যে শ্রবণ করেছে সে যদি নিতান্তই পশুপ্রকৃতির না হয় সে সতত তাই শ্রবণ করতে আগ্রহী হবে। আপনি আমাকে অসংখ্য কর্ণ তথা শ্রবণেন্দ্রিয় দান করুন যাতে প্রাণ-ভরে আপনার গুণকথা শ্রবণ করতে পারি। কেবলমাত্র দুইটি কানে আপনার গুণকথা শুনে তৃপ্তি পাচ্ছি না। এই আমার প্রার্থনা।'

এইভাবে মহারাজ পৃথু শ্রীভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন। তাঁর স্তুতি শ্রবণ করে সর্বসাক্ষী ভগবান শ্রীহরি তাঁকে বললেন—'রাজন্ ! আমার প্রতি

তোমার ভক্তি হোক। মায়ার প্রভাব ত্যাগ করে তোমার চিত্ত যে আমাতে এইভাবে অনুরক্ত হয়েছে তা অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। এখন তুমি নিশ্চিন্তে আমার আদেশ পালন করে প্রজাপালন করো। তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক।'

মহারাজ পৃথুর পূজার্চনা গ্রহণ করে সকল অনুগ্রহ বর্ষণ করে শ্রীভগবান প্রস্থানে উদ্যত হলেন। মহারাজ পৃথু সমাগত দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, নাগ, কিন্নর, অপ্সরা, মানব, পক্ষী ও অন্যান্য বহুবিধ প্রাণী ও শ্রীভগবানের পার্ষদগণ—সকলকেই ভক্তিপূর্বক সম্ভাষণ ও দক্ষিণাদি ধনদ্বারা যুক্তকরে সম্মান জ্ঞাপন করলেন। ভগবান অচ্যুতও সকলের চিত্ত হরণ করে বৈকুণ্ঠধামে গমন করলেন।

অতঃপর মহারাজ পৃথু ন্যায় ও ধর্ম পথে অবিচল থেকে নিষ্কামভাবে প্রজাপালন করতে লাগলেন। তাঁর কর্ম নিষ্কাম হওয়ায় কর্মফল সঞ্চয়ের প্রশ্ন আদৌ ছিল না। প্রারব্ধ ক্ষয় হওয়ায় কর্মশ্রোতরূপ জন্মমৃত্যু প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি জ্ঞান ও ভক্তির চরম সীমায় উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করে উপস্থিত সকলকে অতি সুন্দরভাবে নিজ কৃত্য-কর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। সকলেই মহারাজ পৃথুর প্রশংসা করেছিলেন। এই সময়ে সূর্যসম দেদীপ্যমান মুনি চতুষ্টয়ের আগমন হয়। মহারাজ পৃথু সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমারকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিলেন।

মহারাজ পৃথু তখন সর্বজীবের মঙ্গলের জন্য মুনিদের প্রশ্ন করেছিলেন —'কিসে সকলের মঙ্গল হবে ? কেমন করে মঙ্গল হবে ?'

সনৎকুমার উত্তর দিয়েছিলেন—"মঙ্গল কামনায় দেহাদির প্রতি অনাসক্তি এবং পরব্রহ্মস্বরূপ আত্মার প্রতি প্রবল আসক্তি, তীব্র অনুরাগ থাকা প্রয়োজন ; ঈশ্বরে অনুরাগ ও সংসারে বিরাগ। 'আমি, আমার' ভাব, অহংভাব ত্যাগ করলেই যথার্থ মঙ্গল হবে।

শ্রদ্ধা, ভাগবত ধর্মের অনুষ্ঠান, আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা, আধ্যাত্মিক যোগ সাধনায় নিষ্ঠা, স্মরণ-মনন ও কীর্তন দ্বারা আত্মাতে রতি ও দেহাদিতে অনাসক্তি হয়।

শ্রীভগবানের উপর রতি ও বিষয়ের উপর বৈরাগ্য, অহিংসা, নিবৃত্তি, কল্যাণের জিজ্ঞাসা, লীলাকথা পানে ব্যাকুলতা, সংযম, কামনাবাসনা ত্যাগ, শৌচাদি নিয়ম পালন, পরনিন্দায় অরুচি, স্পৃহারাহিত্য ও শীত-উষ্ণ আদি দৈব সন্তাপ সহ্য করায় কল্যাণ হয়ে থাকে।

শ্রীভগবানের শরণাগত হতে হয়। নিত্যমুক্ত, নির্মল, সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান জ্ঞানরূপে আবির্ভূত হন। শরণাগত হলেই তিনিই ভক্তের সকল ভার গ্রহণ করেন।

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করে সহজেই অহংকার থেকে মুক্তি লাভ করা যায় ; জ্ঞান ও যোগ সাধনার পথে মুক্তি পাওয়া কঠিন তাই শরণাগত বৎসল ভগবান শ্রীবাসুদেবের ভজনা করা প্রয়োজন।”

যখন সনৎকুমার সুস্পষ্টভাবে বললেন যে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার অর্থাৎ জ্ঞান পথের চেয়ে সগুণ সাকার উপাসনা অর্থাৎ ভক্তিযোগের পথ সহজ, তখন মহারাজ পৃথু তাইতেই মগ্ন হয়ে গেলেন।

মুনিগণ উপদেশ দান করে আকাশপথে গমন করলেন। মহারাজ পৃথু নিরাসক্তভাবে রাজ্য শাসন করতে থাকলেন। তিনি ক্ষমা গুণে ছিলেন পৃথিবীর মতন, লোক কল্যাণে স্বর্গের মতন আর তৃপ্তি বিধানে ছিলেন মেঘের মতন। তিনি বহুকাল রাজ্যপালন করে অবশেষে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে শ্রীভগবানের আরাধনায় ব্রতী হলেন। ক্রমে তাঁর অবিদ্যাজনিত দেহবুদ্ধি দূর হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ হল আর তিনি পরম আকাঙ্ক্ষিত শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ করলেন। বানপ্রস্থে গমনকালে তিনি পুত্রদের রাজ্যভার দিয়ে প্রজাপালন কার্য সম্পূর্ণ করেছিলেন।

মহারাজ পৃথু যেন সর্বকালের অনুকরণীয় কল্যাণের রাজমার্গসম ছিলেন। তাঁর জীবনে জ্ঞান ও ভক্তি দুইই পূর্ণরূপে দেখা গিয়েছিল। তাঁকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে ভবসাগর পার করা সম্ভব।

মহামুনি মৈত্রেয় কর্তৃক মহাত্মা বিদুরকে এই মহারাজ পৃথু উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছিল। আজও ভক্তগণের পক্ষে এই বৃত্তান্ত পূর্ণরূপে প্রাসঙ্গিক বলেই পরিচিত।

———o———

জড় ভরত

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সাক্ষাৎস্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ।
নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ স্বমায়য়াঽঽত্মন্যবধীয়মানঃ॥ (৫।১১।১৩)

মনুবংশজাত ঋষভদেবের শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত পিতার ইচ্ছানুসারে রাজা ভরতরূপে প্রজাপালনে নিযুক্ত হয়েছিলেন। রাজা ভরতের নামেই অজনাভ নামক ভূখণ্ড আজ ভারতবর্ষ নামে পরিচিত। পরম জ্ঞানী ভরত বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করে অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবানকে হৃদয়াকাশে শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, শঙ্খ, চক্র, গদা আদি দ্বারা সুশোভিত ও দেদীপ্যমান অনুভব করে ভক্তিপথে প্রতিষ্ঠিত থেকে গভীর বাৎসল্য সহকারে এবং রাজধর্ম অনুসারে প্রজাপালন করেছিলেন। কোটি বৎসর অতীত হলে তিনি রাজ্যভোগের প্রারব্ধ সমাপন অনুমান করে সম্পত্তি পুত্রদের দিয়ে হরিহর ক্ষেত্র পুলহাশ্রমে চলে এসেছিলেন। এই পুলহাশ্রমের ভক্তদের উপর শ্রীভগবানের বাৎসল্য প্রেম অপরিসীম। তাঁরা আজও তাঁকে ইষ্টজ্ঞান করে থাকেন। সেইখানে উপরে ও নীচে চক্রাকার নাভিচিহ্ন শালগ্রাম শিলা বহনকারী চক্রনদী (গণ্ডকী নামে প্রসিদ্ধ নদী) ঋষিদের আশ্রমকে সর্বরূপে পবিত্র করে রাখে। সেই পুলহাশ্রমের উপবনে একান্তে বাস করে তিনি বহু রকমের পত্র, পুষ্প, তুলসী, জল, কন্দ, মূল, ফল সহযোগে শ্রীভগবানের আরাধনায় নিত্যযুক্ত থাকতেন। নিয়মিত সেবায় অনুরাগের বৃদ্ধি হলে তাঁর হৃদয় শান্ত হয়ে গিয়েছিল। ভক্তিযোগের বৃদ্ধিতে পরমানন্দ লাভ করে হৃদয়রূপ সরোবরে বুদ্ধি নিমগ্ন হলে তাঁর নিয়মানুসারে শ্রীভগবানের আরাধনাও বন্ধ হয়েছিল। কৃষ্ণমৃগচর্মধারী ভরত ত্রিস্নান করায় তাঁর কেশ সর্বদাই সিক্ত থাকত এবং তা পিঙ্গল জটায় পরিণত হওয়ায় তিনি অতীব সুন্দররূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

একবার মহারাজ ভরত স্নান শৌচাদি ও নিত্যকর্ম সম্পাদন করে গণ্ডকী (মহানদী) নদীতে প্রণবমন্ত্র জপ করছিলেন। এমন সময়ে এক তৃষ্ণার্ত হরিণ একাকী তৃষ্ণা নিবারণে নদীতে এসেছিল। আচমকা সিংহের গর্জন শুনে সেই হরিণ নদী পার হবার জন্য লাফ দিয়েছিল। হরিণটি ছিল গর্ভবতী। সিংহের গর্জনে ভীত হরিণটি প্রসব করে ফেলল আর নিজে জলস্রোতে পাহাড়ের গুহায় গিয়ে প্রাণ হারাল। রাজর্ষি দেখলেন যে সেই মাতৃহারা হতভাগ্য হরিণশাবক একাকী নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। রাজর্ষি ভরতের মৃগশাবকের উপর দয়া হল। তিনি তাকে জল থেকে তুলে আশ্রমে নিয়ে এলেন। মৃগশাবকের উপর তাঁর মমতা দিনে দিনে বর্ধিত হতে লাগল আর তিনি হরিণশাবকের দেখাশোনাতেই নিত্যযুক্ত থাকতে লাগলেন। তাঁর তপস্যায় বাধা পড়ল ; নিয়ম, যম ও নিত্য ভগবৎপূজা সকলই ধীরে ধীরে ব্যাহত হতে লাগল। তাঁর মৃগশাবকের উপর আসক্তি এত বেড়ে গেল যে তিনি শয়নে, স্বপনে, জাগরণে মৃগশিশুর কথাই চিন্তা করতে লাগলেন। যে ধর্মানুষ্ঠান ও ভগবৎ সেবার জন্য তিনি তাঁর পুত্রদের পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন, মৃগশিশুর প্রতি মোহ-মায়ার ফলে তাতে বাধার সৃষ্টি হল। মৃগ-শিশুটি তাঁর জপ-ধ্যানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল। এমন সময়ে অপ্রতিহত কাল উপস্থিত হল এবং মৃগের উপর আসক্ত অবস্থাতেই তাঁর দেহত্যাগ হল।

তদনন্তর মৃত্যুকালীন ভাবনা অনুসারে দেহান্তরে তিনি মৃগ-শরীর ধারণ করলেন। কিন্তু তাঁর সাধনা পরিপূর্ণ ছিল, তাই তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতি নষ্ট হল না। পূর্বজন্মের ভগবদারাধনার প্রভাবে মৃগদেহ ধারণ করবার কারণ উপলব্ধি করে তিনি শোকাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হল। তিনি জন্মভূমি কালঞ্জর পর্বত থেকে শান্তস্বভাব মুনিদের প্রিয় শালগ্রাম তীর্থে পুলস্ত্য ও পুলহ ঋষির আশ্রমে চলে এলেন। মৃগযোনি প্রাপ্তিরূপ প্রারব্ধের অবসানের জন্য তিনি প্রতীক্ষা করতে থাকলেন। অবশেষে একদিন গণ্ডকী নদীতে অর্ধ-নিমজ্জিত অবস্থায় তাঁর দেহত্যাগ হল।

এইবার আঙ্গিরস গোত্রের আনন্দময় সর্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁর

জন্ম হল। ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় পত্নীর যমজ পুত্র-কন্যার মধ্যে পুত্ররূপে পরম ভাগবত রাজর্ষি ভরতের আগমন হল। শ্রীভগবানের কৃপায় এইজন্মেও তাঁর পূর্বজন্ম সকলের কথা মনে ছিল। এইবার তিনি সাবধান হয়ে রইলেন। বাধা-বিঘ্ন দূরে রাখতে তিনি নিজেকে আত্মীয়স্বজন থেকেও দূরে রাখতে লাগলেন। নিজেকে পাগল, মূর্খ এবং বোবাকালা প্রতিপন্ন করে তিনি সর্বদাই শ্রীভগবানের চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করে রাখতেন যাতে শ্রীভগবানের স্মরণ-মনন-সংকীর্তনে আর বাধা না আসে। পিতার তো তাঁর প্রতি স্নেহ ছিলই। তাই তিনি সেই জড়প্রকৃতি উন্মাদসম পুত্রের শাস্ত্রানুসার সমাবর্তন পর্যন্ত সংস্কার বিধানের ইচ্ছায় তাঁকে উপবীত ধারণ করালেন। পুত্রকে উপযুক্ত বেদাধ্যয়ন ব্রত, শৌচাদি শিক্ষাদানের জন্য পিতা যথেষ্ট চেষ্টা করলেন। কিন্তু পিতার অক্লান্ত পরিশ্রম সফল হয়নি। পিতা ও মাতা যথাসময়ে কালের করালগ্রাসে বিদায় নিলেন।

ভরতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ কর্মকাণ্ডকেই প্রাধান্য দিয়ে আত্মবিদ্যায় অজ্ঞান ছিলেন তাই তাঁরা ভরতের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অন্ধকারে ছিলেন। ভ্রাতাদের কাছে ভরত অতিমূর্খ বলেই পরিচিত রইলেন। বিদ্যাধ্যয়নের ওই-খানেই পরিসমাপ্তি হল। মানাপমান জ্ঞানরহিত ভরতকে লোকেরা জড়, মূর্খ বা বধির বলতে লাগল। তিনি বিনা প্রতিবাদে কটূ কথা সহ্য করে যেতেন। বেগার, অল্প-মজুরি অথবা কারো অনুগ্রহ সাপেক্ষে যৎকিঞ্চিৎ আহার যা জুটত, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি অহেতুকভাবেই স্বয়ংসিদ্ধ, চিদানন্দরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন বলে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব তাঁকে কখনো স্পর্শ করত না আর সেই কারণে তাঁর দেহাভিমানও জাগত না। তিনি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ঝড় উপেক্ষা করে কটি বস্ত্র মাত্র পরিধান করে অনাবৃত দেহে মাটিতে পড়ে থাকতেন। তৈল স্নানের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় তাঁর মলিন দেহের ব্রহ্মতেজ মৃত্তিকাচ্ছাদিত হীরের মতন আচ্ছাদিত থাকত। 'ব্রাহ্মণদের কলঙ্ক', 'অধম' আদি তিরস্কার অগ্রাহ্য করে তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে লাগলেন। এইসময় তিনি ভ্রাতাগণ কর্তৃক জমির আল রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হলেন, বিনিময়ে ভ্রাতাগণ তাঁকে ভুসি, চাউলের খুদ

ইত্যাদি মানুষের অখাদ্য বস্তু খেতে দিত।

এইসময়ে তিনি শূদ্রবংশীয় এক ডাকাত সর্দারের হাতে পড়েন। সন্তান কামনায় সেই ডাকাত সর্দার দেবী ভদ্রকালীর কাছে নরবলি দেওয়ার মানত করেছিল। ডাকাতদল জড়ভরতকে আলের উপর প্রহরার কার্যে নিযুক্ত দেখে তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মাতা চণ্ডিকার মন্দিরে নিয়ে গেল। নরবলির পূর্বে জড়ভরতের কপালে স্নান, নবীন বস্ত্রধারণ ও উত্তম আহার্য জুটল। অতঃপর তাঁকে বলিদানে জন্য দেবী ভদ্রকালীর সম্মুখে আনা হল। এইভাবে ডাকাতদল শ্রীভগবানের অংশজাত ব্রাহ্মণ সাধুব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হল। দেবী ভগবতী এই কার্য অনুমোদন করলেন না। তাঁর দেহ থেকে ব্রহ্মতেজ নির্গত হল। তিনি সশরীরে ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হলেন। দেবীর বরাভয়কর সেই খড়্গাই ধারণ করল যা কিছুক্ষণ পূর্বে জড়ভরতকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। দেবী ভদ্রকালী করালবদনা রক্তবর্ণলোচনা ভয়ংকরী রূপে ছয় ডাকাতের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন আর মহাপুরুষ ব্রহ্মনিষ্ঠ জড়ভরতকে রক্ষা করলেন। অতঃপর দেবী ভদ্রকালীর মন্দিরে বলিদান বন্ধ হল আর তিনি বৈষ্ণোদেবী নামে পূজিতা হতে লাগলেন।

অতঃপর একদিন ব্রাহ্মণ জড়ভরত যখন ইক্ষুমতী নদীর তীরে উপবিষ্ট তখন সৌবীর দেশের রাজা রহূগণ পালকি সহযোগে গমন করছিলেন। হৃষ্টপুষ্ট শক্তিশালী যুবক জড়ভরতকে দেখে রাজা রহূগণ তাঁকে অন্যবাহকদের সঙ্গে যুক্ত করে পালকিবাহকরূপে নিযুক্ত করলেন। পালকিবহন করবার সময়ে দ্বিজবর সাবধান থাকলেন যাতে তাঁর পদতলে অন্য কোনো প্রাণী পড়ে পিষ্ট না হয়ে যায়। অতএব অন্যান্য বাহকদের সঙ্গে তাল রেখে চলা জড়ভরতের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। রাজা রহূগণ পালকির অসমগতিতে অসন্তুষ্ট হলেন। জড়ভরতের কপালে জুটল শ্লেষ ও তিরস্কার —'ক্লান্ত নাকি !' 'অন্যরা সাহায্য করছে না ?' 'অপ্রতুল শক্তি, স্থূল জরাগ্রস্ত'। কোনো উত্তর না দিয়ে জড়ভরত পালকি বয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন ; তাঁর দৃষ্টিতে যে পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি নির্মিত নিজ দেহের উপর অবিদ্যা ও মিথ্যা জ্ঞান ছিল। তিরস্কারের পরও পালকি

ঠিকমতন না যাওয়ায় রাজা রহূগণ অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগলেন—'আরে ! তুই কি জীবন্মৃত ! আদেশ অমান্য করছিস ! বদ্ধ উন্মাদ কোথাকার ! দণ্ডপাণি যমরাজ যেমন সকলকে অপরাধের জন্য শাস্তি দেন আমিও তোর অপরাধের চিকিৎসা করে দিচ্ছি। তখন তোর হুঁশ হবে।'

রাজা রহূগণ অহংকারযুক্ত হয়ে ভরতকে তিরস্কার করলেন। তিনি নিজেকে অতিবড় পণ্ডিত জ্ঞান করতেন তাই রজো ও তমোগুণের বশীভূত হয়ে তিনি ভগবানের অতিপ্রিয় ভক্ত ভরতকে অপমান করলেন। যোগেশ্বর কোটির মহাপুরুষগণের আচরণাদি সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। রাজার অপরিণত বুদ্ধি দেখে ভরত মনে মনে হাসলেন। তিনি শান্তভাবে রাজা রহূগণকে উত্তর দিলেন।

ব্রাহ্মণ জড়ভরত বললেন—'রাজন্ ! আপনার কথা সত্য। ভার তো বাহকদের আর রাস্তা যারা চলে ফিরে বেড়ায় তাদের জন্য। স্থূলতা শরীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য, চৈতন্য বা আত্মার সম্বন্ধে সেরূপ বলা যায় না। আপনার কথাটা বিজ্ঞোচিত নয়। দেহাভিমানধারণকারীর মধ্যেই স্থূলতা, কৃশতা, দৈহিক ব্যাধি, মানসিক বিকার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কলহ, ইচ্ছা, নিদ্রা, প্রেম, ক্রোধ, জরা, শোক, অহংকার থাকে যা আমার মধ্যে আদৌ নেই।

'রাজন্ ! আপনি জন্ম-মৃত্যুর কথা যা বললেন তা বিকারযুক্ত অর্থাৎ পরিণামশীল বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—তাদেরই আদি ও অন্ত হয়। আর আদেশ পালন সেখানেই প্রযোজ্য, যেখানে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ থাকে। 'আপনি রাজা আর আমি প্রজা'—এই ভেদবুদ্ধি কেবল লৌকিক ব্যবহারে হয়, আধ্যাত্মিকতায় তার প্রয়োজন কোথায় ? পারমার্থিক দৃষ্টিতে কে প্রভু আর কে ভৃত্য ? আপনি তো বীর আর আমি মত্ত, উন্মত্ত, জড়ের মতন নিজ স্থিতিতেই বিরাজমান থাকি। যা পূর্ণরূপে চূর্ণিত হয়ে আছে, তাকে পুনরায় চূর্ণ করে কী হবে ?

মুনিবর জড়ভরত রাজাকে এইভাবে তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে মৌন হয়ে গেলেন। তাঁর দেহাত্মবুদ্ধিজাত অজ্ঞান দূর হয়েছিল তাই তখন তিনি শান্ত। প্রারব্ধকর্ম ক্ষয় হেতু আবার পালকি তুলে নিয়ে চলতে লাগলেন। সিন্ধু সৌবীরাধিপতি

শ্রদ্ধালুসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকার তাঁর ছিল। তিনি সেই দ্বিজপ্রবরের শাস্ত্রসম্মত কথা শুনে তৎক্ষণাৎ পালকি থেকে নেমে পড়লেন। অহংকার তখন অস্তাচলে। তিনি ভরতের শ্রীচরণে প্রণত হয়ে বললেন—'হে দেব ! আপনি যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণ। আত্মপরিচয় গোপন রেখে বিচরণকারী আপনি আসলে কে ? দত্তাত্রেয় প্রমুখ অবধূতদের একজন কি ? আপনার পরিচয় দিন। আপনি কি স্বয়ং কপিলমুনি যিনি লোকদুর্দশা অবলোকনে নিত্য বিচরণশীল ? ইন্দ্রের বজ্র, মহাদেবের ত্রিশূল, যমরাজের দণ্ড, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু আর কুবেরের অস্ত্রশস্ত্র থেকেও আমার ব্রাহ্মণদের অপমানের ভয় বেশি। আমি আপনার শরণাগত।

হে দীনবন্ধু ! রাজত্বের অহংকারে মত্ত হয়ে আমি আপনার মতন মহান সাধুর অবমাননা করেছি। আমি আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি দেহাভিমানরহিত ও বিশ্ববন্ধু শ্রীহরির পরমভক্ত। সকলের প্রতি আপনার সমদৃষ্টি, তাই এ অপমান আপনাকে বিচলিত করেনি।'

জড়ভরত তাঁকে উত্তর দিলেন—'তত্ত্বজ্ঞানীগণ লৌকিক ব্যবহার, প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ আদিকে তত্ত্ববিচার কালে সত্য মনে করেন না। মানুষের মন ত্রিগুণের বশীভূত, তাই মন মানুষকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রতিরুদ্ধভাবে ভালোমন্দ কার্য সম্পাদন করাতেই থাকে। বিষয়াসক্ত মন মানুষকে সংসারচক্রে নিক্ষেপ করে আর বিষয়াসক্তিত্যাগে তাকে শান্তিময় মোক্ষের দিকে নিয়ে যায়। তাই আসক্তি ত্যাগই নিজ তত্ত্বে লীন করবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

মনের সঙ্গে ক্ষেত্রজ্ঞের কোনও সম্বন্ধই নেই। ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী ও জগতের আদি কারণ, পরিপূর্ণ, অপরোক্ষ, স্বয়ং প্রকাশ, জন্ম-রহিত, ব্রহ্মাদিরও প্রভু এবং নিজ অধীন মায়াদ্বারা সকলের অন্তঃকরণে উপস্থিত থেকে জীবের পরিচালক ও বিশ্বচরাচরের আশ্রয়স্থল ভগবান বাসুদেব স্বয়ং। তিনিই সর্বসাক্ষী আত্মস্বরূপে এই বিশ্বে প্রবিষ্ট হয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত জ্ঞানদ্বারা মায়া দূরীভূত হয়ে আসক্তি ত্যাগ আর ষড়রিপু জয় হয় এবং আত্মার উপাধিরূপ এই মনকে সংসারের

দুঃখ ও সন্তাপের ক্ষেত্র বলে মনে না করে, ততক্ষণই সে এই লোকেই বিচরণ করতে থাকে। এই মনই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শত্রু। তাই সাবধান হয়ে শ্রীগুরু ও শ্রীহরির পাদপদ্মের পূজারূপ শক্তিদ্বারা এই শত্রুকে বিনাশ করা প্রয়োজন।'

রাজা রহূগণ বললেন—'হে যোগেশ্বর ! হে পরমানন্দময় আত্মস্বরূপ ! আমি আপনাকে বারবার প্রণাম করছি। আপনি আমাকে ভার বহনাদি ক্রিয়া ও তার ফল শ্রমাদির সম্বন্ধে কৃপা করে বলুন।'

জড়ভরত বললেন—'রাজন্ ! এই দেহ মৃত্তিকার বিকার মাত্র। প্রস্তর আর দেহে পার্থক্য কোথায় ? পৃথিবীর উপর বিচরণ করলে সে ভারবাহী হয়ে যায়। এইখানে পালকির মধ্যে সৌবীররাজ নামে এক পার্থিব বিকার 'আমি সিন্ধু দেশের রাজা' মনে করে গর্বে অন্ধ হয়ে আছে এতে আপনার মহত্ত্ব কোথায় ? আপনি বস্তুত একজন ক্রূর ও ধৃষ্টব্যক্তি, এই দরিদ্র পালকি বাহকদের বলপূর্বক পালকি বহনের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন আর মহাপুরুষদের সভায় বসে নিজেকে লোকরক্ষকরূপে পরিচয় দেন। পৃথিবীতে চরাচর পদার্থের সৃষ্টি ও লয় ক্রমাগত দেখা যায়। তাদের ক্রিয়াভেদে যে পৃথক পৃথক নাম হয়েছে—তা জাগতিক ব্যবহার ছাড়া আর তার কী মূল্য আছে ?

হে রহূগণ ! মহাপুরুষদের পদরজ দ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত না করে কেবল তপস্যা, যজ্ঞাদি, বৈদিক কর্ম, অন্নাদি বিতরণ, অতিথি সেবা, পরোপকার আদি গৃহস্থোচিত ধর্মানুষ্ঠান, বেদ অধ্যয়ন অথবা জল, অগ্নি বা সূর্যের উপাসনা ইত্যাদি দ্বারাও পরম আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। ভগবৎকথা নিত্য শ্রবণ করা হলে মুমুক্ষু ব্যক্তির শুদ্ধ বুদ্ধি ভগবান বাসুদেবে নিবদ্ধ হয়।

রাজন্ ! জীবসকল সুখ রূপ অর্থে আসক্ত হয়ে রয়েছে। নিত্য পরিভ্রমণরত বাণিজ্যপরায়ণ বণিক সংঘের সঙ্গে এদের তুলনা করা যেতে পারে, মায়া এদের দুস্তর প্রবৃত্তির পথে নিযুক্ত করেছে। তাই তাদের দৃষ্টি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণে বিভক্ত কর্মের উপরই নিবদ্ধ থাকে। কর্ম

তাদের সংসাররূপ অরণ্যে প্রবেশ করায় যেখানে ক্ষণিক সুখও নেই। সেই অরণ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন নামক ছয় দস্যুর অত্যাচারের সে শিকার হয়। বণিক সমাজ সেইখানে উপস্থিত হলে ওই দস্যুদলের বুদ্ধিরূপ দুষ্ট নায়কের নেতৃত্বে দস্যুদল তাদের ধনসম্পদ বলপূর্বক অপহরণ করে। সেখানে তারা কখনো গন্ধর্বনগর দেখে আবার কখনো অতি চঞ্চল সুবর্ণের মতন উজ্জ্বল পিশাচ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। বণিকসকল এই অরণ্যে বাসস্থান, জল ও ধনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে থাকে আর প্রবল দুঃখের সম্মুখীন হয়। এই চক্র থেকে মুক্তি লাভ করা কঠিন। মায়াধীন থেকে এইভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত ভ্রমণ করেও তারা পরম পুরুষার্থ নির্ণয় করতে সমর্থ হয় না।

হে রাজা রহূগণ ! আপনিও এই পথেই চালিত হচ্ছেন। তাই এখনই প্রজাদের শাসনভার ত্যাগ করে সকল প্রাণীর সুহৃদ হয়ে যান আর বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে ভগবৎসেবা দ্বারা শাণিত জ্ঞানরূপ খড়্গ ধারণ করে এই পথ অতিক্রম করুন।'

এইভাবে সিন্ধুপতি রহূগণ দ্বারা অপমানিত হয়েও সেই প্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষিসূত অত্যন্ত করুণা করে তাঁকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। রাজা রহূগণ অতি দীনহীনভাবে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করলেন। অতঃপর শ্রীভরত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রসম শান্ত ও নিবৃত্ত-ইন্দ্রিয় হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন। শ্রীভরতের সৎসঙ্গ হেতু পরমতত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সৌবীরপতি রহূগণ অবিদ্যাজনিত দেহাত্মবোধ পরিত্যাগ করলেন।

———○———

গজেন্দ্র মোক্ষণ লীলা

নম আত্মপ্রদীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে।

নমো গিরাং বিদূরায় মনসশ্চেতসামপি॥ (৮।৩।১০)

অযুত যোজন উচ্চ ত্রিকূট পর্বত অতীব রমণীয় স্থান ছিল। তার চারদিকে ছিল ক্ষীর সাগরের পরিবেষ্টন। বিশাল পর্বতমালায় তিনটি শৃঙ্গ তার অনুপম সৌন্দর্যের অঙ্গস্বরূপ ছিল। এই স্বর্ণময়, রৌপ্যময় ও লৌহময় তিনটি শৃঙ্গ সমুদ্র, দিক্‌সকল ও আকাশকেও শোভামণ্ডিত করে রাখত। পর্বতমালা, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম পরিশোভিত ছিল। চতুর্দিক থেকে সমুদ্রের ঢেউ এসে পর্বতের পাদবন্দনা করত। পর্বতে হরিতবর্ণ মরকত প্রস্তরের উপর চারদিকের ভূমি শ্যামল ছিল। পর্বতের গুহায় সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, নাগ, কিন্নর ও অপ্সরা সকলের আগমন হত। তাদের সংগীতের সুর যখন পর্বতে প্রতিধ্বনিত হত তখন অন্যান্য অহংকারী সিংহকুল ভিন্ন সিংহের গর্জন মনে করে অসহিষ্ণু হয়ে আরও জোরে গর্জন করে উঠত।

পর্বত উপত্যকা ছিল বন্য পশুদের নিবাসস্থান। দেবকাননসম অরণ্যভূমিতে বৃক্ষে বৃক্ষে সুন্দর পাখিদের সুমধুর ডাক শোনা যেত। তাদের মধুর কলকাকলি পরিবেশকে আনন্দময় করে রাখত। পর্বতে বহু সুন্দর ঝরনা ও নদীসহ অনেকগুলি সরোবরও ছিল। তাদের তটভূমি মণিময় বালুকণা দ্বারা সুশোভিত ছিল। দেবাঙ্গনাসকল স্নান করায় তাদের অঙ্গস্পর্শ লাভ করে সরোবরের জল সুরভিত হয়ে থাকত। সেই সকল নদী ও সরোবরের সুগন্ধযুক্ত জলকণাবাহী বায়ু অতিশয় সুখসেব্য ছিল।

পর্বতরাজ ত্রিকূটের পাদদেশে ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা বরুণের ঋতুমান নামে একটি উদ্যান ছিল যা দেবাঙ্গনাসকলের ক্রীড়াস্থলরূপে পরিচিত ছিল। উদ্যানটি সারা বছর পুষ্প ও ফলে সমৃদ্ধ থাকত। বিভিন্ন বৃক্ষশোভিত সেই

উদ্যানে পক্ষীর কূজন ও ভ্রমরের গুঞ্জন অতীব মনোরম মনে হত। সেই উদ্যানে এক বিশাল সরোবর ছিল। সরোবরে মনোহর স্বর্ণকমল ফুটে থাকত। এই পরম আনন্দময় পরিবেশে সরোবরের এক বর্ণনাতীত সৌন্দর্য ছিল।

এই পর্বতের গভীর জঙ্গলে এক বিশাল হস্তীবাহিনী ছিল। গজেন্দ্র সেই বাহিনীর প্রধানরূপে পরিচিত ছিল। একদিন গজেন্দ্র কণ্টকাকীর্ণ কীচক বাঁশ, বেত আদি বিশাল লতা, গুল্ম ও নানা বৃক্ষ লণ্ডভণ্ড করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার সেই উন্মত্ত আচরণ ও মদস্রাবগন্ধ অন্যান্য হস্তীসকল, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প আদি হিংস্র জন্তুসকলকে ভয়ে তার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তার অভয় লাভ করে অন্যান্য নিরীহ পশুগণ ওই অঞ্চলে নির্ভয়ে বিচরণ করতে লাগল। প্রবল গ্রীষ্মাধিক্যে গজেন্দ্র অনুগামী হস্তীবাহিনী পদভারে পর্বতকেও কম্পিত করে এগিয়ে যাচ্ছিল। গণ্ডস্থল থেকে নির্গত মদস্রাবগন্ধ ভ্রমরকুলকে প্রলুব্ধ করেছিল আর তাই তারা গজেন্দ্রের সঙ্গ ছাড়ছিল না। তৃষ্ণাকুল হস্তীবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে মদবিহ্বল নয়নে গজেন্দ্র দূর থেকে পদ্মরেণুগন্ধবাহী বায়ুর আঘ্রাণ লাভ করে সেই সরোবরের তীরে অতি দ্রুতগতিতে উপনীত হল। স্বর্ণকমল ও রক্তবর্ণের কমলের কেশরে সুরভিত মধুর নির্মল সরোবরে সে অবতরণ করল আর শুঁড় দিয়ে সেই জল পান ও স্নান করল। সে অন্য হস্তীবাহিনী সদস্যদেরও জলে স্নান করিয়ে দিল ও তা পানও করাল। শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত হয়ে গজেন্দ্র ক্রমেই উন্মত্তসম আচরণ করতে লাগল। তার বিপদ যে এত সন্নিকটে তা সে জানতেও পারল না।

গজেন্দ্র যখন উন্মত্তসম ব্যবহার করছিল তখন দৈবপ্রেরিত এক অতি বলবান কুমির (গ্রাহ) সক্রোধে তার পা কামড়ে ধরল। অতি বলবান গজেন্দ্রও তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে কুমিরের কামড় থেকে মুক্ত করতে পারল না। হস্তীবাহিনীও দলপতিকে কুমিরের কামড় থেকে ছাড়িয়ে আনতে সক্ষম হল না। গজেন্দ্র ও কুমির উভয়েই পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করেছিল। কাজেই উভয় পক্ষ শক্তিশালী হওয়ায় টানাহেঁচড়া চলতেই থাকল। এইভাবে সহস্র

বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এই যুদ্ধ দেবতাদেরও আশ্চর্য করল। অবশেষে দেখা গেল যে প্রবল পরাক্রমশালী গজেন্দ্র শারীরিক ও মানসিক শক্তি হারিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ছে। এই অবস্থায় গজেন্দ্র বুঝতে পারল যে কুমিররূপে কালই তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে আর তাকে রক্ষা কেবল শ্রীভগবানই করতে পারেন। এইবার সে নিজ বুদ্ধিতে মনকে চিত্তভূমিতে স্থির করে পূর্ব জন্মের সংরক্ষিত শ্রেষ্ঠ স্তোত্রসকল দ্বারা শ্রীভগবানের স্তুতি করতে লাগল।

তখন ভক্তের রক্ষার জন্য সর্বাত্মা সর্বদেবস্বরূপ ভগবান শ্রীহরি স্বয়ং আবির্ভূত হলেন। জগদাত্মা শ্রীহরি গজেন্দ্রকে অতি কাতর অবস্থায় দেখলেন আর উচ্চারিত স্তুতি শ্রবণ করে বেদময় গরুড়ে আরোহণ করে চক্রপাণি ভগবান দ্রুতগতিতে বিপদগ্রস্ত গজেন্দ্রের সম্মুখে উপনীতি হলেন। চক্রপাণি শ্রীভগবানকে আসতে দেখে গজেন্দ্র তার শুঁড় দিয়ে একটা কমল তুলে কাতর স্বরে বলে উঠল—'হে নারায়ণ ! হে জগদ্‌গুরু ! হে শ্রীভগবান ! আপনাকে প্রণাম।' শ্রীহরি গরুড় থেকে অবতরণ করে করুণা পূর্বক স্বয়ং জলে নেমে তৎক্ষণাৎ গজেন্দ্রের সঙ্গে কুমিরকে আকর্ষণ করে সরোবরের তীরে নিয়ে এলেন। সেইখানে দেবতাগণও উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের সম্মুখেই চক্রদ্বারা শ্রীভগবান কুমিরের মুখকে ছিন্নভিন্ন করে গজেন্দ্রকে মুক্ত করলেন। শ্রীহরির কার্যে সন্তুষ্ট দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বেজে উঠল, গন্ধর্বগণ নৃত্যগীত করতে লাগল এবং ঋষি, চারণ ও সিদ্ধগণ ভগবান পুরুষোত্তমের স্তুতি করতে লাগলেন।

শ্রীভগবানের স্পর্শ লাভ করে সেই কুমির তৎক্ষণাৎ পরমসুন্দর দিব্য দেহ ধারণ করল। কুমির পূর্বজন্মে 'হূহূ' নামে এক শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব ছিল। ঋষি দেবলের অভিশাপে তার কুমির দেহ ধারণ করা। শ্রীভগবানের কৃপায় সে শাপমুক্ত হল। তার সমস্ত পাপ-তাপ বিনষ্ট হল। শ্রীভগবানকে প্রণাম ও স্তুতি করে সে তৎক্ষণাৎ গন্ধর্বলোকে গমন করল।

গজেন্দ্রও শ্রীভগবানের স্পর্শলাভ করে অজ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। সে ভগবানসদৃশ রূপ ধারণ করে পীতবসন চতুর্ভুজ মূর্তি লাভ করল। এই গজেন্দ্র পূর্বজন্মে দ্রবিড় দেশের পাণ্ড্যবংশের রাজা ছিলেন। তাঁর নাম

ছিল ইন্দ্রদ্যুম্ন। একবার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজ্য ত্যাগ করে মলয় পর্বতে বাস করছিলেন। তিনি শ্রীভগবানের উত্তম উপাসক ও যশস্বী ছিলেন। মলয় পর্বতে নিবাসকালে তিনি তপস্বীসম বসন ও জটা ধারণ করেছিলেন। একদিন যখন তিনি স্নান করে মৌনব্রত ধারণ করে একাগ্রচিত্তে শ্রীভগবানের পূজা করছিলেন তখন দৈববশে মহাযশস্বী অগস্ত্য মুনির সশিষ্য আগমন হয়েছিল। রাজা তখন তাঁদের যথাযথ সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করতে পারলেন না। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আচরণ মহামুনিকে ক্রোধান্বিত করল আর তিনি গমনকালে অভিশাপ দিলেন—'শিক্ষাভাবে অহংকারী রাজা নিজ কর্তব্য ভুলে গিয়ে ব্রাহ্মণকে অপমান করছে। সে হস্তীসম জড়বুদ্ধি তাই সে সেই ঘোর অজ্ঞানময় হস্তীযোনিতেই গমন করুক।' তাই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের হস্তীজন্ম হয়েছিল কিন্তু শ্রীভগবানের আরাধনার প্রভাবে তার শ্রীভগবানের স্মৃতি অক্ষত ছিল।

ভগবান শ্রীহরি এইভাবে গজেন্দ্রকে উদ্ধার করে তাঁকে তাঁর পার্ষদ করলেন। গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও দেবগণ তাঁর এই লীলার কীর্তন করতে লাগলেন এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর পার্ষদ গজেন্দ্রকে নিয়ে গরুড়ে আরোহণ করে বৈকুণ্ঠলোকে প্রত্যাগমন করলেন।

———০———

প্রভু স্বয়ং ভক্তাধীন

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্।

মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ (৯।৪।৬৮)

রাজা অম্বরীষ অতি ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। পৃথিবীর সপ্ত দ্বীপ, অতুল সম্পত্তি ও অতুলনীয় ঐশ্বর্য তাঁর করায়ত্ত ছিল। যদিও এই সকল সম্পদ সাধারণ ব্যক্তিগণের জন্য অতি দুর্লভ বস্তু তবুও তিনি এই সকলকে স্বপ্ন তুল্যই মনে করতেন। তিনি জানতেন যে ধনসম্পদ নরকের দ্বারস্বরূপ। এই বস্তু অনিত্য। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর প্রেমী সাধুদের উপরে গভীর প্রেমপ্রীতি পোষণ করতেন। নিজ মন, বাণী, হস্ত, কর্ণ সকলই ভগবান অচ্যুতের সঙ্গে তিনি যুক্ত রেখেছিলেন ; মন শ্রীপাদপদ্মে, বাণী গুণ-সংকীর্তনে, হস্ত মন্দির মার্জন-সেবনে ও কর্ণ মঙ্গলময় কথা শ্রবণে নিত্য যুক্ত থাকত। নেত্র মুকুন্দমূর্তি ও মন্দির দর্শনে, অঙ্গ ভগবদ্‌ভক্ত অঙ্গস্পর্শে, নাসিকা তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ লাভ করা তুলসীর দিব্য ঘ্রাণ লাভে এবং রসনা শ্রীভগবান অর্পিত নৈবেদ্য প্রসাদে যুক্ত থাকত। অম্বরীষের চরণ, শ্রীভগবানের স্মৃতি বিজড়িত স্থান সকল পরিভ্রমণে আর মস্তক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনায় যুক্ত থাকত। মাল্য চন্দন আদি ভোগসামগ্রী তিনি শ্রীভগবানের সেবায় সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পবিত্রকীর্তি শ্রীভগবান, সকল প্রাণীর অন্তরাত্মায় বিরাজ করেন। তিনি তাঁর সমস্ত কর্ম যজ্ঞপুরুষ, ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানের প্রতি তাঁকে সর্বাত্মা ও সর্বস্বরূপ জ্ঞানে সমর্পণ করে দিয়ে ভগবদ্‌ভক্ত ব্রাহ্মণদের আজ্ঞার অনুকূলে পৃথিবী শাসন করতেন। ধন্ব নামক নির্জল দেশে সরস্বতী নদীর প্রবাহের সম্মুখে বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতম আদি বিভিন্ন আচার্য দ্বারা তিনি মহান ঐশ্বর্যসম্পন্ন সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ও বৃহৎ দক্ষিণাযুক্ত বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করে যজ্ঞাধিপতি

শ্রীভগবানের আরাধনা করেছিলেন। তিনি হৃদয়ে অনন্ত প্রেম প্রদানকারী শ্রীহরির নিত্য নিরন্তর দর্শন লাভ করতেন।

এইভাবে রাজা অম্বরীষ তপস্যায় যুক্ত ভক্তিযোগ ও প্রজাপালনরূপ স্বধর্ম দ্বারা শ্রীভগবানকে প্রসন্ন করতে লাগলেন এবং ধীরে ধীরে সব রকমের আসক্তি পরিত্যাগ করলেন। তিনি জানতেন যে ভোগযুক্ত বস্তুসকল অনিত্য। তাঁর অনন্য প্রেমময় ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে শ্রীভগবান তাঁর রক্ষা নিমিত্ত সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন যা শত্রুদের জন্য যেমন ভীতিপ্রদ ছিল তেমনি মিত্রদের জন্য রক্ষাকবচ তুল্যও ছিল।

রাজা অম্বরীষভার্যাও তাঁর মতন ধর্মপরায়ণা, সংসারে বৈরাগ্যসম্পন্না ও ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। একবার রাজা অম্বরীষ নিজ ভার্যাসহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করবার জন্য একবর্ষব্যাপী দ্বাদশীপ্রধান একাদশীব্রতের নিয়ম ধারণ করলেন। ব্রত সমাপনে কার্তিক মাসে তিনি ত্রিরাত্রি উপবাস করলেন এবং যমুনায় স্নান করে মধুবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চনা করলেন। তিনি মহাভিষেক বিধি অনুসরণ করে সব সামগ্রী ও সম্পত্তি দ্বারা শ্রীভগবানের অভিষেক করলেন এবং তন্ময়চিত্তে বস্ত্র, আভরণ, চন্দন, মাল্য এবং অর্ঘ্য আদি দ্বারা তাঁর পূজা করলেন। যদিও মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণদের এই পূজার প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তাঁরা সিদ্ধ ছিলেন ও তাঁদের কামনাসকল পূরণ হয়ে গিয়েছিল তবুও রাজা অম্বরীষ তাঁদের ভক্তিভাবে পূজা করলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের উত্তম আহারে সেবাকার্য সমাপন করে ষাট কোটি সুসজ্জিত গাভী দান করলেন ; দানের পূর্বে গাভীসমূহের শৃঙ্গ সুবর্ণ-মণ্ডিত, খুর রৌপ্যমণ্ডিত ও পৃষ্ঠদেশ সুন্দর বস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত করে দেওয়া হয়েছিল। গাভীসকল সুশীল, তরুণ, পৃষ্ঠদেশ সুন্দর-দর্শন, সবৎসা ও দুগ্ধবতী ছিল। ব্রাহ্মণদের দানকার্য সমাপনে তাঁদের অনুমতি নিয়ে রাজা অম্বরীষ ব্রতপারণের জন্য উদ্যোগী হলেন। এইকালেই সহসা সেইখানে দুর্বাসা মুনির অতিথিরূপে আগমন হল।

রাজা অম্বরীষ তাঁকে আসতে দেখেই অভ্যর্থনা করে তাঁকে আসন দান করলেন ও মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সহযোগে তাঁর পূজার্চনা করলেন। অতঃপর

রাজা মহামুনিকে সেবা গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করলেন। দুর্বাসা মুনি অম্বরীষের প্রার্থনা স্বীকার করে আহারের পূর্বে স্নানের নিমিত্ত যমুনা নদীতে গমন করলেন। তিনি ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যমুনার জলে স্নান করতে লাগলেন।

দ্বাদশী অবসান আসন্ন দেখে ধর্মজ্ঞ অম্বরীষ ধর্মসংকট থেকে মুক্তি লাভ হেতু ব্রাহ্মণদের পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন—'হে ব্রাহ্মণদেবতাগণ ! ব্রাহ্মণকে আহার না করিয়ে স্বয়ং আহার্য গ্রহণ করা আবার অন্যদিকে দ্বাদশী পারণ না করা দুইই দোষযুক্ত। অতএব এখন আমার কী করা শ্রেয় যাতে আমার মঙ্গল হয় ও আমি পাপের ভাগী না হই।' ব্রাহ্মণকুল ভেবেচিন্তে পরামর্শ দিয়ে বললেন যে—'হে রাজর্ষি ! শ্রুতিকথন অনুসারে কেবল জল পান করে নেওয়া দোষযুক্ত হয় না।' তখন শ্রীভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন থেকে রাজা অম্বরীষ জল পান করে নিলেন ; আর দুর্বাসামুনির আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। আবশ্যক কার্যাদি সমাপন করে যখন দুর্বাসা মুনি ফিরে এলেন তখন রাজা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। দুর্বাসা মুনি কিন্তু অনুমানে বুঝতে পারলেন যে রাজা পারণকার্য সমাপন করে দিয়েছেন। মুনি তখন ভয়ানক ক্ষুধার্ত ছিলেন। পারণকার্য তাঁকে আহার না করিয়েই করে নেওয়া হয়েছে তাই তিনি অতিশয় ক্রোধান্বিত হলেন আর ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করে বললেন —'আরে ! ক্রূর ! ধনসম্পদমদে মত্ত দুর্মদ ! ভগবদ্ভক্তিহীন, তুই নিজেকে বড় ভাবিস ! আজ তুই ধর্ম লঙ্ঘন করে অতি অন্যায় করেছিস। আমি অতিথি হয়ে এসেছি। অতিথি সৎকারের নিমন্ত্রণ দিয়েও অতিথির আহারের পূর্বে আহার করেছিস ? এর উপযুক্ত শাস্তি তুই পাবি।'

ঘটনা অল্পেই রুষ্ট মহামুনিকে ক্রোধান্বিত করেছিল। তিনি নিজ জটার শেষাংশ উৎপাটন করে তার দ্বারা অম্বরীষকে বধ করবার নিমিত্ত এক কৃত্যা উৎপন্ন করলেন। রাক্ষসী কৃত্যা প্রলয়কালীন অগ্নিসম দেদীপ্যমান ছিল। তা অগ্নিসম প্রজ্বলিত হয়ে হস্তে তরবারি ধারণ করে রাজা অম্বরীষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার পদভারে ধরণি প্রকম্পিত হচ্ছিল। রাজা অম্বরীষ কিন্তু

তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। এক পাও না সরে তিনি পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। পরমপুরুষ পরমাত্মা শ্রীভগবান নিজ সেবককে রক্ষানিমিত্ত পূর্বেই সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। যেমন অগ্নি ক্রোধান্বিত সর্পকে ভস্মসাৎ করে তেমনভাবেই চক্র দুর্বাসা মুনির কৃত্যাকে দগ্ধ করে ভস্মে পরিণত করল।

যখন শ্রীদুর্বাসা দেখলেন যে তাঁর সৃষ্ট কৃত্যা দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে আর সুদর্শন চক্র তাঁর দিকেই ছুটে আসছে, তিনি তখন ভীত হয়ে প্রাণরক্ষা হেতু পলায়ন করতে লাগলেন। প্রজ্বলিত দাবানলসম চক্র আসছে দেখে তিনি সুমেরু পর্বত গহ্বরের দিকে ছুটলেন। মহামুনি প্রাণরক্ষা হেতু দিক, আকাশ, পৃথিবী, পাতাললোক, সমুদ্র, লোকপাল এবং তাঁদের দ্বারা সুরক্ষিত লোক এবং স্বর্গ পর্যন্ত গেলেন কিন্তু সহ্যাতীত তেজ সমন্বিত সুদর্শন চক্র তাঁকে রেহাই দিল না। রক্ষক না পেয়ে তিনি আরও ভয় পেয়ে গেলেন। প্রাণ রক্ষা হেতু তিনি দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন—'হে শ্রীব্রহ্মা ! আপনি তো স্বয়ম্ভু। ভগবানের এই তেজযুক্ত চক্র থেকে আমাকে রক্ষা করুন।'

শ্রীব্রহ্মা বললেন—'যখন আমার দুই পরার্ধ আয়ু সমাপন হবে এবং কালস্বরূপ ভগবান নিজ লীলা সংবরণ করে নেবেন ও জগৎকে ভস্মসাৎ করতে চাইবেন তখন তাঁর ভ্রূচালনায় সমস্ত জগৎ এবং আমার লোকও লীন হয়ে যাবে। তাঁর ভক্তদ্রোহে অভিযুক্তকে আমি রক্ষা করতে সমর্থ নই।' তখন দুর্বাসা মুনি ভগবান শংকরের শরণাগত হলেন।

শ্রীমহাদেব বললেন—'আমরা নিরুপায় ! স্বয়ং আমি, সনৎকুমার, নারদ, ভগবান ব্রহ্মা, কপিলদেব—কেউই ভগবানের মায়াকে জানতে সক্ষম হইনি। আমরাও তাঁরা মায়াধীন। চক্র বিশ্বেশ্বরের অস্ত্র। একমাত্র তাঁর শরণাগতিই তোমাকে রক্ষা করতে সমর্থ।'

মহামুনি অগত্যা শ্রীভগবানের পরমধাম বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করলেন। তা লক্ষ্মীপতির নিবাসস্থান ; লক্ষ্মীসহিত তিনি সেইখানে অধিষ্ঠিত। সুদর্শন চক্রের তাপে সন্তপ্ত শ্রীদুর্বাসা তাঁরই শরণাগত হলেন। তিনি জানালেন যে তাঁর মহাপরাধ হয়েছে। তিনি যেন তাঁকে ক্ষমা করেন।

শ্রীভগবান তখন মহামুনিকে বললেন—'হে শ্রীদুর্বাসা ! আমি সতত ভক্তাধীন, স্বতন্ত্র নই। ভক্তগণ আমাকে প্রেমপ্রীতি প্রদান করেন আমিও তাঁদের রক্ষা করি। যে ভক্ত আমার প্রীতিতে দারা, পুত্র, গৃহ, গুরুজন, প্রাণ, ধনসম্পদ, ইহলোক ও পরলোক সব ত্যাগ করে, তাঁকে ত্যাগ করবার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। আমার প্রেমী ভক্ত আমার হৃদয় আর আমি তাদের হৃদয় স্বয়ং। একটা উপায় আছে। যাঁর অনিষ্ট সাধন করতে গিয়ে এই বিপত্তি হয়েছে তাঁর শরণাগত হলে অপরাধ স্খালন ও শান্তি লাভ সম্ভব। নিরপরাধ সাধুর অনিষ্ট চেষ্টা করলে অনিষ্টকারীরই অমঙ্গল হয়ে থাকে। নাভাগনন্দন পরম ভাগ্যবান রাজা অম্বরীষই এর প্রতিবিধানে সমর্থ।

অতএব মহামুনি দুর্বাসাকে আবার সেই অম্বরীষের নিকটেই আসতে হল, সুদর্শন চক্রের তাপে সন্তপ্ত মহামুনি রাজা অম্বরীষের পদযুগল ধারণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। শ্রীদুর্বাসা মুনির এই আচরণ রাজা অম্বরীষকে লজ্জিত করল। দয়ায় পরিপূর্ণ রাজা তখন সুদর্শন চক্রের স্তুতি করতে লাগলেন।

রাজা অম্বরীষ বললেন—'হে প্রভু সুদর্শন ! আপনি অগ্নিস্বরূপ। আপনি সূর্য, চন্দ্র, জল, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, পঞ্চতন্মাত্রা এবং সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়সমূহ। আপনিই ধর্ম, আপনিই মধুর ও সত্য বাণী। আপনি সকল যজ্ঞের অধিপতি ও স্বয়ং যজ্ঞ। আপনি ত্রিলোকরক্ষক ও সর্বলোকস্বরূপ। আপনিই পরমপুরুষ পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ তেজ। আপনি কৃপা করে আমার কুলের কল্যাণে শ্রীদুর্বাসার কল্যাণ করুন। আমি আপনার অনুগ্রহকে মস্তকে ধারণ করে রাখব। যদি আমি কিছু কখনো দান করে থাকি, যজ্ঞ করে থাকি অথবা নিজ ধর্ম পালন করে থাকি আর যদি আমার বংশের সকলে ব্রাহ্মণদের নিজ আরাধ্য দেবতা জ্ঞান করে থাকেন তাহলে যেন আপনার কৃপায় মহামুনি দুর্বাসার সন্তাপ অপসৃত হয়। শ্রীভগবান সকল গুণের একমাত্র আশ্রয়। যদি আমি তাঁকে সমস্ত প্রাণীর আত্মারূপে দেখে থাকি আর তিনি আমার উপর প্রসন্ন থাকেন তাহলে যেন শ্রীদুর্বাসার হৃদয়ের সমস্ত দহন শান্ত হয়ে যায়।

রাজা অম্বরীষের স্তুতি চক্রকে শান্ত করল। মহামুনি দুর্বাসা তখন রাজা

অম্বরীষকে উত্তম আশীর্বাদ দানে আপ্লুত করলেন। তিনি ভগবানের প্রেমী ভক্তদের মাহাত্ম্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন।

যখন মহামুনি পলায়ন করছিলেন তখন থেকে রাজা অম্বরীষ আহার্য গ্রহণ করেননি। এই এক বৎসর কাল তিনি তাঁর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় কেবল জল পান করেই কাল যাপন করেছিলেন। মহামুনিকে চক্রের হাত থেকে রক্ষা করে তিনি তাঁর চরণযুগল ধারণ করলেন এবং তাঁকে প্রসন্ন করে সসম্মানে আহার করালেন। মহামুনি দুর্বাসা তখন পরিতৃপ্ত। তিনি আশীর্বাদাদি করে স্থান ত্যাগ করলেন। মহামুনির প্রস্থানের পর তাঁর প্রসাদের অন্ন রাজা অম্বরীষ গ্রহণ করলেন। নিজের জন্য মহামুনির দুঃখ ও তাঁর প্রার্থনায়ই মহামুনির নিষ্কৃতিকে তিনি শ্রীভগবানের মহিমারূপে দেখলেন। অতঃপর পুত্রদের রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি শ্রীভগবানে নিত্য যুক্ত হয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করলেন।

———o———

যযাতি-দেবযানী উপাখ্যান

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥ (৯।১৯।১৪)

রাজা যযাতি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য কর্তৃক অভিশাপগ্রস্ত হয়ে অকালে বার্ধক্যের সংকটে পড়লেন। তিনি মহামুনিকে জানালেন— 'আপনার কন্যা দেবযানীর সঙ্গে বিষয় ভোগ করে এখনও আমার তৃপ্তি হয়নি। এই অভিশাপে তো আপনার কন্যারই অনিষ্ট।' তখন মহামুনি উত্তর দিলেন —'বেশ! যদি কেউ নিজ যৌবন দিয়ে তোমার বার্ধক্য নিতে রাজি হয় তাহলে তুমি যৌবন ফিরে পাবে।'

এই অভিশাপ দানের পিছনে কন্যা দেবযানীর পিত্রালয়ে প্রত্যাগমনের বৃত্তান্ত বর্তমান। দেবযানী যখন যদু ও তুর্বসু জননী, তখন সে এই জেনে ক্রোধান্বিত হয়েছিল যে দাসী শর্মিষ্ঠার তিন পুত্র দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুও তার পতি রাজা যযাতিজাত। শর্মিষ্ঠা দাসীরূপে দেবযানীর সঙ্গে বিবাহকালে এলেও আসলে সে দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা ও দেবযানীর প্রাক্তন সখী। ঘটনার সূত্রপাত দুই সখীর মধ্যে জলক্রীড়ার পর দেবযানীর বস্ত্র ভুল করে শর্মিষ্ঠা ধারণ করে নেওয়ার ফলে, দেবযানী সেই ঘটনায় শর্মিষ্ঠাকে অত্যধিক তিরস্কার করায় শর্মিষ্ঠা ক্রোধে সখীকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল। রাজা যযাতি দেবযানীকে সেই কূপ থেকে উদ্ধার করেছিলেন ও তার প্রণয় কথনে প্রীত হয়ে তাকে ভার্যারূপে গ্রহণও করেছিলেন। শর্মিষ্ঠার রাজা যযাতির সঙ্গে সংযোগ দেবযানীর অজান্তে হয়েছিল ও তা অবশ্যই শর্মিষ্ঠা কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছিল।

রাজা যযাতি তখন পুত্র যদুর শরণাপন্ন হন। কিন্তু তাঁর বার্ধক্য গ্রহণ করে যৌবন দানে যদুকে রাজি করাতে তিনি সক্ষম হলেন না। এইভাবে তুর্বসু,

দ্রুহ্যু ও অনুও পিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। যখন রাজা যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে প্রস্তাব দিলে সে আনন্দে তা গ্রহণ করল ; পিতা তার কাছে পরম পূজনীয় ব্যক্তি ছিলেন।

রাজা যযাতি পুত্রের যৌবন গ্রহণ করে পূর্ববৎ বিষয় ভোগে নিবিষ্ট হলেন। তিনি সপ্তদ্বীপের একছত্র অধিপতি ছিলেন। তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহে পূর্ণ শক্তি ছিল এবং তিনি পিতাসম উত্তম প্রজাপালন করে যথেচ্ছ বিষয় ভোগ করতেন। দেবযানী তাঁর প্রিয়তমা পত্নী। দেবযানী সর্ব প্রকারে পতিকে নিত্য সুখ প্রদান করতে থাকত। রাজা যযাতি সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য সর্বদেবস্বরূপ যজ্ঞপুরুষ ভগবান শ্রীহরির বহু মহৎ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞদ্বারা যজন করলেন। সেই পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। তাঁর স্বরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। সেই সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী ভগবান শ্রীনারায়ণকে হৃদয়ে স্থাপনা করে রাজা যযাতি নিষ্কামভাবে তাঁর পূজার্চনা করতেন। এইভাবে সহস্র বৎসর পর্যন্ত তিনি উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়সকলের সঙ্গে মনকে যুক্ত রেখে তার প্রিয় বিষয় ভোগ করলেন। কিন্তু এত কিছু হওয়ার পরও চক্রবর্তী সম্রাট যযাতি ভোগে তৃপ্ত হলেন না।

রাজা যযাতি এইভাবে স্ত্রীর অনুরক্ত হয়ে বিষয় ভোগ করতে লাগলেন। একদিন তাঁর এই অনুভূতি হল যে এক সহস্র বর্ষ ধরে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করেও তার কামনা শান্ত হয়নি, তাঁর অধঃপতন সকল সীমা অতিক্রম করেছে। তিনি বুঝলেন যে কামনার প্রহারে জর্জর পুরুষের মন কোনো ভাবেই সন্তুষ্ট হয় না। বিষয়সকল ভোগ করে বিষয়ের ভোগবাসনা আরও বেড়ে যায়, তা কখনো শান্ত হয় না। যে নিজ কল্যাণ কামনা করে তার পক্ষে এই ভোগবাসনা তৃষ্ণা ত্যাগ করা আবশ্যক। তিনি ঠিক করলেন যে ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে মন প্রাণ পরমাত্মাকে সমর্পণ করবেন আর শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ আদি ভাবের অতীত হয়ে অহংকার বিরহিত হয়ে ভ্রমণ করবেন। ইহলোক-পরলোকের উভয় ভোগই অনিত্য। তাই তার চিন্তায় যুক্ত না থাকাই শ্রেয়।

এই পরম সত্যে উপনীত হয়ে তিনি পুত্রকে ডেকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিলেন আর নিজের বার্ধক্য গ্রহণ করলেন। তাঁর চিত্তে বিষয়বাসনার

লেশমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। অতঃপর তিনি দক্ষিণ-পূর্বে দ্রুহ্যু, দক্ষিণে যদু, পশ্চিমে তুর্বসু এবং উত্তরে অনুকে রাজপদে নিযুক্ত করলেন। সমগ্র ভূমণ্ডলের সমস্ত সম্পত্তির যোগ্যতম পাত্র পুরুকে নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করে এবং তার অগ্রজদের তার অধীনস্থ করে তিনি রাজ্য ত্যাগ করে বনগমন করলেন। তাঁর সমস্ত আসক্তির অবসান হয়েছিল। বনে আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা তাঁর ত্রিগুণময় লিঙ্গশরীর বিনষ্ট হল। তিনি মায়ামলরহিত পরব্রহ্ম পরমাত্মা বাসুদেবে মিলিত হয়ে গেলেন। পতির নিবৃত্তি পথের অনুসরণ করে দেবযানীও সকল বস্তুর আসক্তি ত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মন তন্ময় করে বন্ধনের কারণ লিঙ্গদেহ ত্যাগ করে ঈশ্বরে লীন হয়ে গেল।

———o———

পরম দানী রন্তিদেব

স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্॥ (৯।২১।১৬)

সংকৃতিনন্দন রন্তিদেবের নাম ইহলোকে ও পরলোকে অতি সমাদরে উচ্চারিত হয়ে থাকে। আকাশসম গুণসম্পন্ন রন্তিদেব অনায়াসে প্রাপ্ত বস্তুসকলই উপভোগ করতেন ও তিনি সম্পূর্ণরূপে দৈবের উপর নির্ভর করতেন। দানে তিনি তাঁর নিজের প্রয়োজনের কথা মনে রাখতেন না। এইভাবে একসময় তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ শেষ হয়ে গেল। তবুও তিনি দৈব ইচ্ছায় যা পেতেন তা দান করে দিয়ে অনাহারে থাকতে লাগলেন। এইভাবে রন্তিদেব সংগ্রহ-পরিগ্রহরহিত হয়ে অতি ধৈর্যের সঙ্গে সপরিবারে দুঃখ ভোগ করছিলেন। একবার এমন হল যে তিনি সপরিবারে টানা আটচল্লিশ দিন অনাহারে কাটালেন—পান করবার জল পর্যন্ত তিনি পেলেন না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সকলেই কাতর হয়ে পড়েছিল। অনাহারের উনপঞ্চাশ দিনে সকালে শ্রীভগবানের কৃপায় তিনি এক ব্যক্তির কাছ থেকে খাদ্য দ্রব্যাদি লাভ করলেন ও পান করবার জলও লাভ করলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁরা কাঁপছিলেন। অতএব রন্তিদেব সপরিবারে খাদ্যগ্রহণ করতে তখনই উদ্যোগী হলেন। এই সময়েই এক অতিথি ব্রাহ্মণের তাঁর গৃহে আগমন হল। রন্তিদেব সকলের মধ্যেই শ্রীভগবানকে দর্শন করতেন। অতএব তিনি সেই খাদ্যদ্রব্যে ব্রাহ্মণ অতিথিকে ভক্তিভরে সেবা করলেন। ব্রাহ্মণদেবতা সেবা গ্রহণ করে চলে গেলেন।

এইবার রন্তিদেব অবশিষ্ট অন্ন নিজেদের মধ্যে ভাগ করে গ্রহণ করতে উদ্যত হলেন। তখনই গৃহে এক অন্য শূদ্র অতিথির আগমন হল। রন্তিদেব শ্রীভগবানকে স্মরণ করে সেই অবশিষ্ট অন্নেরও কিছু ভাগ শূদ্ররূপে

আগমনকারী অতিথিকে দান করলেন। অতিথিও তা গ্রহণ করে চলে গেল। সেই শূদ্ররূপী অতিথি চলে যাবার পর কুকুরদের নিয়ে আর একজন অতিথির আগমন হল। সে বলল—'রাজন্! আমি ও আমার কুকুরসকল অতি ক্ষুধার্ত। আমাদের আপনি কিছু খেতে দিন।' রন্তিদেব পরম সমাদরে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সব সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন আর তিনি আগন্তুক ব্যক্তি ও কুকুরদের শ্রীহরি জ্ঞানে নমস্কার করলেন। রন্তিদেবের কাছে তখন আর জল ছাড়া কিছু রইল না। তখন তিনি সেই জল সপরিবারে ভাগ করে গ্রহণ করতে উদ্যত হলেন।

এমন সময়ে এক চণ্ডাল সেখানে উপস্থিত হল। সে রন্তিদেবকে বলল—'আমি চণ্ডাল ও তৃষ্ণার্ত। আমাকে তৃষ্ণা নিবারণের জল দিন।' চণ্ডাল এমনভাবে কথা বলল যে মনে হল যেন তার সেইসকল কথা উচ্চারণ করতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তার কথা শুনে রন্তিদেবের দয়া হল। তিনি বললেন—'আমি শ্রীভগবানের কাছে অষ্ট সিদ্ধিযুক্ত পরম গতি কামনা করি না। আমি মোক্ষও চাই না। আমি কেবল কামনা করি যেন আমি সমস্ত প্রাণীকুলের হৃদয়ে অবস্থান করি আর তাদের দুঃখ আমি স্বয়ং অনুভব করি ; কোনো প্রাণী যেন দুঃখ ভোগ না করে। এই ব্যক্তি জল পান করে বাঁচতে চায়। জল দান করলে তার জীবন রক্ষা হবে। তাতেই আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণার পীড়া, দেহের শৈথিল্য, দৈন্য, গ্লানি, শোক, বিষাদ ও মোহ—সব চলে যাবে। আমি তাতেই সুখানুভব করব।' এইরূপ বলে রন্তিদেব অবশিষ্ট পানীয় জলও চণ্ডালকে দিয়ে দিলেন। তিনি স্বয়ং অতি তৃষ্ণার্ত ছিলেন। তবুও তাঁর হৃদয় সাধারণভাবেই এত করুণাসিঞ্চিত ছিল যে তিনি নিজে তা গ্রহণ না করে দান করতে দ্বিধা বোধ করলেন না। তিনি তাঁর অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিলেন।

সেই অতিথিসকল বস্তুত শ্রীভগবান রচিত মায়ারই বিভিন্ন রূপ ছিল। পরীক্ষা সমাপন হলে নিজ ভক্তের অভিলাষ পূরণ করবার জন্য ত্রিভুবনপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—তিন জনেই রন্তিদেবের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। রন্তিদেব তাঁদের চরণে নমস্কার করলেন। তাঁর কামনা তো কিছুই ছিল না। শ্রীভগবানের কৃপায় তিনি আসক্তি ও স্পৃহাতেও বিরহিত হয়ে গেলেন।

তিনি ভক্তিভাবে নিজ মনকে পরম প্রেমময় ভগবান বাসুদেবে সমর্পণ করে দিলেন, তাঁদের কাছ থেকে কিছুই চাইলেন না।

তাঁর শ্রীভগবান লাভ ছাড়া আর কোনো বস্তুর কামনা ছিল না। তাই তিনি মনকে সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানে নিবিষ্ট করে দিলেন। তাই ত্রিগুণময় মায়া জেগে উঠলে স্বপ্নে দেখা ঘটনার মতন বিনষ্ট হয়ে গেল। রন্তিদেবের অনুগামীগণও তাঁর সঙ্গ লাভের প্রভাবে যোগী হয়ে গেলেন এবং সকলেই শ্রীভগবানের চরণ আশ্রিত পরমভক্ত হয়ে গেলেন।

———○———
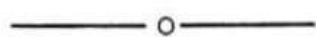
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা

নিশীথে তমউদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥ (১০।৩।৮)

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির আগমন হল। এই মহালগ্নেই সাধুদিগের রক্ষা, দুষ্টদের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবানের এই ধরাতলে দেবীস্বরূপা দেবকীর গর্ভে আগমন হবে। তাঁরই আবাহনের জন্য সর্বত্র সাজসাজ রব। আকাশে নক্ষত্র, গ্রহ, তারকাসকল শান্ত ও সৌম্য মূর্তি ধরাণ করে অপেক্ষমান। যমুনা নদীতে জলরাশি নির্মল হয়ে গেল কারণ শ্রীভগবানকে লাভ করবার জন্য নির্মল হওয়া প্রয়োজন। ভূদেবী পরম আনন্দে প্রভুর আগমনের জন্য ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে প্রস্তুত ; বৈকুণ্ঠ ছেড়ে তাঁর নিবাসস্থানে শ্রীভগবানের আগমন যে অতি সৌভাগ্যপ্রদ। প্রভুর প্রীতির জন্য রাত্রিকালেও সরোবরসকল প্রস্ফুটিত পদ্মে ভরে গেল। বৃক্ষসকল পুষ্পবাহার সজ্জিত করে প্রভু মনোরঞ্জনে মন দিল। ধরাতল আনন্দময় হয়ে গেল।

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর আসছেন চন্দ্রবংশে। তাই তাঁর আবির্ভাবকালও কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির মধ্যরাত্রিতে। তখন যে অষ্টমী তিথির চন্দ্রোদয়ের সময়। রাত্রিকাল বিশেষভাবে মুনিঋষিদের কাছে প্রিয়। তাই বোধহয় যোগেশ্বর শ্রীভগবান যোগীদের প্রীতির কথা মনে রেখে আগমনকাল চয়ন করেছেন। প্রভুর আবির্ভাব বস্তুত অজ্ঞানান্ধকারে দিব্য প্রকাশের আবির্ভাব, তাই কৃষ্ণপক্ষ তাঁর প্রিয়।

পিতা বসুদেব বিশুদ্ধ আত্মা ; তাই তাঁরই সন্তানরূপে প্রভুর আগমন। দেবকীমাতার গর্ভে আগমন হওয়ায়, তিনি কিন্তু রোহিণী মাতাকেও ভোলেননি। তিনি আবির্ভাবকাল এমনভাবে বেছে নিয়েছেন যাতে তাঁর

আগমন রোহিণী নক্ষত্রে হয়। তাতে আর রোহিণী মাতার মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না। আবার চন্দ্রের প্রিয় ভার্যা রোহিণীও প্রসন্ন হবেন কারণ শ্রীভগবান চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হচ্ছেন।

প্রভু আসছেন কারাগারে, কারণ ভব কারাগার থেকে মুক্তি প্রদান হেতুই তাঁর আগমন। ভক্তদের রক্ষা করবার জন্য তাঁর আগমন কারণ ভক্তগণ সব দুষ্টদের হাতে বন্দী।

যথাসময়ে সেই মহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হল। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান শ্রীবিষ্ণু দেবময়ী দেবকীর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হলেন। যেন পূর্বগগনে ষোড়শ কলায় পূর্ণচন্দ্র উদয় হল। বসুদেব দেখলেন যে তাঁর সম্মুখে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী নারায়ণ। তাঁর নয়নযুগল কমলসম কোমল ও বিশাল। তাঁর বক্ষঃস্থলে সুন্দর সুবর্ণময় শ্রীবৎস চিহ্ন। গলদেশে কৌস্তুভমণি ঝকমক করছে। তাঁর নবজলদকান্তি শ্যামসুন্দর অঙ্গে পীতাম্বর। মহামূল্য বৈদূর্যমণি সংযুক্ত কিরীট ও কুণ্ডলের কান্তিতে তাঁর অনুপম সুন্দর কুঞ্চিত অলকদাম সূর্যালোকসম জ্যোতির্ময়। কটিতে জ্যোতির্ময় চন্দ্রহারের শোভা। বাহুযুগলে বাজুবন্ধ ও মণিবন্ধে বলয়ের অপরূপ সৌন্দর্য। তেজ বলয়ের মধ্যে অবস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্তিতে অঙ্গে অঙ্গে জ্যোতির বিচ্ছুরণ যা তাঁর সৌন্দর্যকে বর্ণনাতীত করে তুলেছে। সম্মুখে শ্রীভগবানকে আবির্ভূত হতে দেখে পিতা বসুদেব তাঁর স্তুতিতে মগ্ন হলেন।

মাতা দেবকী শ্রীভগবানের অপূর্ব সুন্দর ও দিব্য বিগ্রহ দর্শন করে তাঁকে নমস্কার করলেন। অতঃপর মাতাপুত্রের মধ্যে কথোপকথনের সূত্রপাত হল।

—'প্রভু ! আমি তো আপনাকে আমার পুত্ররূপে আবাহন করেছিলাম। আপনি আপনার শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম না ত্যাগ করলে আপনি নররূপে কেমন করে পরিচিত হবেন ? আপনার বর্তমান রূপ তো দেবরূপ।'

—'বেশ ! আমি তা ত্যাগ করলাম। মানব রূপ ধারণ করলাম।'

—'আপনি তো ত্যাগ করলেন কিন্তু মানবদেহে তো এই সকল আভরণ থাকে না আর তার চার হাতও হয় না।'

—'বেশ ! মাতা ! তোমার ইচ্ছানুসারে আভরণ ও দুই হস্ত ত্যাগ করে

নররূপ নিলাম।'

— 'প্রভু ! মানব শিশু তো ক্ষুদ্রাকার হয়ে থাকে আর আপনি এখন পূর্ণাবয়ব মানবদেহে সম্মুখে দণ্ডায়মান।'

—'বেশ ! মাতা ! আমি নরশিশুসম ক্ষুদ্রাকার হয়ে গেলাম।'

—'প্রভু ! নরশিশু তো জন্মগ্রহণকালে রোদন করে থাকে আর আপনি তো হাসছেন ? এইভাবে তো নরশিশু বলে কেউ আপনাকে গ্রহণ করবে না। আপনার ক্রন্দন করা যে দরকার।'

—'বেশ ! মাতা ! আমি ক্রন্দন করতে থাকলাম।'

কংসের কারাগার তখন শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্রন্দনে মুখরিত হল। শ্রীভগবান অলৌকিক চতুর্ভুজ রূপ পরিহার করে মাতা দেবকীর ইচ্ছায় কংসের কোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানব শিশুদেহ ধারণ করলেন। বসুদেব ও দেবকী কারাগারের অভ্যন্তরে থাকায় তাঁদের কঠোর তপস্যার ফলস্বরূপ ঈশ্বরদর্শন করে ধন্য হলেন। তাঁরা শ্রীভগবানের যোগমায়ায় তা বিস্মৃতও হলেন। অতঃপর শ্রীভগবানের আদেশে বসুদেবের কারাগার থেকে শিশুকে নিয়ে বার হওয়া, অনন্তনাগের ফণা বিস্তার করে শ্রীভগবানকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা, খরস্রোতা যমুনা অতিক্রম করা ও অবশেষে গোকুলে নন্দালয়ে গিয়ে যশোদার নবজাত কন্যার সঙ্গে শিশুর স্থান বদল —সব কিছুই সংঘটিত হল। যোগমায়ার প্রভাবে যশোদা প্রসবকালে পুত্র না কন্যা জন্ম হয়েছে তা জানতে পারলেন না আর দেবকীপুত্র যশোদা পুত্ররূপে শিশুলীলার জন্য গোকুলে প্রতিস্থাপিত হয়ে গেলেন। পরিকল্পনায় কোথাও কোনো ত্রুটি দেখা গেল না।

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে আবির্ভাবকালে অথবা তাঁর চতুর্ভুজ বিগ্রহে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করে থাকবার কোনো বিশেষ কারণ আছে কি না ? এই বিষয়ে কোনো কোনো বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মত এইরকম—

মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। তার একান্ত কামনা থাকে যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার তাকে নিত্য ঈশ্বরলাভে বাধা দিয়ে থাকে । এই বাধার

বিষয়গুলি যদি ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে এনে দেওয়া যায় তাহলে তিনিই তাদের নিয়ন্ত্রণ করে ভক্তকে কাছে টেনে নেবেন। শ্রীভগবান ভক্তকে সর্বদা ভালোবাসেন, তিনি ভক্তের প্রয়োজনে কত কিছু করে থাকেন। সেই মানবের মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহংকারকে তিনি পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খরূপে ধারণ করে থাকেন একান্তই ভক্তের প্রয়োজনে। সজ্জনদের রক্ষার জন্যই তো তাঁর অবতরণ।

রক্তকমল অনুরাগকে নির্দেশ করে। রক্তকমল কোমল ও লাল। লাল বর্ণ অনুরাগের প্রতীক—সিন্দূর, আলতা, কুমকুম, আবির সবই লাল। শ্রীভগবানকে প্রেমপ্রীতি নিবেদনের প্রতীকও তাই লাল। ভক্ত শ্রীভগবানের হস্তে তার চঞ্চল মনের দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্তে থাকতে সক্ষম হয়। শ্রীভগবানের হস্তে তাই রক্তকমল যার দ্বারা তিনিও ভক্তদের প্রেমপ্রীতি অনুরাগ জ্ঞাপন করে থাকেন।

অনুরাগ ধারণের আর এক মস্ত বাধা চিত্তচাঞ্চল্য যা চক্রবৎ সর্বদাই পরিবর্তনশীল। ভগবানের কাছে ভক্তের নিত্য কামনা থাকে যেন চিত্তচাঞ্চল্য তিনি রোধ করেন, তাকে সুদর্শন করে দেন। তাই শ্রীভগবানের সুদর্শন চক্র ধারণ করা। তিনি তা নিয়ন্ত্রণ করলে ভক্তের কল্যাণ সুনিশ্চিত হয়ে যায়। তাঁর মাখন চুরি তো চিত্ত চুরি করা, যা না হলে গোপীদের মন অশান্ত হয়ে উঠত !

ঈশ্বরলাভের আর এক বাধা বিচার করা। ভক্ত কেবল বিচারে যুক্ত থেকে শ্রীভগবানের থেকে নিজেকে দূরে রাখে। সদসদ্ বিচার তাঁর উপরে ছেড়ে দিলেই ভক্ত নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারে। বারেবারের এই বিচার প্রবণতা ত্যাগ করাবার জন্য অথবা তা চূর্ণবিচূর্ণ করবার জন্যই শ্রীভগবান হস্তে কৌমদকী গদা ধারণ করে থাকেন। অতএব অনুরাগরঞ্জিত ভক্তের সকল বিচার করবার প্রবণতা শ্রীভগবানের হস্তে কৌমদকী গদা দেখলেই চলে যায়। সমর্পণে বিচার করা থাকে না।

অহং-এর তাৎপর্য বুঝতে হয়। 'শিবোঽহং' ও 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি'তে দোষ কোথায় ? শুধু তাতে আকার দিলে তা অনিষ্টকর হয়ে থাকে। এই অহংকার অসদ্ বৃত্তিকে ধারণ করে ভক্তকে শ্রীভগবানের কাছ থেকে দূরে

সরিয়ে রাখে। শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্য শঙ্খ, নাদব্রহ্ম সৃষ্টি করে ভক্তের অসদ্ বৃত্তিসকল দূরীভূত করে। তাই শ্রীভগবান হস্তে শঙ্খ ধারণ করে থাকেন। তিনি ভক্তের ইন্দ্রিয়সমূহকে অসদ্ বৃত্তি থেকে দূরে রেখে তাকে অনুরাগরঞ্জিত করে দেন।

তাঁর লীলাসকল মায়ামোহিত ভক্তদলকে সঠিক পথে চলবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তিনি চান যে তাঁর ভক্তগণ নিজ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত তাঁরই শ্রীবিগ্রহের সন্ধান পেয়ে ভব-কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করুক। তাঁর অধিষ্ঠান সর্বত্র। তাঁর কাছেই তাই প্রার্থনা যে তিনি যেন সকলকে তাঁর অবস্থানের অনুভূতিতে পুষ্ট করবার কৃপা করেন।

———o———

পূতনা উদ্ধার

বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং চরাচরাত্মাঽঽস নিমীলিতেক্ষণঃ।

অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকং যথারগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ॥ (১০।৬।৮)

কংস প্রেরিতা অতিশয় ক্রূর পূতনা রাক্ষসী নগরে, গ্রামে ও যাদব বসতিতে ঘুরে ঘুরে গোপনে শিশু হত্যা করে বেড়াচ্ছিল। সে ইচ্ছানুসার রূপ ধারণ করতে পারত। আকাশ পথে গমন করতে পারত। দেবকীর অষ্টম গর্ভজাতককে কংসের ভয়ানক ভয়। অষ্টম গর্ভজাত যে কন্যা, তা যেন কংস বিশ্বাস করতে চায় না। তাই সেই ক্ষণে ব্রজমণ্ডলে জাত সকল শিশুকেই সে হত্যা করবার নির্দেশ দিয়েছে পূতনাকে। পূতনা নন্দবাবার গোকুলের সমীপে এসে মায়াদ্বারা এক সুন্দরী যুবতীরূপে গোকুলে প্রবেশ করেছিল। সুন্দর বস্ত্রে সুসজ্জিতা সুন্দরী যুবতীকে আসতে দেখে গোকুল সীমানায় প্রহরায় নিযুক্ত গোপবালকগণ বাধা দেয়নি কারণ সেই সুন্দরী যুবতীর দ্বারা নন্দদুলালের কোনো অনিষ্ট হতে পারে তা তারা মনে করেনি। যুবতী হস্তে কমল ধারণ করে থাকায় গোপীগণের মনে হয়েছিল যেন স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী পতিদর্শনে এসেছেন। কাজেই পূতনার গোকুল প্রবেশ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছিল।

পূতনা নামেই তার পরিচয় বর্তমান। পূত নয় অথবা পূত রহিত ধরলে মানে দাঁড়ায় 'পবিত্র নয়' বা 'পুত্রহীন ব্যাধিগ্রস্তা'। সে অবিদ্যার প্রতীক। অতএব অবিদ্যা পূতনা যে শিশুনারায়ণকে সহ্য করতে পারবে না তা তো বলাই বাহুল্য। নন্দবাবা সেইদিন ছিলেন গৃহে অনুপস্থিত ; তিনি কর দেওয়ার জন্য মথুরায় গমন করেছিলেন। মা যশোদা ছিলেন গৃহকার্যে ব্যস্ত। অতএব পূতনা নন্দবাবার গৃহে প্রবেশ করেই শয্যায় বালক শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টদের জন্য কালস্বরূপ। যেমন অগ্নি ভস্মে নিজেকে লুকিয়ে রাখে, তেমনভাবেই তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ তেজ

লুকিয়ে রেখেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বচরাচরের সমস্ত প্রাণীর আত্মা, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন এই যে রমণী শিশুঘাতক পূতনা রাক্ষসী। যেন কেউ ভুল করে রজ্জু মনে করে সর্প তুলে নিল, তেমনভাবেই নিজ কালরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পূতনা নিজ বক্ষঃস্থলে তুলে নিল। পূতনা দর্শনে বালক নয়ন কপাট রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

খাপে লুকিয়ে রাখা সুতীক্ষ্ণ তরবারিসম পূতনা অতি কুটিলচিত্ত ছিল ; কিন্তু লোকসমক্ষে সে মধুর ও সুন্দর আচরণ করছিল। তাকে দেখে একজন প্রকৃত ভদ্রমহিলাই মনে হচ্ছিল। তাই শ্রীরোহিণী ও শ্রীযশোদা তাকে গৃহাভ্যন্তরে দেখে আপত্তি করলেন না আর তার সৌন্দর্য চুপচাপ দেখতে লাগলেন।

এদিকে ভয়ানক রাক্ষসী পূতনা বালক শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে নিয়ে তাঁর মুখে নিজ স্তন দিল। স্তনে অতি ভয়ানক বিষ মাখানো ছিল। বালক শ্রীভগবান ক্রোধকে নিজ সঙ্গী করে নিলেন। দুই হাতে স্তন ধরে বালক শ্রীকৃষ্ণ তার প্রাণরস সমেত দুগ্ধ পান করতে লাগলেন। এইবার পূতনার প্রাণের আশ্রয়ভূত সকল মর্মস্থান বিদীর্ণ হতে লাগল। সে হাত পা ছুঁড়ে ক্রন্দন করতে লাগল—'আরে ! ছেড়ে দে। ছেড়ে দে। রেহাই দে।' তার চোখ কপালে উঠল আর দেহ ঘর্মাক্ত হল। তার আর্তনাদের বেগ অতি ভয়ংকর ছিল। তাতে পর্বতসহ পৃথিবী ও গ্রহসকল টলমল করে উঠল। বজ্রপাত হয়েছে ভেবে অনেকে ভূমিশয্যা নিল। নিশাচরী পূতনার স্তনে এমন বেদনা শুরু হল যে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হল না, সে রাক্ষসীরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তার দেহ থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল, মুখ বিকৃত হল, কেশরাশি বিক্ষিপ্ত হল আর হাত পা ছড়িয়ে গেল।

পূতনার দেহ পড়বার সময়ে ছয় ক্রোশ পর্যন্ত বৃক্ষরাশি ভেঙে পড়ল। মৃত্যুর পরে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠাদি যেন সে জোগাড় করে রেখে গেল। ঘটনা অদ্ভুত ছিল। পূতনা ভীষণাকার রাক্ষসী ছিল। তার বিশাল দেহ দেখে গোপালক ও গোপিনীগণ ভয়ে আঁতকে উঠল। গোপিনীগণ যখন দেখল যে বালক শ্রীকৃষ্ণ সেই বিশালাকার রাক্ষসীর বুকে নির্ভয়ে খেলা করছেন তখন

তাঁরা সভয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে বালক শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলে নিল। অতঃপর তারা যশোদা ও রোহিণীর সঙ্গে বালককে গোশালায় নিয়ে গিয়ে ধনুপুচ্ছকে চামররূপে ব্যবহার করে ও তাদের প্রচলিত নিয়মাদি পালন করে তাঁকে দোষমুক্ত করল। শ্রীভগবানের প্রতি অঙ্গ এইভাবে গোপিনীদের দ্বারা সুরক্ষিত হল। তারা শ্রীভগবানকে শিশু অবস্থাতেই প্রেমে আবদ্ধ করে ফেলল। মাতা যশোদা পুত্রকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে স্তন্য পান করিয়ে দোলনায় শুইয়ে দিলেন।

পূতনার মৃতদেহ বিশাল ও অতি ভয়ংকর দর্শন ছিল। ব্রজবাসীগণ তা দেখে হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর ভয়ানক রাক্ষসীকে মৃত দেখে তারা কুঠার দ্বারা সেই দেহ পাঁচ খণ্ড করল এবং পূতনার স্বয়ং আয়োজিত কাষ্ঠদ্বারা তাতে অগ্নি সংযোগ করল। সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখল যে পূতনার অগ্নি সমর্পিত দেহ থেকে অগুরু ও চন্দনের সুবাস পাওয়া যাচ্ছে। পূতনা অবিদ্যা ছিল কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে সে শ্রীভগবানের স্পর্শ লাভ করেছিল। তাই তার শ্রীকৃষ্ণ জননীসম অতি উত্তম গতি লাভ হল।

নন্দবাবা এইসময়ে মথুরা থেকে অন্যান্য গোপদের সঙ্গে গোকুলে প্রত্যাগমন করছিলেন। গোকুলের অদূরে বিশাল অগ্নিশিখা দেখে ও বাতাসে অগুরু চন্দনের ঘ্রাণ লাভ করে তিনি মনে করলেন যে তাঁর সঞ্চিত চন্দন ভাণ্ডারে আগুন লেগে গেছে! তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন আর দেখলেন যে সেই অনুমান ঠিক নয়। কিন্তু বিশাল এক রাক্ষসীর দেহ দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ব্রজবাসীদের কাছে প্রকৃত ঘটনা জেনে ও পুত্রকে অক্ষত দেখে তিনি শ্রীভগবানকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

শ্রীভগবানের রামাবতারে সর্বপ্রথম তাড়কা রাক্ষসী বধ ও শ্রীকৃষ্ণরূপে আগমনের সময়ে সর্বপ্রথম পূতনা রাক্ষসী বধ করা একটাই শিক্ষা আমাদের দেয়। রাক্ষসী রাক্ষসদের উৎস (উৎপত্তি স্থান)। তাই ভবিষ্যতে আরও রাক্ষস যাতে না আসে তার জন্য প্রথমে উৎস মুখে তার প্রতিকার আমাদের জীবনে একান্ত প্রয়োজন।

পূতনা বধের সময়ে বালকের নয়ন কপাট রুদ্ধ করবার ঘটনা লক্ষণীয়।

কয়েকটি কারণ এইরূপ হওয়া সম্ভব :

(১) পূতনা অবিদ্যা। শ্রীভগবানের সম্মুখে অবিদ্যা থাকলে লীলা কেমন করে চলে ? তাই চোখ বন্ধ করা।

(২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন বাল্যলীলা করছেন। বালক ভয়ে তো চোখ বন্ধ করবেই।

(৩) শ্রীভগবান ভাবলেন যে তিনি বিষপান কখনো করেননি। তাই তিনি চোখ বন্ধ করে বিষপানের সময়ে নীলকণ্ঠ শ্রীশংকরকে স্মরণ করছিলেন যিনি বিষ পানের জন্য নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত।

(৪) নয়নে চন্দ্রসূর্যের আলোক বর্তমান। তা রাক্ষসীকে দান করা যায় না।

(৫) নয়ন মিলিত হলে প্রেমপ্রীতি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে পূতনাকে তো তা দেওয়া কখনই সম্ভব নয়।

(৬) মাতৃনাম অতি পবিত্র। পূতনা সেই মাতৃনামের অবমাননা করছিল ; সে অনুচিত কার্য করছিল। মাতৃনাম কলুষিত করছিল। তার মুখ দেখাও পাপ।

(৭) নয়ন বন্ধ করে শ্রীভগবান পূতনার পূর্বজন্মের ইতিহাস দেখছিলেন। পূতনা পূর্বজন্মে বলি রাজার কন্যা রত্নমালা ছিল। বামনাবতারে বিশাল শরীর ধারণ করায় তা দর্শন করে বলি প্রসন্ন হলেও, কন্যা রত্নমালার মনে প্রতিশোধের চিন্তা বর্তমান ছিল।

(৮) করুণাদৃষ্টিতে দেখলে যে বধ করা যাবে না আর উগ্রদৃষ্টিতে দেখলে ভস্ম হয়ে যাবে। লীলাসিদ্ধি হেতু নয়ন বন্ধ করাই ভালো।

(৯) শিশুহত্যা যে করছে তাকে দেখতে তাঁর ইচ্ছা হয়নি।

(১০) চোখ খোলা থাকলে তার রাক্ষসীরূপ বেরিয়ে পড়বে ; তাতে সমগ্র ব্রজবাসী ভয় পেয়ে যাবে। তাই চোখ বন্ধ করা। মা ভয় পেয়ে গেলে লীলাভিনয় চলবে কেমন করে ?

শিশু শ্রীকৃষ্ণের এই পূতনাবধ যে এত অর্থবহ তা আগে কে জানত !

———০———

ব্রজরজ ধারণ

যদ্যেবং তর্হি ব্যাদেহীত্যুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ।
ব্যাদত্তাব্যাহতৈশ্বর্যঃ ক্রীড়ামনুজবালকঃ॥ (১০।৮।৩৬)

আজ এক সাংঘাতিক অভিযোগ নিয়ে অন্যান্য সমবয়সী বালকদের সঙ্গে দাদা বলরাম অনুজ শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে মা যশোদার কাছে উপনীত হয়েছে। অভিযোগ—শ্রীকৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। মা যশোদা অভিযুক্ত বালকের হাত চেপে ধরে প্রশ্ন করলেন—'মাটি খেয়েছিস কেন ? বল !'

অভিযুক্ত তখন উভয় সংকটে। যদি স্বীকার না করে তাহলে দাদা শাস্তি পাবে আর স্বীকার করলে যে কী হবে তা বলা যাচ্ছে না। তাই এক উপায় উদ্ভাবন করতেই হল। অভিযুক্ত উত্তর দিল—'মাটি খেয়েছি কি না তুমিই দেখো নাও।' মুখ খুলতেই মা যশোদা সেইখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তিনি দেখতে পেলেন আকাশ, দিক্‌সমূহ, পর্বত, দ্বীপ এবং সমুদ্রসহ সমস্ত বিশ্বচরাচর, প্রবহমান বায়ু, বজ্র, অগ্নি, চন্দ্র এবং তারকাসহিত সম্পূর্ণ জ্যোতির্মণ্ডল, জল, তেজ, পবন, বৈকারিক অহংকারের কার্যদেবতা, মন-ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রা এবং গুণত্রয়। তিনি আরও দেখলেন জীব, কাল, স্বভাব, কর্ম, তার বাসনা এবং দেহাদি দ্বারা বিভিন্ন রূপে দৃষ্ট এই সমগ্র বিচিত্র সংসার, সম্পূর্ণ ব্রজ এবং নিজেকেও।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে যশোদা শঙ্কিত হয়ে ভাবতে লাগলেন— 'এ কি স্বপ্ন না শ্রীভগবানের কোনো মায়া ? আমার বুদ্ধিভ্রম হয়নি তো ? গর্গাচার্য তো বলেছিলেন যে এই বালক পূর্ব জন্মে সিদ্ধ ছিল। এ কৃষ্ণেরই কোনো সিদ্ধি অথবা ঐশ্বর্যের প্রকাশ নয় তো ?' পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় তিনি শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। যখন মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বুঝতে পারলেন তখন শ্রীভগবানের বৈষ্ণবীশক্তি তাঁর বাৎসল্য স্নেহরূপী মায়া বিস্তার করে মার প্রার্থনার কথার বিস্মৃতি আনল আর তিনি আগের মতনই স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন। যোগমায়ার ব্যবহার

প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল কারণ প্রকৃত তত্ত্ব জেনে ফেললে যে লীলাখেলাই বন্ধ হয়ে যায় !

সবই তো জানা গেল, কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় যে পরমপুরুষ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ব্রজরজ মুখে নিলেন কেন ? তাঁর লীলার কোনো ঘটনা তো অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছিত হওয়া সম্ভব নয়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই ঘটনাকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার অল্প কয়েকটি এইরকম—

(১) পৃথিবী অথবা ভূমি ক্ষমাশীল। প্রতিনিয়ত পদদলিত হয়েও তার বিশেষ গুণ, ক্ষমাকে অন্তরে ধারণ করবার শিক্ষা দান হেতুই তাঁর এই রজ মুখে ধারণ করা। ভক্তকে ক্ষমাশীল হতেই হবে।

(২) পূতনা বধ কালে শ্রীভগবান তার স্তন থেকে বিষ গ্রহণ করেছিলেন আর ব্রজরজ তো মহৌষধি। তাই তা ধারণ করা।

(৩) শ্রীভগবানের উদরে অবস্থানকারী কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীব ব্রজরজ কিংবা গোপিনীদের চরণরজ লাভ করবার জন্য ব্যাকুল ছিল। তাদের অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য শ্রীভগবানের রজ গ্রহণ।

(৪) শ্রীভগবান যেমন ভক্তদের প্রিয়, ভক্তগণও শ্রীভগবানের কাছে অতি প্রিয়। ভক্তপদরজ ধারণ করে তিনি তা অন্তরে ধারণ করেছিলেন।

(৫) ব্রাহ্মণ যেমন দ্বিজ, দন্তরাজিও দ্বিজ। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ জগতের কল্যাণের জন্য, পৃথিবীর অথবা ভূমির কল্যাণের জন্য। তাই ভূমির কিছু অংশ ব্রজরজরূপে দ্বিজকে দান করেছিলেন।

(৬) পরিষ্করণ ক্রিয়ায় মাটির ব্যবহার সতত হতে দেখা যায়। ননী, মাখন ইত্যাদি খাওয়া মুখ পরিষ্করণ হেতু রজ গ্রহণ করা।

(৭) তখনকার ব্রাহ্মণকুল কেবল সাত্ত্বিক কর্মে যুক্ত ছিল কিন্তু অসুর বিনাশ হেতু রজস্ ধারণ করা আবশ্যক। তা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য রজ ধারণ করা।

(৮) পূতনা বধ কালে পূতনার প্রাণ আকর্ষণের প্রয়োজন হয়েছিল। শ্রীভগবান সেই বালকদের প্রাণও আকর্ষণ করে নিয়েছিলেন যাদের পূতনা গ্রাস করে নিয়েছিল। তাদের উদ্ধার করবার জন্যই পরম পবিত্র ব্রজরজ ধারণ করা।

তাই মনে হয় এই মাটি খাওয়াটা একটা অনাবশ্যক ঘটনা কখনই নয়।

———o———

নামকরণ সংস্কার পালন

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।

বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥ (১০।৮।১৪)

যদুবংশের কুলগুরু ব্রহ্মজ্ঞ তাপস শ্রীগর্গাচার্য। কংসের কারাগারে বন্দী শ্রীবসুদেবের মুখে নন্দভবনে লালিতপালিত পুত্রদ্বয়ের জন্মবৃত্তান্ত জেনে শ্রীবসুদেব কর্তৃক ক্ষত্রিয়োচিত নামকরণ সংস্কার করবার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হলেন। শ্রীবসুদেব চাইতেন যে গোকুলে লালিতপালিত হলেও পুত্রদ্বয় যেন বৈশ্যোচিত সংস্কারযুক্ত না হয়ে যদুকুলের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে দীক্ষিত হয়। শ্রীগর্গাচার্য ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। তিনি সবই জানতেন। তিনি জানতেন যে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী শ্রীবসুদেবের পুত্ররূপে নন্দালয়ে রয়েছেন। তাঁর নামকরণ সংস্কার করা তো পরম সৌভাগ্য। তাই তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

অতএব ছদ্মবেশে শ্রীগর্গাচার্যের নন্দবাবার আলয়ে গোকুলে আগমন হল। তাঁর আগমনে নন্দবাবা অতি প্রসন্ন হলেন। পাদ্য-অর্ঘ্য-আসন আদি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দ্বারা তিনি পূজিত হলেন। কংসের কোপ থেকে নন্দদুলালকে রক্ষা করবার জন্যই যদুকুলের পুরোহিতের নন্দভবনে ছদ্মবেশে আগমন। নন্দবাবা যখন সেই ব্রহ্মবেত্তা শ্রেষ্ঠকে পুত্রদ্বয়ের নামকরণ সংস্কারের কথা বললেন তখন শ্রীগর্গাচার্য প্রসন্ন হলেন কারণ সেই কারণেই তো তাঁর গোকুলে আগমন। তিনি যেহেতু যদুকুলের আচার্যরূপে প্রসিদ্ধ তাঁর দ্বারা নামকরণ সংস্কারের কথা কংসের কানে উঠলে বালকযুগলের প্রাণসংশয় হতে পারে কারণ দৈববাণী অনুসারে দেবকীর অষ্টম সন্তান কন্যা হতেই পারে না—কংসেরই এইরকম ধারণা আছে। অতএব নন্দবাবার অনুরোধ গোপনে নামকরণ সংস্কার করাই স্থির হল। এই অনুষ্ঠানে বাইরের কাউকে জানানো তো হলই না, নিকট আত্মীয়দের

কাছেও তা গোপন রাখা হল।

শ্রীগর্গাচার্য প্রেমীভক্ত, নন্দদুলালের সব কথাই তিনি জানেন। তিনি অবাক হয়ে গেলেন এই দেখে যে শ্রীভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করেও নন্দ-যশোদা তাঁকে সাধারণ মানবশিশুসম বাৎসল্য সহিত লালনপালন করছেন এবং শ্রীভগবানও তা পরম আনন্দে উপভোগ করছেন। নন্দ-যশোদা যে শুদ্ধ বাৎসল্য ভাব ধারণ করে আছেন যার জন্য শ্রীভগবানও এঁদের বশীভূত হয়ে আছেন। তাঁদের পুত্র স্বয়ং ভগবান—একথা জানানো ঠিক হবে না। জানালে তাঁদের শুদ্ধ বাৎসল্য ভাবে ছেদ আসবে আর শ্রীভগবানও সেই রসাস্বাদনে বঞ্চিত হবেন ; বস্তুত তাঁর ব্রজে আগমনেরই উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। মহামুনি গর্গাচার্যের পক্ষে এ কাজ করা ঠিক হবে না। তিনি ঠিক করলেন যে শিশু দুটির নামকরণ সংস্কারের সময়ে তাদের ভবিষ্যৎ তিনি এমনভাবে বলবেন যাতে নন্দ-যশোদার বাৎসল্য ভাবে আঘাত না লাগে। গোপন রাখবার জন্য অনুষ্ঠান গোশালায় করা স্থির হল।

গোশালায় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যবস্থাদি করা হল। আলপনা, বিভিন্ন রং দিয়ে পূজাভূমি সাজানো হল। পূজার্চনা হল আর পুরোহিতরূপে ব্রহ্মজ্ঞ গর্গাচার্যই পৌরহিত্য করলেন। অতঃপর নামকরণ সংস্কার হেতু পুরোহিত মা যশোদা ও রোহিণীকে তাঁদের পুত্রদের কোলে নিয়ে বসতে বললেন। মহামুনি সর্বজ্ঞ কিনা যাচাই করবার জন্যই যশোদা কোলে নিলেন রোহিণী পুত্রকে আর তাঁর পুত্র স্থান পেল রোহিণীর ক্রোড়ে।

শ্রীগর্গাচার্য বললেন—'এই পুত্র রোহিণীর, তাই তার নাম হবে রৌহিণেয়। সে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিজ গুণে পরম আনন্দ প্রদান করবে। তাই তার দ্বিতীয় নাম 'রাম'। এ অতি বলবান হবে, তাতে সে 'বল' নামেও প্রসিদ্ধ হবে। এর আর এক নাম 'সংকর্ষণ'। তিনি 'সংকর্ষণ' নামের কারণ না দিলেও বালক যে দেবকী মাতার গর্ভ থেকে সংকর্ষণ করে রোহিণী মাতার গর্ভে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, তা তিনি নামকরণ কালে প্রমাণ করে দিলেন।

আচার্য রোহিণী পুত্রের নামকরণ সংস্কার করে রোহিণী ক্রোড়ে স্থাপিত

যশোদা নন্দনের দিকে দেখলেন। তিনি বালককে দর্শন করেই ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন। শ্রীভগবান স্বয়ং শিশুরূপে তাঁর সম্মুখে বর্তমান আর তাঁর মতন একজন সাধারণ ভক্তকে নামকরণ সংস্কারের আচার্যরূপে দায়িত্ব দানের কৃপা তাঁরই। তিনি ভাবাবেগে অতি কষ্টে তাঁর উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালনের চেষ্টা করলেন।

শ্রীগর্গাচার্য বললেন—'এই যশোদানন্দন—তাঁর যুগে যুগে আগমন হয়েছে। পূর্বে শুক্ল, রক্ত ও পীত বর্ণ ধারণ করে অবতরণ করলেও এখন তাঁর আগমন কৃষ্ণবর্ণ দেহধারণ করে। অতএব বহু নামের মধ্যে তাঁর এক নাম 'কৃষ্ণ' অর্থাৎ 'আকর্ষণ করেন'। বালকের নাম তাই 'কৃষ্ণ'।' কিন্তু বাৎসল্য প্রেমে নিমগ্ন নন্দ ভাবলেন যে তাঁর উপাস্য দেবতা নারায়ণের এক নাম 'কৃষ্ণ' তাই বুঝি আচার্য ইষ্টদেবতার নামের সঙ্গে মিলিয়ে বালকের নাম 'কৃষ্ণ' দিলেন।

শ্রীগর্গাচার্য অতঃপর বললেন—'হে নন্দ ! তোমার এই পুত্র পূর্বে শ্রীবসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিল। তাই তার আর এক নাম 'বাসুদেব'।' শ্রীনন্দ ভাবলেন যে এই পুত্র হয়তো পূর্বজন্মে শ্রীবসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিল, তাই তখনও 'বাসুদেব' নাম রাখা হয়েছিল।

অতঃপর আচার্য জানালেন যে যশোদানন্দনের আরও বহু নাম আছে ও বহু রূপও আছে। যত গুণ, যত কর্ম সব বিচার করে আরও বহু নাম আছে। তিনি ভগবানের অবতরণকে গোপন রাখবার জন্য নন্দবাবাকে সাধারণ কিছু কথা বললেন।

শ্রীগর্গাচার্য বললেন—এই বালক তোমাদের পরম কল্যাণ সাধন করবে। সমস্ত যাদবকুল ও গোকুলকে আনন্দদান করবে। এর সাহায্যে তোমরা ভয়ানক সব বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবে।

এই বলে শ্রীগর্গাচার্য অনুষ্ঠান শেষ করে আশ্রমে ফিরে গেলেন।

———o———

অহৈতুকী কৃপা

ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যং করদ্বয়ম্।

ফলৈরপূরয়দ্ রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ॥ (১০।১১।১১)

নন্দালয়ের আঙিনায় নন্দদুলাল কার প্রতীক্ষায় যেন একাকী স্তূপীকৃত ধান নিয়ে খেলায় মত্ত। আজ কোন্ ভক্তের আগমন হবে তাই নন্দদুলালের একান্তে অপেক্ষা করা ? খেলার সঙ্গীসাথি সমবয়স্ক বালকগণ তখনও এসে উপস্থিত হয়নি। আর মা যশোদাও অন্যান্য গৃহকর্মে ব্যস্ত বলে ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত। কৌশলে সকলেই অনুপস্থিত।

অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত ভক্তের গলা শোনা গেল। এক ফল বিক্রেতা রমণী গৃহের দ্বার থেকে হাঁক পাড়ছে—'ফল চাই, ফল !' জগতের সর্বফলপ্রদাতাকে ফল বিক্রয় করে যে রমণী, তার আগমনের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারা কঠিন। হয়তো, সে এই ছুতোয় নন্দদুলালকে দেখতে ফলবিক্রেতা রমণীরূপে এসেছে। ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে নন্দদুলালকে ছুটে বাড়ির বাইরে যেতে দেখা গেল। কিনতে গেলে দাম দিতে হয় তাই যাওয়ার সময়ে সে এক মুঠো ধান নিতে ভুলে গেল না। কিন্তু বালকের ছোট ছোট আঙুলের ফাঁক দিয়ে প্রায় সব ধানই পথে ছড়িয়ে পড়ল।

নবনীরদকান্তি শ্যামসুন্দরের বাল্যরূপ ফলবিক্রেতা রমণীকে মোহিত করল। হৃদয়পত্রদল তখন পল্লবিত হয়ে সেই অনুপম মাধুর্যযুক্ত বালকে সমর্পিত হয়ে গেছে। মনও আর বশে নেই ; সুগন্ধিত পুষ্পরূপে বালকের মোহন রূপে নিবেদিত হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছে। যিনি নিজ ঐশ্বর্য থেকে কখনো বিচ্যুত হন না সেই অচ্যুতের কথা সেই অদ্ভুত ভাবাবেশে আচ্ছন্ন রমণীকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

—'ফল এনেছ ? কই দাও ! এই নাও দাম।'

—'কই দাম ? তোমার হাতে তো মাত্র কয়েকটা ধান লেগে আছে। মনে হচ্ছে আনবার সময় পথে পড়ে গেছে। কিন্তু এই কটা ধান দিয়ে তো ফল কেনা যাবে না ; তাই, বল, আমি ফল দিলে তার বদলে তুমি আমাকে কী দেবে ?'

'আমাকে তো সকলে এমনি এমনিই দিয়ে দেয়। ক্ষীর, ননী, মাখন যা চাই, তাই দেয়। মা দেয়, প্রতিবেশীরা দেয়। দাম তো কখনো কেউ চায় না। তুমি চাইছ কেন ?'

নন্দদুলালের কথা শুনে ফল বিক্রেতা রমণীর বাৎসল্য রসের কলস উপছে পড়ল আর তা নয়ন পথে অশ্রুরূপে প্রবাহিত হল। এই অশ্রুবারি যে নন্দদুলালের অতি প্রিয় বস্তু। অতএব বারি অর্পণও হয়ে গেল। এইবার রমণী কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে নন্দদুলালকে উত্তর দিল।

'আচ্ছা বেশ ! কেউ যখন দাম চায় না, আমিও চাইব না। তবে ক্ষীর, ননী খাওয়ার জন্য তুমি যেমন মাকে 'মা' বলে ডাক, তাঁর কোলে ওঠ, সেইরকম তুমিও তাহলে আমার কোলে ওঠ আর একবার আমাকে 'মা' বলে ডাক। তাহলে আমি আমার সব ফল দিয়ে দেব আর চিরদিন তোমার মার সেবা করব।'

খুব সহজ-সরল প্রস্তাব। একবার মা বলে কোলে উঠলে যদি সব ফল পাওয়া যায় তাহলে মন্দ হয় না। বলছে তো নিয়ে যাবে না আর চিরদিন মার সেবা করবে। কেউ কোথাও নেই, এই বেলা একবার কোলে উঠলে কেউ টেরও পাবে না আর অতগুলো ফলও পাওয়া যাবে।

তাই নন্দদুলাল কোলে উঠে একবার 'মা' বলে রমণীকে কৃতার্থ করল। যে নন্দদুলালকে ধ্যানে দর্শন পাওয়ার জন্য মুনিঋষিগণ যুগ যুগ ধরে পর্বতের গুহায় তপস্যা করেন সেই নন্দদুলাল আজ যেচে কোলে উঠেছে, মা বলে ডেকেছে আর স্পর্শ দান করে মানবজন্ম সার্থক করে দিয়েছে। আজ শ্রীভগবানের স্পর্শলাভ করে রমণীর আনন্দের সীমা রইল না। ফলবিক্রেতা রমণী আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার ঝুড়ির সব কটা ফল নন্দদুলালকে দিয়ে বাৎসল্য রসে আপ্লুত হয়ে তার দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল,

যতক্ষণ না নন্দদুলাল ফল নিয়ে গৃহাভ্যন্তরে অদৃশ্য হল। বাহ্য জগৎ থেকে সেই মনোহর দৃশ্য মুছে গেলেও তার হৃদয়ে তা চিরদিনের মতন অঙ্কিত হয়ে গেল। শ্যামসুন্দরের ফল চাওয়া, কোলে ওঠা, মা সম্বোধন করবার দৃশ্য যেন বারে বারে রমণীকে আনন্দ প্রদান করতে লাগল। ভাবাবেশে ঝুড়ি তুলে দিশেহারা ফলবিক্রেতা রমণী অনেকক্ষণ পথে হেঁটে জানতে পারল যে সে উল্টো পথে অনেকখানি পথ চলে এসেছে। হঠাৎ তার মনে হল খালি ঝুড়িটা এত ভারী কেন ? ঝুড়ি নামিয়ে সে দেখল ঝুড়ি তার শূন্য নয়, নানারকম মণি মাণিক্যতে ঠাসা। সেই সকল ধনসম্পদ কোথা থেকে এল ? রমণীর বুঝতে সময় লাগল। তার আচমকা অনুভূতি হল—তাহলে স্বয়ং শ্রীভগবান বালক রূপে তাকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়েছে, তার বিনিময়ে মূল্য কখনো কাম্য নয়। শ্রীভগবান যখন হৃদয় মন্দিরে বিরাজমান তখন আর ধনরত্নের প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? ঝুড়ি পড়ে রইল পথের ধারে ; ঈশ্বরাবেশে বেহুঁশ হয়ে রমণী মুক্তির দিব্য পথে এগিয়ে চলল। আজ মানবজন্ম লাভের উদ্দেশ্য তার পূর্ণ।

শুভবুদ্ধি নিষ্কাম ভক্ত তাঁকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেছে। সেই ভক্তিপূত উপহার নন্দদুলাল প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তাঁর অহৈতুকী কৃপা আজ না হয় ফলবিক্রেতা রমণীর উপর হয়েছে ; তা যে ভবিষ্যতে অন্যান্য ভক্তদের উপরও হওয়া সম্ভব অবশ্যই। তাই তাঁর কৃপার জন্য তাঁর কাছেই প্রার্থনা করে যেতে হবে। আর পত্র, পুষ্প, ফল আর জল তো সকলের কাছেই আছে ; তার খোঁজে কোথাও যেতে হবে না।

———o———

দামোদর

এবং সংদর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা।

স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে॥ (১০।৯।১৯)

গোকুলে কানাই ব্রজলীলা করছেন। এক বিষম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। যে গৃহ থেকে মাখন, দধি, নবনীত আদি স্নেহপদার্থ চুরি যায় না সেইখানের গোপিনীগণ ভীষণ চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন ! স্নেহ শ্রীভগবানের জন্য সাজিয়ে রাখা থাকে। স্নেহপদার্থ তিনি যদি স্বয়ং নিজের হাতে নিয়ে গ্রহণ করেন তা যে তাঁর অসীম কৃপা তা তো বলাই বাহুল্য। তিনি ভক্তকে মনে রেখেছেন তা যেন তাঁর বিশেষ ভক্তের গৃহে অতি সন্তর্পণে আগমনে প্রমাণ হয়ে যায়। তাই তা চুরি না হলেই এত বিষণ্ণতা !

কানাই যে পরের বাড়িতে মাখন, দধি, নবনীত খেয়ে বেড়ায় তা মাতা যশোদার পছন্দ হয় না। কানাই বালক মাত্র, তার তো আপন পর ভেদাভেদের জ্ঞানের লেশমাত্র নেই ; সে সকলের, তাই সে নিজের দ্রব্য আহরণ করে সকলকে বোঝাতে চায় যে প্রেমপ্রীতি-স্নেহ বিলিয়ে দিতে হয়, কেবল সযত্নে আগলে রাখলে হয় না। আজ মাতা যশোদা দাসীদের অন্য কার্যে ব্যস্ত রেখে স্বয়ং নন্দদুলালকে মাখন খাওয়ানোর জন্য দধি মন্থন করতে বসলেন। মন তাঁর প্রসন্ন তাই গুনগুন করে শ্রীভগবানের লীলাগানও করছেন। দধি মন্থন কালে মন্থনদণ্ডের তালে তালে শব্দ হচ্ছে। সেই তালে হস্তের কঙ্কণ ও কর্ণফুলে আন্দোলন হচ্ছে। তালে তালে কঙ্কণের ঠুং ঠাং শব্দ হচ্ছে। মন্থন প্রক্রিয়ায় মাতার অঙ্গে নৃত্যের লাস্য বর্তমান। এইভাবে শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত নৃত্য, বাদ্য ও গীতের পরিবেশনে সম্পূর্ণ-সংগীত পরিবেশিত হচ্ছে। এইবার ঘটনাস্থলে কানাইয়ের আগমন হল মাতৃদুগ্ধ পান হেতু। সে এসে মন্থনদণ্ড হাত দিয়ে ধরে মন্থন কার্যে বাধা দিল।

এইবার বালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতাকে স্তনপান করাতে বাধ্য করলেন। বাৎসল্য প্রেমাতিশয্যে মাতৃস্তন দুগ্ধ ক্ষরণ করে ধন্য হতে লাগল।

আচমকা মাতার নজর গেল উনানের দিকে। আঁচে দেওয়া দুগ্ধ উৎলাচ্ছে। পুত্র এইবার মাতার চাঞ্চল্য লক্ষ করল ; দেখতে চাইল যে তাঁর কাছে কোন্‌টা বেশি প্রিয়—দুধ না পুত (সন্তান) ! মাতা পুতকে অতৃপ্ত রেখে দুধ রক্ষায় ছুটলেন। কানাই এইবার লীলাঙ্গন প্রস্তুত দেখে কৃত্রিম রাগ প্রদর্শন করে নুড়ি দিয়ে দধিভাণ্ড ভেঙে দিল। নয়নে অশ্রু, ওষ্ঠ প্রকম্পন আদি বালকের ক্রোধের অভিনয় করে সে অন্য ঘরে গিয়ে সঞ্চিত ননী গ্রহণ করতে লাগল।

মাতা যশোদা উনানের দুগ্ধ সামলে দধি মন্থন স্থলে এসে দধিভাণ্ড ভাঙা দেখে তা পুত্রের কাণ্ড বুঝলেন। পুত্রের অনুসন্ধানে জানা গেল যে সে এক উল্টানো উদূখলের উপর দাঁড়িয়ে শিকের উপর রাখা মাখন নিয়ে বানরদের খাইয়ে দিচ্ছে। বালক সতর্ক যাতে মাতা যেন ঘটনা জেনে না যায় ; আর মাতাও সতর্ক হস্তে, লাঠি নিয়ে চুপিচুপি বালকের পিছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। লীলাভিনয়ের রঙ্গভূমি প্রস্তুত হয়ে গেল। বালক দেখল মা লাঠি নিয়ে প্রহারে প্রস্তুত। সে তাড়াতাড়ি উদূখলের উপর থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল আর যেন খুব ভয় পেয়েছে এমন অভিনয় করে ছুটে পালাতে লাগল। যে শ্রীভগবানকে বিশুদ্ধ মনে তপস্যা দ্বারা যোগিগণ যুগ যুগ ধরে লাভ করবার চেষ্টা করে থাকেন, তাঁকেই ধরবার জন্য লাঠি হাতে মা যশোদা পিছন পিছন ছুটতে লাগলেন।

স্থূলাঙ্গী মাতা অল্প ছুটেই হাঁপিয়ে গেলেন। তাঁর কবরীবন্ধন শিথিল হয়ে গেল আর কবরীসংলগ্ন পুষ্পমাল্য থেকে পুষ্প ঝরে পড়তে লাগল। কোনো মতে তিনি বালককে ধরে ফেললেন আর লাঠি হাতে ভয় দেখাতে লাগলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তখন অনুপম সৌন্দর্য। হাত দিয়ে চোখের জল সামলানোয় কাজলে মুখ ভর্তি আর ভয়ে চোখ কপালে। মাতা দেখলেন নন্দদুলাল ভয়ানক ভয় পেয়েছে তখন তাঁর হৃদয়ে বাৎসল্য স্নেহ উথলে উঠল। তিনি লাঠি ফেলে দিলেন। আর যাতে পুত্র না পালায় তাই তিনি তাঁকে

বাঁধবার কথা ভাবলেন। সন্তানের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে মাতা তখনও সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন না। যিনি ইন্দ্রিয়াতীত, অব্যক্ত ও সমষ্টি চৈতন্যরূপে সর্বত্র বিস্তৃত তাঁকে নরলীলাকালে বালকরূপে সম্মুখে পেয়ে নন্দরানীর বাঁধতে যাওয়ার প্রসঙ্গ তাই বিশেষ কৌতুকপ্রদ বলা যেতে পারে।

দড়ি জোগাড় হল। উদরে বাঁধতে গিয়ে তা দুই আঙুল ছোট পড়ল। অন্য দড়ি এনে জুড়ে বাঁধবার চেষ্টা হল আবার দুই আঙুল ছোট পড়ল। ক্রমাগত উদরে দড়ি বাঁধবার প্রয়াসে মাতা ব্যর্থ হলে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে গেলেন, তাঁর কবরী সংলগ্ন পুষ্পমাল্য স্থানচ্যুত হয়ে গেল। দামোদর স্বয়ং কৃপা করে নিজ মাতাকে দাম (রজ্জু) বন্ধনে সাহায্য করে ভক্তকে কৃপা করলেন। এই ঘটনা স্পষ্টভাবে সূচনা দেয় যে শ্রীভগবান ভক্তের বশীভূত হন।

শ্রীভগবান উদূখলে বন্ধন স্বীকার করেছেন কিন্তু তাঁর যে এই লীলার এক বিশেষ প্রয়োজন ছিল তা তখন কে জানত ! তিনি বালকরূপে সম্মুখের দুই অর্জুনবৃক্ষের দিকে চললেন। সঙ্গে তাঁর উদরদেশে বাঁধা রজ্জুর সঙ্গে উদূখলও চলল। নন্দরানী তখন অন্যান্য গৃহকার্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বালক দুই অর্জুনবৃক্ষের মধ্য দিয়ে চলে গেল আর পিছনে টানতে টানতে আনা উদূখল গেল আটকে। ভগবান শ্যামসুন্দর তখন আরও টানতে গাছ দুইটি মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন দুইটি উজ্জ্বল দেবমূর্তি—নলকূবর ও মণিগ্রীব। এঁরা পূর্বে রুদ্র অনুচর ছিলেন। এই কুবের পুত্রগণ দেবর্ষি নারদের অভিশাপে যমজ অর্জুন বৃক্ষরূপে অবস্থান করছিলেন। শ্রীভগবান তাদের মুক্তি দিলেন।

এই গোপিকানন্দন ভগবান অনন্যপ্রেমী ভক্তদের জন্য যতটা সহজলভ্য, কর্মপথ ও জ্ঞানপথ অবলম্বনকারীদের জন্য ততটা নয়। দেবর্ষি নারদ তাঁর অনন্য ভক্ত। তাঁর কথা সত্য প্রমাণ করবার জন্য শ্রীভগবানের উদূখল টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া। এই লীলার তাই বিশেষত্ব অপিরসীম।

———o———

অঘাসুর বধ ও ব্রহ্মার মোহভঙ্গ

চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ॥ (১০।১৩।৪৭)

গোপবালকদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ লীলার মাধুর্য অপরিসীম। অঘাসুর এমনিতেই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উদ্গ্রীব ছিল কারণ তার ভাই বকাসুরকে ও বোন পূতনাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বধ করেছিলেন। তাই সে শ্রীভগবানের গোচারণ লীলা কালে একদিন পর্বতসম বৃহৎ দেহ ও পর্বত গহ্বরের মতো মুখবিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড অজগর সর্পের রূপ ধারণ করে গোপবালকদের চলার পথে পড়ে রইল। পর্বত গহ্বর মনে করে গোপবালকগণ প্রবেশ করলেও বালক শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু অঘাসুরের বদ উদ্দেশ্য ধরে ফেললেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন সখা গোপবালকদের রক্ষা করবার জন্য অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করলেন। শ্রীভগবান মুখের ভিতরে প্রবেশ করে নিজেকে স্ফীত করে তুললেন আর তাতেই অঘাসুরের শ্বাসনালি অবরুদ্ধ হল আর সে প্রাণ হারাল। তার স্থূল দেহ থেকে অতিশয় অদ্ভুত এক জ্যোতি নির্গত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মিলিয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। স্বয়ং ব্রহ্মাও তা দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। অতঃপর বালক শ্রীকৃষ্ণ মৃতপ্রায় গোপবালকদের অঘাসুরের মুখের ভিতর থেকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

পঞ্চমবর্ষীয় বালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদিন সখাদের সঙ্গে গোচারণে বেরিয়ে রমণীয় যমুনার তীরে এলেন। সেই স্থান সেদিন তাঁর লীলা প্রত্যক্ষ করবার জন্য সুসজ্জিত হয়েছিল। সেখানে ছিল বিভিন্ন বর্ণের প্রস্ফুটিত কমলদলের শোভা। ভ্রমর গুঞ্জরণ ও পক্ষীর কলরব পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলেছিল। গোবৎসসকল তাদের প্রিয় নবীন তৃণরাশির প্রাচুর্য লক্ষ করে

আনন্দে তা গ্রহণ করছিল। মনোরম স্থান তৎক্ষণাৎ বিশ্রাম ও ক্ষুধা নিবারণের জন্য নির্বাচিত হয়ে গেল। গোপবালকগণ বালক শ্রীকৃষ্ণকে অর্ধচন্দ্রাকারে পরিবেষ্টন করে সেই যমুনা কূলেই বসে পড়ল।

গোপবালকদের প্রত্যেকের সঙ্গেই কিছু আহার্য বস্তু ছিল। এক এক করে তাদের আনা বস্তু বার করা হতে লাগল। বালকগণ এই খাওয়াকে হাসিঠাট্টা করে আরও আকর্ষণীয় করে তুলল। প্রত্যেকেরই দৃষ্টি অন্যজন কী এনেছে। তারপর তা জানা হয়ে গেলে কাড়াকাড়ি করে খাওয়া হতে লাগল। এইভাবে মাখন, জিলিপি, লাড্ডু খাওয়ায় সময়ে কারও ভাগে এক টুকরো আবার কারও ভাগে আরও কম করে পড়ল। কাজেই সকলের ভাগেই অন্যের খাওয়া এঁটো বস্তু পড়তে লাগল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও মহানন্দে তাই গ্রহণ করতে লাগলেন।

বাল্যলীলায় মত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর আনা দই মাখা ভাত বার করলেন। তা তিনি নিজের হাতে সখাদের খাইয়ে দিলেন আর তারপর সেই হাতেরই আঙুল চেটে তা নিজে গ্রহণ করলেন। এইভাবে বালকদের বনভোজন জমে উঠল। এদিকে শ্রীব্রহ্মা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে যিনি যজ্ঞ সকলের একমাত্র ভোক্তা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে অন্যান্য গোপবালকদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করছেন। তাঁর মনে আবার সন্দেহ দেখা দিল। তিনি জানতে চাইলেন যে, ব্রজে যে বালক লীলা করছেন তিনি যজ্ঞেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অথবা অন্য কেউ। অতএব বালকের আচরণ প্রত্যক্ষ করবার জন্য শ্রীব্রহ্মা নিকটে গোচারণে যুক্ত গোবৎস সকলকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন।

একসময়ে গোপবালকদের গোবৎস সকলের কথা মনে পড়ল। তারা তাদের প্রিয় গোবৎসসকলকে দেখতে না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের এক হাতে দইভাতের গ্রাস ধারণ করেছিলেন। ভক্তগণকে অভয়প্রদানকারী শ্রীভগবান তখন সখাদের বললেন— 'তোরা খাওয়া বন্ধ করিস না। আমি দেখছি গোবৎসসকল কোথায় গেল।' তিনি অনেকক্ষণ খুঁজে তাদের না পেয়ে আবার যমুনা পুলিনে ফিরে এলেন।

সেইখানে এসে তিনি তাঁর সখাদেরও দেখতে পেলেন না। অতএব তাদের অন্বেষণে বালক শ্রীকৃষ্ণ আবার বনে বনে ঘুরতে লাগলেন। তিনি তাদের পাবেন কেমন করে ? শ্রীব্রহ্মা যে এইবার গোপবালকদেরও অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বনিয়ন্তা ও সর্বজ্ঞ হয়েও নরদেহে বাল্যলীলা করছেন, তাই তাঁর এই অন্বেষণ লীলা করতেই হল। তিনি জানেন যে এইসব শ্রীব্রহ্মার কীর্তি। তাই শ্রীব্রহ্মাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি এক অদ্ভুত লীলা সম্পাদন করলেন।

তখন তিনি বাৎসল্য প্রেমসম্পন্ন গোমাতা ও গোপিনীদের আনন্দ দানের জন্য নিজেই অবিকল সেই গোবৎস ও গোপবালক সকল রূপ ধারণ করলেন। সম সংখ্যক গোবৎস ও গোপবালক রূপ ধারণ করে বালক শ্রীকৃষ্ণ তখন তাদের সঙ্গে নিয়ে ব্রজে ফিরে এলেন। সম্পূর্ণ জগৎ যে বিষ্ণুময় ! আত্মস্বরূপ গোবৎসসকল, স্বয়ং আত্মস্বরূপ গোপবালকদের সঙ্গে নিয়ে সেইদিনকার গোচারণ সাঙ্গ করে ব্রজে তাঁর আগমন হল। গোবৎসসকল গোমাতাদের নিকটে ফিরে গেল আর তাঁর বাঁশি বেজে উঠতেই গোপিনীগণ ছুটে এসে আত্মস্বরূপ গোপবালকদের নিজ সন্তান জ্ঞানে জড়িয়ে ধরে গৃহে নিয়ে গেলেন। সবই শ্রীকৃষ্ণ ! গোবৎস, গোপবালক সবই শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজবাসীগণ বুঝতেই পারলেন না যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাদের সন্তান ও গোবৎস রূপ ধারণ করে আছেন। সন্তানদের প্রতি মাতার আকর্ষণ স্বাভাবিক। কিন্তু সেদিন তাঁদের ভালোবাসার আকর্ষণ অন্যান্য দিনের চেয়েও অনেক বেশি মনে হল। গোপিনীগণ এতদিন গোচারণে প্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণকেই প্রথমে আদর আলিঙ্গন করে পরে নিজের সন্তানদের গৃহে নিয়ে যেতেন। আজ তাঁরা প্রথমেই নিজ নিজ সন্তানকে আদর আপ্যায়ন করে ঘরে নিয়ে গেলেন। ব্রজের রমণীগণের মনে বাসনা ছিল যে বালক শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁদের গর্ভজাত সন্তান হত ! তাই তাঁদের মনোগত ইচ্ছাপূরণের জন্য তাঁর এই অদ্ভুত লীলা। শুধু গোপিনীদের নয়, গোমাতাদেরও বাসনা তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) এই লীলায় পূর্ণ হল। সখাগৃহে তাদের মাতাদের দ্বারা মর্দন, স্নান, চন্দনলেপন, সুন্দর বস্ত্রালংকার ধারণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করতে লাগলেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গোবৎস ও গোপবালক রূপ ধরে নিত্য গোচারণসহ এক বৎসর কাল এই অদ্ভুত লীলা করলেন।

এদিকে মানুষের হিসেবে প্রায় এক বৎসর কাল পরে ফিরে এসে শ্রীব্রহ্মা দেখলেন যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ববৎ গোবৎস ও গোপবালকদের নিয়ে লীলা করে চলেছেন। তিনি এও দেখলেন যে তাঁর মায়ার প্রভাবে অপহরণ করা গোবৎসসকল ও গোপবালকগণ মায়া নিদ্রায় সেইভাবেই অচেতন হয়ে রয়েছে। তিনি পড়লেন বিষম সমস্যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মায়ামুগ্ধ করতে এসে ব্রহ্মা তখন নিজেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন যে গোবৎসসকল ও গোপবালকসকল শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিতে অবস্থান করছেন। সকলেই নবনীরদ অঙ্গ শ্যামসুন্দর, পীতাম্বরধারী। সকলেই চতুর্ভুজ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী, সকলেই কুণ্ডল বনমালা পরিশোভিত। তিনি হতবাক হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলেন যে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ডান হাতে দই মাখা ভাতের গ্রাস নিয়ে মুগ্ধ বালকের মতন গোবৎস ও গোপবালকসকল অন্বেষণ করছেন। এই একই দৃশ্য তিনি এক বৎসর পূর্বেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অনুভব করে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করে তাঁর স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। কৃতকর্মের জন্য তিনি তখন লজ্জিত। তিনি ভাবছিলেন যে ব্রজের গোমাতা ও গোপিনীগণ কত সৌভাগ্যবতী যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁদের স্তন্যামৃত পরমানন্দে পান করেছেন। ব্রজবাসীগণও এই একবৎসর কাল কেটে যাওয়া বুঝতে পারেননি। সবই পূর্ববৎ হয়ে গেল। সকলে জানল যে বালক শ্রীকৃষ্ণ বনে এক প্রকাণ্ড সর্প বধ করেছেন। এক বৎসর কাল কেটে যাওয়ায় এই লীলা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ষষ্ঠবর্ষীয় বালকরূপেই সমাপন হয়েছিল। শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ করে অনুমতি নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

কালিয়দমন

পূজয়িত্বা জগন্নাথং প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্।

ততঃ প্রীতোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রম্যাভিবন্দ্য তম্॥ (১০।১৬।৬৬)

যমুনায় কালিয়নাগের এক কুণ্ড ছিল। সেই কুণ্ডের জল তার বিষের তেজে সব সময় ফুটত। বিষের প্রভাবে সেখানে উড্ডীয়মান পক্ষীসকল ঝলসে গিয়ে কুণ্ডে পড়ে যেত। চারিদিকের গাছপালা সকল শুকিয়ে গিয়েছিল। গরুড়ের অমৃতকুম্ভ থেকে এক ফোঁটা অমৃত পড়ে যাওয়ায় একটি মাত্র কদম্ব বৃক্ষ সেই কুণ্ডের তীরে অবশিষ্ট ছিল।

শ্রীভগবানের অবতাররূপে আগমন তো দুষ্টের দমনের জন্য হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন শ্রীবৃন্দাবনে লীলা করছেন। তিনি দেখলেন যে কালিয়-সর্পের বিষের প্রভাবে তাঁর অতি প্রিয় বিহার স্থান যমুনাও দূষিত হয়ে পড়েছে, তখন তিনি কোমরে পরিধেয় বস্ত্রে মালকোঁচা কষে সেই কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করে যমুনায় ঝাঁপ দিলেন। জল বিষের প্রভাবে এমনিতেই ফুটছিল আর পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঝাঁপ দিলে তা আরও উথালপাথাল হতে লাগল। তখন কালিয়দহ চারশত হস্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেল। তিনি মত্ত গজরাজসম জলে ঢেউ তুলতে লাগলেন আর তঁর বাহুর আঘাতে যমুনার জলে ভয়ানক শব্দ হতে লাগল। কালিয়নাগ সেই শব্দ শুনে ভাবল যে কেউ তার নিবাসস্থান আক্রমণ করছে। ক্রুদ্ধ হয়ে সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। সম্মুখে এসে সে দেখল যে তার সম্মুখে এক নবনীরদ শ্যামসুন্দর বালক দাঁড়িয়ে আছে, যার বক্ষঃস্থলে এক সুবর্ণ রেখাসম শ্রীবৎস চিহ্ন আর সে পীতাম্বর ধারণ করে আছে। বালক সুকুমার, সুন্দর, হাস্যমুখ ও কোমল চরণযুক্ত। নাগ যখন দেখল যে বালক নির্ভয়ে সেই বিষময় জলে আনন্দে খেলা করছে তখন সে ভয়ানক ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল। কালিয়নাগ

তখন শ্রীভগবানের মর্মস্থানে দংশন করে তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাগপাশের বন্ধন স্বীকার করে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন। সখাকে ওই অবস্থায় দেখে অন্যান্য রাখাল বালকগণ দুঃখে-ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। গোরু-বাছুরসকল শোকার্ত হয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। এদিকে ব্রজের ভূমিতে, আকাশে সর্বত্র অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দেখা যেতে লাগল। সেদিন বালক শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ছাড়াই গোচারণে গিয়েছেন শুনে নন্দবাবা আদি গোপগণ বালক শ্রীকৃষ্ণের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। অমঙ্গলসূচক চিহ্ন অবশ্য অগ্রজ শ্রীবলরামকে চিন্তিত করল না কারণ তিনি জানতেন যে তাঁর অনুজ শ্রীকৃষ্ণ অমিত শক্তিশালী। তিনি ব্রজবাসীদের কাতর হতে বারণ করলেন। এইবার সকলে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজতে বেরোলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন খুঁজে পেতে তাঁদের বেগ পেতে হল না কারণ তা যব, কমল, অঙ্কুশ আদি যুক্ত ছিল। তাঁরা যমুনা তটে গমন করলেন। যমুনা তীরে গমন করেই তাঁরা কালিয়দহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়নাগের বন্ধনে আবদ্ধ দেখলেন। তাঁরা আরও দেখলেন যে অন্যান্য গোপবালকগণ যমুনা তীরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে আর ধেনুসকল আর্তনাদ করছে। গোপগণ এই দৃশ্য দেখে ব্যাকুল হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লে নন্দবাবা তাঁর সন্তানকে কালিয়দহ থেকে উদ্ধার করবার জন্য জলে নামতে চাইলে ভগবান শ্রীবলরাম তাঁকে বুঝিয়ে এই কার্য থেকে বিরত করলেন। গোপিনীগণও অত্যধিক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

কালিয়সর্পের বন্ধন স্বীকার করে তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরলীলা করছেন। যখন তিনি দেখলেন যে তাঁর বন্ধনদশা ব্রজবাসীদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে তখন তিনি তাঁর শরীর স্ফীত করতে লাগলেন। শ্রীভগবানের দেহ স্ফীত হতেই কালিয়সর্পের দেহ টানে ছিঁড়ে যেতে লাগল। সে তখন নাগপাশ মুক্ত করে সামনে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আঘাত করতে উদ্যত হল। সর্পের মুখ দিয়ে বিষের ধারা নির্গত হতে লাগল। অতঃপর শ্রীভগবানের লীলা শুরু হল। কালিয়নাগ ফণা তুলে দংশনে উদ্যত হয়ে বালক শ্রীকৃষ্ণের চারদিকে ঘুরতে লাগল। বালক শ্রীকৃষ্ণকেও তার সঙ্গে ঘুরতে দেখা গেল।

সর্পের অগ্নি-বর্ষণকারী দৃষ্টির সঙ্গে তার লকলকে জিভ দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও নিজ বাহন গরুড়সম তাকে আঘাত করবার জন্য সচেষ্ট হতে দেখা গেল। কালিয়সর্প এইভাবে শ্রীভগবানের চারদিকে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তার বিশাল মস্তকসকল একটু চেপে দিয়ে লাফিয়ে তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। কালিয়নাগের মস্তকসমূহের উপর বহু রক্তবর্ণ মণি ছিল যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুকুমার কোমল পদতলের লালিত্যবৃদ্ধিতে সহায়ক হল। এইবার নৃত্যগীত আদি সমস্ত কলার প্রবর্তক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগের মস্তকের উপর কলানিপুণ নৃত্য করতে লাগলেন। শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্ত, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, দেবতা, চারণ ও দেবাঙ্গনাসকল যখন দেখল যে শ্রীভগবান নৃত্যরত তখন তারা অতি প্রেমবিহ্বল হয়ে মৃদঙ্গ, ঢোল, কাড়ানাকাড়া সহিত সুন্দর গীত গাইতে গাইতে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল ও তাঁর প্রীতির জন্য উপহার সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হল।

কালিয়নাগ শতমস্তক যুক্ত ছিল। যে মস্তক সে অবনত করতে চাইছিল না সেই মস্তক প্রচণ্ড দণ্ডপ্রদানকারী শ্রীভগবানের পদতল পেষণ করে দিচ্ছিল। এইভাবে কালিয়নাগের জীবনশক্তি ক্ষীণ হতে লাগল, তার মুখ ও ফণা দিয়ে প্রবলবেগে রক্তপাত হতে লাগল। অবশেষে সে ঘুরতে ঘুরতে অবসন্ন অচেতন হয়ে পড়ল। শ্রীভগবানের এই অদ্ভুত তাণ্ডবনৃত্যে কালিয়নাগের ফণাসকল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তার অঙ্গসকল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল আর তার মুখ সকল থেকে রক্তবমন হতে লাগল। তার তখন সমস্ত জগতের আদি নিয়ন্তা পুরাণপুরুষ ভগবান নারায়ণকে মনে পড়ল। সে মনে মনে তাঁর শরণাগত হল। কালিয়নাগের পত্নীগণ তাঁর এই মৃতপ্রায় অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শরণাগতবৎসল জেনে তারা তাদের অপরাধী পতিকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর শরণাগত হল। শ্রীভগবান তখন প্রসন্ন মূর্তিতে বিরাজমান। কালিয়দেহেও প্রাণস্পন্দন দেখা গেল। শ্রীভগবানকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করে কালিয় তাঁর শরণাগত হল ও তাঁর স্তব-স্তুতি করল। শ্রীভগবান তাকে ক্ষমা করলেন এক শর্তে যে সে সপরিবারে

সমুদ্রে ফিরে যাবে যাতে যমুনার জল শ্রীভগবানের ভক্তদের জন্য আবার বিষমুক্ত হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালিত হল।

আমরা দেখি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে দমন করে ছেড়ে দিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে তিনি তাকে বধ করলেন না কেন ? তিনি তাকে বধ করলে যে ভক্তের সঙ্গে যোগাযোগের পথই বন্ধ হয়ে যাবে। এই কালিয় দমনকে নিমিত্ত করে প্রকারান্তরে ভগবান আমাদের ইন্দ্রিয়সকলকে ভগবদ্মুখী করার প্রেরণা দিয়েছেন। দর্শন দ্বারা রূপ, শ্রবণ দ্বারা নাম-গুণ কীর্তন ও মহিমা, ঘ্রাণ দ্বারা চন্দন, তুলসী, অগুরু ও সুবাসিত বস্তুসকল, ত্বক দ্বারা স্পর্শানুভূতি এবং জিহ্বা দ্বারা তাঁর প্রসাদ আস্বাদন গ্রহণ হয়ে থাকে। তাহলে যদি কালিয় বধই হয়ে যায় তাহলে এই দ্বারসকল তো আর উন্মুক্ত থাকবে না। তাই প্রয়োজন এই দেখা যে এইসকল দ্বার দিয়ে অন্য সকল ক্ষতিকর বস্তু ভক্তের দেহে প্রবেশ করে তা কলুষিত না করে। তাই ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বা ইন্দ্রিয় দমনের কথা বলা হয়। ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত থাকলে আর জীবে ক্ষতিকর বস্তুসকল প্রবেশ করতে পারবে না। কালিয়র মস্তকসকল জীবের বাসনা রূপে মনে করা যেতে পারে। বাসনার আবরণ অনাবরণের জন্যই তার উপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রহার করা। আবরণ নিবারণেই তো ভক্তের পরমাত্মার স্বাদ লাভ করা সম্ভব।

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমন উপাখ্যানের মাহাত্ম্য অপরিসীম। ক্রূর সর্প কালিয়ও যাত্রাকালে জগদ্গুরু গরুড়ধ্বজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দিব্য বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, মণি, অলংকার, দিব্য গন্ধ, চন্দন এবং অতি উত্তম কমল মাল্য দ্বারা পূজার্চনা করেছিল। ইন্দ্রিয় দমনের এমনই মহিমা।

———○———

যজ্ঞপত্নী উদ্ধারণ লীলা

শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।

তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ।। (১০।২৩।১৮)

একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও অন্যান্য গোপবালকগণকে সঙ্গে নিয়ে গোচারণ করতে করতে বৃন্দাবন থেকে বহু দূরে চলে গেলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। প্রখর সূর্য আবহাওয়াকে কষ্টকর করে তুলেছে। কিন্তু গোচারণ ভূমির সন্নিকটে বৃহৎ বৃক্ষসকল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপরে ছত্ররূপে অবস্থান করছিল। বৃক্ষসমূহের ছায়াদানের কথা উল্লেখ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্তোককৃষ্ণ, অংশু, শ্রীদামা, সুবল, অর্জুন, বিশাল, ঋষভ, তেজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ আদি সখাসকলকে বললেন—'হে প্রিয় সখাসকল ! দেখ এই বৃক্ষসকল কত ভাগ্যবান ! তাদের জীবন কেবল অপরের উপকারেই নিবেদিত। তারা বায়ুর প্রহার, বর্ষা, প্রখর রৌদ্র ও হিমপাত সব কিছু নিজেরা সহ্য করে আমাদের রক্ষা করে থাকে। তাদের জীবনকে সর্বশ্রেষ্ঠ আখ্যা দেওয়া চলে। তারা সকলকে সেবা করে। কেউ তাদের কাছ থেকে রিক্তহস্তে ফিরে যায় না। ফুল, ফল, পত্র, ছায়া, কাষ্ঠ সব কিছু দান করে তারা জীবের সেবায় নিত্যযুক্ত থাকে। অন্যের জন্য ধনসম্পদ, আলোচনা-উপদেশ, সাহায্য দান যারা করে থাকে তাদের জীবনই তো সার্থক বলা যায়।'

গোচারণে বহুক্ষণ ব্যস্ত থাকায় গোপবালকগণ তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল। তারা যমুনার জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণে সমর্থ হলেও ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছিল। তখন তারা শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষুধা নিবারণের জন্য কোনো ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ করল। দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের প্রার্থনা শুনে বললেন—'হে প্রিয় সখাসকল ! এখান থেকে অল্প দূরেই বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গলাভ কামনায় আঙ্গিরস নামক যজ্ঞ

করছেন। তোমরা গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে আমার ও দাদার নাম করে অন্ন যাচনা করে নিয়ে এসো।'

গোপবালকগণ তখন সেই ব্রাহ্মণদের যজ্ঞভূমিতে গিয়ে তাঁদের দণ্ডবৎ প্রণাম করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের নাম করে অন্ন যাচনা করে বলল, আপনারা যে যজ্ঞ করছেন তাতে তো দীক্ষিত ব্যক্তিও অন্ন ধারণ করলে দোষের হয় না। আপনারা ধর্মের মর্মজ্ঞাতা। তাই শ্রদ্ধা ধারণ করে ক্ষুধিতকে অন্ন দান করুন।' শ্রীভগবানের অন্ন যাচনাও সেই ব্রাহ্মণদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হল। তাঁরা নিজেদের জ্ঞানী মনে করলেও বস্তুত জ্ঞানদৃষ্টিতে তাঁরা বালকবৎ ছিলেন। তাঁরা তখন স্বর্গলাভাদি তুচ্ছ ফল ও বিশাল কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। যে যজ্ঞে সর্বত্র শ্রীভগবান পূজিত হচ্ছেন তাতেই শ্রীভগবানকে অন্ন দান করবার কথা তাঁরা একবারও মনে করলেন না। অবশ্যই ব্রাহ্মণগণ বালকদের প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত রইলেন। তখন বালকগণ রিক্ত হস্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের কাছে ফিরে এল।

তাঁদের কথা শুনে জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন। তিনি সখাদের বোঝালেন যে এক জায়গায় বিফল হলে হাল ছেড়ে দিলে হয় না অন্য জায়গায় চেষ্টা করতে হয় ; তাতেই সাফল্য আসে। তিনি তখন তাদের বললেন— 'হে প্রিয় সখাসকল ! তোমরা এইবার ব্রাহ্মণীদের কাছে গিয়ে বলো যে রাম ও শ্যাম এসেছেন। তোমরা যত চাইবে তাঁরা সব তোমাদের দেবেন। তাঁরা আমাকে খুব ভালোবাসেন আর আমাতেই নিত্যযুক্ত থাকেন।'

তখন গোপবালকগণ ব্রাহ্মণীদের কাছে গেল। তাঁরা সকলে উত্তম বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিতা হয়ে বসেছিলেন। বালকগণ ব্রাহ্মণীদের প্রণাম নিবেদন করে বিনম্রভাবে বলল— 'আপনাদের প্রণাম। দয়া করে আমাদের কথা শুনুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখান থেকে অল্প দূরে উপস্থিত হয়েছেন। তিনিই আমাদের আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমরা সকলে গোচারণ করতে করতে এইদিকে বৃন্দাবন থেকে বহুদূরে এসে গিয়েছি এবং অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছি। আপনারা আমাদের ক্ষুধা নিবারণে কিছু আহার্য দিন।'

ব্রাহ্মণীগণ বহুদিন থেকে শ্রীভগবানের মনোরম লীলাসমূহ শুনছিলেন। তাঁরা তাই নিত্যযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভের কামনায় তাঁরা উন্মুখ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাঁদের অতি নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছেন জেনে তাঁরা তাঁদের দর্শনের জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। অতি সুমধুর আহার্য বস্তুসকল সঙ্গে নিয়ে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাওয়ার জন্য তাঁরা তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন। আত্মীয়স্বজন, স্বামী-পুত্রের বাধাও উপেক্ষিত হল। ব্রাহ্মণীগণ যমুনা তীরে অশোক বনে গোপবালক পরিবৃত অবস্থায় শ্রীবলরামসহ শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন। তাঁরা তখন প্রান্তরে বেড়াচ্ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নবনীরদকান্তি শ্যামসুন্দর অঙ্গে কৌষেয় বস্ত্র জ্যোতির্ময় ছিল। তাঁর কণ্ঠে বনমালা ছিল, মস্তকে ছিল ময়ূরমুকুট। তাঁর তখন গৈরিকাদি ধাতু ও নবপল্লব শোভিত নটবর বেশ। তিনি পার্শ্বস্থিত এক সখার স্কন্ধে হাত রেখে অন্য হাতে নীলকমল ধরে ছিলেন। তাঁর কর্ণে ছিল উৎপল, কপালে অলকাবলি ও বদনকমলে মৃদুহাস্য। ব্রাহ্মণীগণ এতদিন পর্যন্ত প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের গুণ ও লীলা শ্রবণ করে তাঁকে মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। এখন তাঁকে দর্শন পথে অবলোকন করে মনে মনে তাঁকেই আলিঙ্গন করলেন।

ভগবান সকলের অন্তরের কথা জানেন। তিনি জানতেন যে ব্রাহ্মণীগণ সকল বাধা উপেক্ষা করে তাঁকে দর্শন করবার জন্য তাঁর কাছে এসেছেন। তিনি সহাস্য বদনে ব্রাহ্মণীগণকে বললেন— 'হে মহাভাগ্যবতীগণ ! এসো উপবেশন করো। তোমরা প্রেমময়ী ! তাই আমাকে দর্শন করবার অভিলাষে এসেছ। যারা আমার প্রতি প্রকৃত প্রেম ধারণ করে তাদের কামনা থাকে না আর তাদের মধ্যে ব্যবধান, সঙ্কোচ, দ্বৈত বোধও থাকে না। প্রাণ, বুদ্ধি, মন, শরীর, স্বজন, স্ত্রী, পুত্র ও ধনসম্পদ যে জন্য প্রিয় বোধ হয় সেই আত্মা, পরমাত্মা ও আমার থেকে প্রিয় আর কী হতে পারে ? আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো। দর্শন লাভ তো হয়েছে। এখন প্রত্যাগমন করে নিজ পতিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করো। তোমাদের ছাড়া ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ সমাপন করতে পারবেন না।'

ব্রাহ্মণীগণ উত্তর দিলেন— 'হে অন্তর্যামী শ্যামসুন্দর ! এ কেমন নিষ্ঠুর ব্যক্তির মতন কথা বলছেন। আমরা তো শুনেছি যে একবার ভগবান লাভ হলে সংসারে আর ফিরে যেতে হয় না। সকলের বাধা উপেক্ষা করে আমরা আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনি আমাদের আশ্রয় দিন। যাঁদের ছেড়ে এসেছি তাঁরা তো আমাদের পুনরায় গ্রহণ করবেন না। আপনার শরণে এসে আবার কার শরণে যাব ?'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'হে দেবীসকল ! ফিরে যাও, কেউ তোমাদের তিরস্কার করবে না। সকলেই তোমাদের সম্মানের চোখে দেখবে। তোমরা তো আমার হয়েই গিয়েছ আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে গিয়েছ। মন আমাতে যুক্ত রাখলে তোমরা অতি শীঘ্র আমাকে লাভ করবে।'

ব্রাহ্মণীগণ যজ্ঞশালায় ফিরে গেলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁদের কোনোরকম তিরস্কার করলেন না। তাঁরা পত্নীদের সঙ্গে মিলিতভাবে যজ্ঞ সমাপন করলেন। এক ব্রাহ্মণী, পতি বলপূর্বক বাধা দেওয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে পারেনি। সে যজ্ঞশালাতেই শ্রীভগবানের স্বরূপ ধ্যান করে মনে মনে শ্রীভগবানকে আলিঙ্গন দান করে কর্ম নির্মিত দেহ ত্যাগ করেছিল আর দিব্য শরীরে শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণকে ব্রাহ্মণীগণের আনা উত্তম আহার্য দ্বারা তৃপ্ত করলেন ও স্বয়ংও তা গ্রহণ করলেন।

ব্রাহ্মণগণ জানলেন যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের আদেশ অমান্য করে তাঁরা বুঝলেন যে তাঁদের অপরাধ হয়েছে। ব্রাহ্মণীগণের হৃদয়ে শ্রীভগবানের অলৌকিক প্রেম দেখে তাঁরা প্রীত হলেন। মর্মাহত হলেন তাঁদের দর্শন লাভ না হওয়ার জন্য। কংসের ভয়ে তাঁদের দর্শন লাভের ইচ্ছা অপূর্ণই রয়ে গেল।

———o———

গিরিধারী

ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্ধনাচলম্।

দধার লীলয়া কৃষ্ণশ্ছত্রাকমিব বালকঃ॥ (১০।২৫।১৯)

শ্রীভগবানের বৃন্দাবন লীলার সময়ের এক ঘটনা। বিশাল উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখে বালক পিতা নন্দবাবার কাছে জিজ্ঞাসা করে বললেন—'বাবা ! কোন্ উৎসবের প্রস্তুতি চলছে ? উৎসব লৌকিক না শাস্ত্রসম্মত ?' পিতা উত্তর দিলেন—'বাবা ! ভগবান ইন্দ্র বর্ষণকারী মেঘের প্রভু। এই মেঘ তাঁরই এক রূপ। মেঘই সর্ব প্রাণীকুলের পরিতৃপ্তি প্রদানকারী ও জলরূপ জীবনদানকারী। আমরা মেঘপতি ভগবান ইন্দ্রের যজ্ঞদ্বারা পূজা করে থাকি।'

ভগবান কেশব তখন ইন্দ্রকে ক্রোধান্বিত করবার জন্য পিতা নন্দবাবাকে বললেন—'বাবা ! প্রাণীগণ তো কর্মাধীন। কর্মানুসারেই সুখ-দুঃখ, ভয়, মঙ্গল আদি হয়ে থাকে। সকলেই কর্মফল ভোগ করছে তাহলে ইন্দ্রের প্রয়োজন কোথায় বল। বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্মপালনেই তো কর্মানুষ্ঠান সম্ভব। বৈশ্যদের বৃত্তি হল কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা আর ব্যবসা। আমরা তার মধ্যে কেবল গোপালনই করে থাকি। এই জগতেরই উৎপত্তি তো রজোগুণের জন্যই। সেই রজোগুণের প্রভাবে মেঘসকল জলবর্ষণ করে থাকে। তাতে ইন্দ্রের করণীয় কী আছে ?

বাবা ! আমাদের রাজত্বও নেই আর বড় বড় নগরও নেই। গ্রাম, ঘর বাড়িও নেই। আমরা তো নিত্য অরণ্যবাসী ; বন ও পাহাড়ই আমাদের বাসস্থান। তাই আমরা এই ধেনু, ব্রাহ্মণ ও গিরিগোবর্ধনের পূজা করি। এই পূজায় আমরা ইন্দ্রযজ্ঞ নিমিত্ত আয়োজন করা দ্রব্যাদিই ব্যবহার করব। আমি তো এই ভালো মনে করি, এইবার তোমাদের যেমন অভিরুচি তেমনই করো।'

নন্দবাবা ও উপস্থিত ব্রজবাসীদের কাছে বালকের যুক্তি খণ্ডন করবার যুক্তি ছিল না। তাই সকলেই ইন্দ্রপূজা না করে বালক শ্রীকৃষ্ণের কথা মেনে নিলেন। ব্রাহ্মণদের মন্ত্রোচ্চারণ করে যজ্ঞারম্ভ হল। আয়োজন করা সামগ্রী দ্বারা গিরিগোবর্ধন ও ব্রাহ্মণদের পূজার্চনা করা হল আর উত্তমরূপে সেবা করে গোপূজা করা হল। অতঃপর নন্দবাবাজি এবং গোপগণ ধেনুকে অনুসরণ করে গিরিগোবর্ধন প্রদক্ষিণ করলেন। একসময়ে গোপদের প্রত্যয় রক্ষণ হেতু শ্রীভগবান কেশব, গিরিগোবর্ধনের উপর এক বিশাল বিগ্রহরূপে দর্শন দিলেন। বালক কেশব অন্যান্য ব্রজবাসীদের সঙ্গে সেই বিরাট রূপকে প্রণাম নিবেদন করে বললেন—'তোমরা দেখো ! গিরিগোবর্ধন স্বয়ং দর্শন দিয়ে আমাদের উপর কৃপা করেছেন। তিনি যেমন ইচ্ছে রূপ ধারণ করতে সমর্থ। বনবাসী জীবসকল তাঁকে অবজ্ঞা করলে তিনি তাদের শাস্তি বিধান করেন। এসো, আমাদের ধেনুকুল ও আমাদের নিজেদের কল্যাণ কামনায় তাঁকে প্রণাম করি।' পূজার্চনা উত্তমরূপে করে সকলে ব্রজে ফিরে এলেন। অতএব ইন্দ্রপূজা না হয়ে গিরিগোবর্ধন পূজা শুরু হয়ে গেল।

যখন দেবরাজ ইন্দ্র জানতে পারলেন যে তাঁর পূজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তিনি নন্দবাবা আদি গোপদের উপর কুপিত হলেন। ইন্দ্র অত্যন্ত অহংকারী ছিলেন ; তিনি নিজেকে ত্রিলোকেশ্বর মনে করতেন। তিনি ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রলয়কালীন সাংবর্তক নামক মেঘদের ব্রজের উপর আক্রমণ করবার আদেশ দিয়ে বললেন—'আরে ! এই বন্য গোপালকদের এত অহংকার ! মনে হচ্ছে এদের অর্থের অহংকার হয়েছে। সাধারণ মানুষ কৃষ্ণের ভরসায় গোপগণ আমাকে অপমান করেছে ! কৃষ্ণ নিজেকে অতিজ্ঞানী মনে করে। সে স্বয়ংই তো মৃত্যুর গ্রাস মাত্র।' তাদের অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দাও। আমি তোমাদের পেছনেই ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ করে মহাপরাক্রমশালী মরুৎদের সঙ্গে যাচ্ছি।'

ইন্দ্রের আদেশ মতন প্রলয়কালীন মেঘসকল প্রবল বেগে নন্দবাবার ব্রজের উপর আক্রমণ করল আর মুষলধারে বৃষ্টিপাত করে সমগ্র ব্রজভূমিকে পীড়িত করতে লাগল। প্রচণ্ড বজ্রপাত হতে লাগল আর ঝড়ের সঙ্গে বড় বড়

শিলাখণ্ড পড়তে লাগল। এইভাবে প্রবল বৃষ্টিপাতে ব্রজভূমির সর্বত্র জলে ভরে গেল। যখন এইরূপ মুষলধারে বৃষ্টিপাতে ও ঝড়ের দাপটে ব্রজভূমির মানুষ ও পশুসকল অতি ব্যাকুল হয়ে পড়ল তখন তারা রক্ষার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হল।

শ্রীভগবান দেখলেন যে শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ের দাপটে সকলেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে। তিনি বুঝলেন যে ইন্দ্রই যজ্ঞ বন্ধ করবার জন্য অসময়ে এই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির কারণ। তিনি নিজ যোগমায়া দ্বারা এর প্রত্যুত্তর দেবেন ঠিক করলেন কারণ সত্ত্বপ্রধান দেবতাগণের ঐশ্বর্য ও পদাভিমান হওয়া কখনই শোভা পায় না। ব্রজ তাঁর আশ্রিত তাই তার রক্ষা তাঁর কর্তব্যবিশেষ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াচ্ছলে অনায়াসে গিরিগোবর্ধনকে ছাতার মতন তুলে ধরে গোপদের বললেন— 'হে পিতা ! হে মাতা ! হে ব্রজবাসীগণ ! তোমরা ধেনুসকল ও অন্যান্য সম্পদসকল সঙ্গে নিয়ে এই পর্বতের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি ধরে থাকলে পর্বতের নীচে চাপা পড়বার ভয় নেই। এই ঝড়বৃষ্টি থেকে তোমাদের রক্ষা করবার জন্যই আমি এই ব্যবস্থা করেছি।' সকলেই গিরিগোবর্ধনের গহ্বরে আশ্রয় নিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধা তৃষ্ণাদি অগ্রাহ্য করে সাতদিন সেই গিরিগোবর্ধনকে ধারণ করে রইলেন। বাম হস্তে গিরিরাজকে ধারণ করে তিনি 'গিরিধারী' নামে পরিচিত হলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার এই প্রভাব দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিজ সংকল্প সফল না হওয়ায় তাঁর প্রলয়কালীন মেঘদের বিরত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। যখন আকাশের মেঘ সরে গিয়ে সূর্যালোক দেখা দিল তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় গোপদের বললেন—এখন সকলে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে এসো। দেখো বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে আর নদীর জলও কমে গেছে। সকলে বেরিয়ে এলে তিনি গিরিগোবর্ধনকে স্বস্থানে সংস্থাপন করলেন। অলৌকিক ঘটনায় রক্ষা পাওয়ায় সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছুটে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন ; মাতৃস্থানীয়া গোপিনীগণ স্নেহ ও

আনন্দ আতিশয্যে তার কপালে দধি, চাল, জল আদির মঙ্গলসূচক তিলক দিলেন আর প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। স্বর্গের দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। সকলেই শ্রীভগবানের গোবর্ধন ধারণ লীলা প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এইভাবে নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজ দোষ শোধন করে নিলেন।

শ্রীভগবানের এই গিরিগোবর্ধন ধারণকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। শ্রীভগবান অমিত পরাক্রমশালী তাতে সন্দেহ কোথায় ? তিনি চাইলে সব কিছুই করতে পারেন। বর্ষার সময়ে মেঘে ভরা আকাশে সমুদ্রের জলের বাষ্পীভূত হওয়ার কোনো উপায় না থাকলেও তিনি ক্রমাগত বৃষ্টিপাত করতে পারেন। বিশেষ জ্ঞান বিজ্ঞান আজ জানে যে প্রতি অণু-পরমাণুতে শক্তির উৎস বর্তমান। অনেকে এই গিরিগোবর্ধন ধারণকে সাংকেতিক আখ্যা দিয়ে বলেন যে তিনি যে শরণাগতবৎসল তারই প্রমাণ পাওয়া যায় এই ঘটনায়। শরণাগত হলে তিনি যে ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে আসবেন এ কথা নিশ্চিত। তা না হলে স্তম্ভের ভিতর থেকে শ্রীভগবানের নৃসিংহদেব রূপে আবির্ভাব, ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করবার জন্য হয় কেমন করে ? ঘটনা বিবরণ যাই হোক আসল শিক্ষা এই যে তাঁর শরণাগত হয়ে থাকতে হবে। তাই তো তিনি বলেছেন '**মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যাসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।**' অর্থাৎ 'তুমি আমাতে চিত্ত স্থির করো। আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও ও আমাতে মনোনিবেশ করো। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এইজন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এইরূপেই তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে।' আর যদি পূজার্চনা করতেই হয় তাহলে 'বহুরূপে সম্মুখে' যিনি অবস্থান করছেন, তাঁর পূজা করাই ভালো।

———○———

কালযবন ও মুচকুন্দ

শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ কৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্।
পৃথুদীর্ঘচতুর্বাহুং নবকঞ্জারুণেক্ষণম্॥ (১০।৫১।২)

কংস বধের সঙ্গে সঙ্গে কংসের শ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শত্রুতার সূচনা আপনাআপনিই হয়ে গেল। পৃথিবীতে তাই যদুবংশ নিশ্চিহ্ন করবার বাসনায় জরাসন্ধ তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে মথুরা আক্রমণ করল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম নিজ নিজ আয়ুধে সজ্জিত হয়ে রথে আরোহণ করে জরাসন্ধের সৈন্যকে প্রতিহত করলেন। অতি ভয়ানক যুদ্ধ হল। শ্রীবলরাম বরুণ অস্ত্রদ্বারা জরাসন্ধকে বেঁধে ফেললেন। এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজকে জরাসন্ধকে বধ করতে নিষেধ করলেন কারণ জরাসন্ধ জীবিত না থাকলে কে তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্য বারে বারে জোগাড় করে আনবে ! ভূভার হরণের এই নিখুঁত পরিকল্পনা কেবল শ্রীভগবানের পক্ষেই করা সম্ভব। মগধরাজ জরাসন্ধ এর পরে সতেরো বার মথুরা আক্রমণ করেছিল আর প্রতিবারই তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে এসেছিল। জরাসন্ধ প্রতিবারই পরাজিত হয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সৈন্য প্রতিবারই পর্যুদস্ত হয়ে ভূভার হরণের কার্য সমাধা করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অর্জিত ধনসম্পদ ও আভরণ সকল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের রাজা উগ্রসেনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

যখন জরাসন্ধ পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি করছিল তখন দেবর্ষি নারদ প্রেরিত কালযবন তিন কোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য নিয়ে মথুরা অবরোধ করল। কালযবন নিজেকে অজেয় বলে মনে করত। কালযবনের বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ শ্রীবলরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন—‘আজ কালযবন মথুরা অবরোধ করেছে ; জরাসন্ধও কয়েকদিনের মধ্যেই মথুরার উপর

ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমরা কালযবনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকলে সেই সময় জরাসন্ধ আক্রমণ করে আমাদের আত্মীয়স্বজনদের বধ করবে অথবা বন্দী করে নিয়ে যাবে। তাই মানুষের পক্ষে অতি দুর্গম এক দুর্গ তৈরি করে আজই আত্মীয়স্বজনদের সেইখানে সুরক্ষিত রেখে তারপর এই কালযবনকে বধ করাই ঠিক হবে।'

এইরূপ পরামর্শ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্র অভ্যন্তরে এমন এক দুর্গম দুর্গ প্রস্তুত করালেন যাতে সকল বস্তুই অদ্ভুত ছিল। নগর নির্মাণের প্রতি পদক্ষেপে বিশ্বকর্মার বিজ্ঞান (বাস্তুবিজ্ঞান) ও শিল্পকলার নৈপুণ্য স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। সেই নগরের কেন্দ্রস্থলে যদুবংশীয় প্রধান শ্রীউগ্রসেন, শ্রীবসুদেব, শ্রীবলরাম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহল দেদীপ্যমান ছিল। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ আত্মীয়স্বজন সকলকে নিজ অচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়ার দ্বারা সেই দ্বারকায় পৌঁছে দিলেন। অবশিষ্ট প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি শ্রীবলরামকে মথুরাপুরীতে রেখে দিলেন আর স্বয়ং কালযবনকে বধ করবার জন্য একাকী অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই মথুরার সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুখ্যদ্বার দিয়ে বাইরে এলেন তখন মনে হচ্ছিল যেন পূর্বগগনে চন্দ্রোদয় হচ্ছে। নবনীরদকান্তি শ্যামসুন্দর তখন কৌষেয় পীতাম্বর ধারণ করে ছিলেন ; তাঁর বক্ষঃস্থলে ছিল কাঞ্চনরেখারূপে শ্রীবৎস চিহ্ন আর গলদেশে ছিল কৌস্তুভমণি। তিনি তখন চতুর্ভুজ ; বাহুসকল আজানুলম্বিত ও সুডৌল। নয়নযুগল ছিল নব প্রস্ফুটিত কমলসম কোমল ও অরুণাভাযুক্ত। কপোলে অনুপম সৌন্দর্য ছিল। মুখে ছিল চিত্তহরণকারী মৃদুমন্দ হাসি। কর্ণযুগল মকরকুণ্ডলে আলোকিত ছিল। গলায় ছিল বনমালার সৌন্দর্য।

কালযবন এই অসামান্য রূপধারী পুরুষকে দেখে বুঝতে পারল যে এই সেই পুরুষ বাসুদেব ; কারণ দেবর্ষি নারদ বর্ণিত লক্ষণসকল মিলে যাচ্ছিল। যখন সে শ্রীভগবানকে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই দেখল তখন সে তাঁর সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই যুদ্ধ করবার জন্য ছুটে গেল। কালযবন আশ্চর্য হয়ে গেল এই দেখে

যে শ্রীভগবান তাকে দেখে উল্টো দিকে পলায়ন করছেন। রণছোড় শ্রীভগবান পলায়ন করতে লাগলেন আর সেই যোগীদুর্লভ প্রভুকে ধরবার জন্য কালযবন তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল। রণছোড় শ্রীভগবান লীলাভিনয় করে পলায়ন করছিলেন আর কালযবন তাঁকে ধরবার জন্য অনুসরণ করছিল। প্রতি পদক্ষেপেই তিনি কালযবনের নাগালের মধ্যে এলেন এইরূপ অভিনয় করতে করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে দূরবর্তী এক পর্বত গুহায় নিয়ে গেলেন। পথে কালযবনের তিরস্কার শোনা যাচ্ছিল —'তুমি পরম যশস্বী যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছ। তোমার পলায়ন করা উচিত নয়।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে পর্বতের গুহায় প্রবেশ করে গেলেন।

কালযবন সেই অন্ধকার গুহায় ঢুকে দেখল যে একজন শয়ন করে আছে। সে ভাবল—'দেখ! আমাকে এতদূর ছুটিয়ে নিয়ে এল আর এখন সাধু সেজে শুয়ে আছে!' এই ভেবে সে শ্রীকৃষ্ণ মনে করে শায়িত ব্যক্তিকে পদাঘাত করল। সেই ব্যক্তি সেই স্থানে বহুদিন নিদ্রাগমন করছিল। পদাঘাতে সেই সুপ্ত পুরুষ উঠে দাঁড়াল আর ধীরে ধীরে তার চোখ খুলল। ইতস্তত দেখে সে কালযবনকে সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকতে দেখল। সেই ব্যক্তি পদাঘাতে রুষ্ট হয়ে ছিল। তার দৃষ্টি কালযবনের উপর পড়তেই কালযবন তৎক্ষণাৎ ভস্মে পরিণত হল।

নিদ্রিত ব্যক্তির নাম রাজা মুচকুন্দ ; তিনি ইক্ষ্বাকুবংশের মহারাজা মান্ধাতার পুত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সংগ্রামজয়ী ও মহাপুরুষ। একবার ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অসুরদের ভয়ে ভীত হয়ে নিজ রক্ষা হেতু রাজা মুচকুন্দকে সেই কার্য করতে অনুরোধ করেছিলেন। রাজা মুচকুন্দ সেই কার্য বহুদিন পর্যন্ত করেছিলেন। অতঃপর দেবসেনাপতিরূপে কার্তিকেয়কে লাভ করে দেবতাগণ রাজা মুচকুন্দকে বলেন—'আপনি আমাদের রক্ষা করবার জন্য জীবনের সব কিছু ত্যাগ করেছেন। আপনার কালের এখন আর কেউ জীবিত নেই। আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন।' রাজা মুচকুন্দ উত্তর

দিয়েছিলেন—'আমি বড় পরিশ্রান্ত। আমার দীর্ঘ নিদ্রা প্রয়োজন। আমাকে দীর্ঘ সুনিদ্রা দিন।' দেবতাগণ বলেছিলেন—'তাই হবে । নিদ্রাকালে কোনো মূর্খ আপনাকে জাগিয়ে তুললে আপনার দৃষ্টিপাতেই সে ভস্ম হয়ে যাবে।'

কালযবন ভস্ম হয়ে গেলে যদুবংশশিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম বুদ্ধিমান রাজা মুচকুন্দকে দর্শন দিলেন। রাজা মুচকুন্দ অতি বুদ্ধিমান ও বীর ছিলেন। তবুও শ্রীভগবানের সেই জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখে তিনি হতচকিত হয়ে গেলেন। শ্রীভগবান তাঁকে বললেন—'ধর্মের রক্ষা ও ভূভারস্বরূপ অসুরনিধনের জন্য আমার আগমন। আমি শ্রীবসুদেবনন্দন বাসুদেব।' রাজা মুচকুন্দের বৃদ্ধগর্গের কথা মনে পড়ল—'যদুবংশে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হবেন।' এখন তিনি জানলেন যে তাঁর সম্মুখে স্বয়ং ভগবান নারায়ণের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। শ্রীভগবান তাঁকে বললেন—'হে সার্বভৌম মহারাজ ! তুমি বর চাও না জানলাম। তুমি অতি পবিত্র চিত্ত ও উচ্চকোটির ব্যক্তিত্ব। তুমি মন প্রাণ আমাতে সমর্পণ করে স্বচ্ছন্দভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করো। তোমার বিষয়বাসনারহিত নির্মল ভক্তি নিত্য থাকবে। তুমি ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে শিকার করবার সময়ে বহু পশুবধ করেছ । এখন একাগ্রচিত্ত হয়ে আমার উপাসনা করে তপস্যা দ্বারা সেই পাপ থেকে মুক্তি লাভ করো। পরের জন্মে তুমি ব্রাহ্মণ হবে ও সমস্ত প্রাণীর প্রকৃত হিতৈষী পরম সুহৃদ হবে আর তখন আমার বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন পরমাত্মাকে লাভ করবে।' মহারাজ মুচকুন্দ তপস্যা, শ্রদ্ধা, ধৈর্য ও অনাসক্তিযুক্ত ও সংশয় ও সন্দেহ মুক্ত ছিলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একাগ্রচিত্ত হয়ে গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন। অতঃপর তিনি ভগবান নর-নারায়ণের নিত্য নিবাসস্থান বদরিকাশ্রম গমন করে অতি শান্তভাবে শীতগ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করে তপস্যা দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন।

এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরীতে ফিরে এলেন। তখনও কালযবনের ম্লেচ্ছ সৈন্য মথুরাপুরী ঘিরে রেখেছিল। তিনি তাদের সংহার করে তাদের সম্পদ হরণ করে দ্বারকাপুরী চললেন। পথে আবার তাঁদের

জরাসন্ধের তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে প্রতিহত করতে হল। এইবার শ্রীভগবানের এক অদ্ভুত নরলীলা দেখা গেল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম আচমকা ছুটে পালাতে লাগলেন। তাঁরা এমন ভাব করতে লাগলেন যেন খুব ভয় পেয়েছেন। জরাসন্ধ তাঁদের তাড়া করে হাসতে লাগল ; জরাসন্ধের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের ঐশ্বর্য, প্রভাব প্রকৃত আদির জ্ঞান ছিল না। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে তাঁরা প্রবর্ষণ পর্বতে আরোহণ করে রইলেন। জরাসন্ধের সৈন্য তাঁদের খুঁজে বার করতে ব্যর্থ হয়ে দগ্ধ করে বধ করবার চেষ্টা করল। পর্বতের পাদদেশে অগ্নি দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সকলের অলক্ষ্যে অগ্নি পার করে দ্বারকাপুরী ফিরে এলেন। জরাসন্ধ ধরে নিল যে তাঁরা অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন আর সে মগধে প্রত্যাগমন করল।

শ্রীভগবানের নরলীলা বুঝতে পারা ভাগ্যের কথা ; এই সকল বোঝবার জন্যও তাঁর কৃপা দরকার হয়। তাঁর অদ্ভুত পরিকল্পনা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। এ যেন সেই শ্রীভগবানের অর্জুনকে দেওয়া উপদেশের অন্য এক উদাহরণ— 'আমি এই বীরদের পূর্বেই বধ করে রেখেছি, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।' নরলীলায় তিনি দেখাচ্ছেন যে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আসলে তিনি ছুটিয়ে কালযবনকে সেই গুহায় নিয়ে গেলেন যেখানে তার মৃত্যু মুচকুন্দরূপে শায়িত রয়েছেন। এইরূপ লীলাভিনয় কেবল তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব !

———○———

রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন

দেবকী বসুদেবশ্চ কৃষ্ণরামৌ তথা স্ত্রিয়ঃ।

দম্পতী তৌ পরিষ্বজ্য রুক্মিণী চ যয়ুর্মুদম্॥ (১০।৫৫।৩৮)

কামদেব ভগবান বাসুদেবেরই অংশ ছিলেন। তিনি পূর্বে রুদ্র ভগবানের ক্রোধাগ্নি দ্বারা ভস্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শরীর ধারণ নিমিত্ত নিজ অংশ ভগবান বাসুদেবেরই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সেই কামদেবই এইবার শ্রীরুক্মিণীর গর্ভে আবির্ভূত হলেন ; আর প্রদ্যুম্ন নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সৌন্দর্য, বীর্য, সৌশীল্য আদি সদ্‌গুণে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না।

শম্বরাসুর রুক্মিণী তনয়ের কথা জানতে পেরে তাকে তার শত্রুজ্ঞানে সূতিকাগার থেকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। ছদ্মবেশে যখন শম্বরাসুর এই শিশুকে হরণ করেছিল তখন তার বয়ঃক্রম দশ দিনও হয়নি। সে শিশুকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল। সমুদ্রে শিশুকে এক বৃহৎ মৎস্য গিলে ফেলেছিল। তদনন্তর সেই বিশাল মৎস্য জেলেদের জালে ধরা পড়ে অন্য মৎস্যের সঙ্গে। জেলে শম্বরাসুরকে প্রসন্ন করবার জন্য সেই বিশাল মৎস্য তাকে উপহার দেয়। শম্বরাসুরের পাচক সেই অদ্ভুত মৎস্যকে রন্ধনশালায় নিয়ে এসে ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে তার উদরে সেই সুন্দর শিশুকে দেখতে পায়। পাচক তখন শিশুটিকে শম্বরাসুরের দাসী মায়াবতীকে পালনের জন্য সমর্পণ করে। শিশুকে দর্শন করেই দাসী মায়াবতীর মন শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তখন দেবর্ষি নারদ তার কাছে এসে জানাল শিশু আসলে কামদেব স্বয়ং। তার শ্রীকৃষ্ণভার্যা রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করা ও বৃহৎ মৎস্যের উদরে গমন করা আদি সকল বৃত্তান্তও বর্ণনা করেন।

মায়াবতী কামদেবের যশস্বিনী পত্নী রতিই ছিলেন। যে দিন ভগবান

শংকরের ক্রোধাগ্নিতে কামদেবের দেহ ভস্মীভূত হয়েছিল সেই দিন থেকেই কামদেবের আবার দেহ ধারণের প্রতীক্ষায় রতির দিন কাটছিল। সেই রতিকে শম্বরাসুর দাসীরূপে নিযুক্ত করে রেখেছিল। মায়াবতী নামধারী রতি যখন থেকে জানলেন যে শিশু আসলে তাঁর পতি কামদেবই তখন থেকে তার প্রতি তাঁর প্রেম বর্ষিত হতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণকুমার ভগবান প্রদ্যুম্ন ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করলেন। তাঁর রূপ লাবণ্য এত অদ্ভুত ছিল যে রমণীদের মধ্যে তাঁকে দেখেই শৃঙ্গার রসোদ্দীপন হত। প্রদ্যুম্ন কমলদলসম কোমল ও বিশাল নয়নযুক্ত, আজানুলম্বিত বাহুযুক্ত আর মানবলোকে পরম সুন্দর দেহযুক্ত হয়েছিলেন। রতি তাঁকে কামদেবরূপে দর্শন করে সলজ্জ হাস্য, কটাক্ষপাত আদি প্রেমভাব প্রদর্শন করে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতে থাকলেন। শ্রীকৃষ্ণনন্দন ভগবান প্রদ্যুম্ন তাঁর ভাবে পরিবর্তন লক্ষ করে বললেন—'দেবী ! তুমি আমার মাতৃসমা। এ কেমন বিপরীত বুদ্ধি ? আমি দেখছি তুমি মাতৃভাব ত্যাগ করে কামিনীভাব প্রদর্শন করছ !'

রতি বললেন—'প্রভু ! আপনি স্বয়ং ভগবান নারায়ণনন্দন। শম্বরাসুর আপনাকে সূতিকাগার থেকে চুরি করে এখানে এনেছিল। আপনি আমার স্বামী স্বয়ং কামদেব আর আমি আপনার পত্নী রতি।' রতি তখন প্রদ্যুম্নকে দেবর্ষি নারদ বর্ণিত সকল বৃত্তান্ত বললেন আর জানালেন কেমন করে তিনি তাঁকে আবার লাভ করেছেন। রতি আরও জানালেন যে শম্বরাসুর শত শত মায়া জানে আর তাকে বশীভূত করা অথবা পরাজিত করা কঠিন কার্য। মায়াবতী রতি এরপর পরম শক্তিশালী প্রদ্যুম্নকে মহামায়া বিদ্যা শিক্ষা দেন যার দ্বারা সমস্ত মায়া বিনাশ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

এইবার শ্রীপ্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরের কাছে গিয়ে তাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে থাকলে শম্বরাসুর ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে গেল। সে নিজ গদা ঊর্ধ্বে ঘুরিয়ে শ্রীপ্রদ্যুম্নকে আঘাত করল আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাতসম কর্কশ সিংহনাদ করল। গদাঘাত গদা দ্বারাই প্রতিহত হল। শ্রীপ্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরের উপর গদাঘাত করাতে সেই দৈত্য মায়াসুর কথিত আসুরিক মায়া আশ্রয় করে আকাশে চলে গেল আর সেইখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল। তখন

শ্রীপ্রদ্যুম্ন সত্ত্বময় মহাবিদ্যা প্রয়োগ করলেন। অতঃপর শম্বরাসুর যক্ষ, গন্ধর্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসদের শত শত মায়া প্রয়োগ করল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন নিজ মহাবিদ্যা দ্বারা সব নিষ্ক্রিয় করে দিলেন। অতঃপর এক সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে তিনি শম্বরাসুরের কিরীট, কুণ্ডল সুশোভিত মস্তক ভূলুণ্ঠিত করে দিলেন। দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

অতঃপর মায়াবতী রতি আকাশ পথে নিজ পতি শ্রীপ্রদ্যুম্নকে নিয়ে দ্বারকাপুরী উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আকাশ পথে শ্যামবর্ণ শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও গৌরবর্ণা পত্নীকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন মেঘলোকে বিদ্যুন্মালা শোভায়মান রয়েছে। অতঃপর যখন তাঁদের দ্বারকাপুরীর অন্দরমহলে প্রবেশ হল তখন শ্রীপ্রদ্যুম্নকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনে করে রমণীগণ লুকিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা জানতে পারলেন যে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন। এমন সময়ে সেইখানে শ্রীরুক্মিণীর আগমন হল। এই নবীন দম্পতি দেখে তাঁর নিজ হারানো পুত্রের কথা মনে পড়ল। তাদের উপর তাঁর স্নেহ বর্ষণ হতে লাগল। শ্রীরুক্মিণীর বাম অঙ্গে শুভানুভূতি সংকেত হতে লাগল। এমন সময় ঘটনাস্থলে পবিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ জনক-জননী দেবকী-শ্রীবসুদেবের সঙ্গে এলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব কথাই জানতেন কিন্তু তিনি মৌন রইলেন। এইবার ঘটনাস্থলে দেবর্ষি নারদের আগমন হল। তিনি সকলকে সমস্ত ঘটনা বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। মাতা পুত্রের মিলনে সকলেই আনন্দময় হয়ে গেলেন।

শ্রীনারদ বিবৃত ঘটনা শুনে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সকলেই নবদম্পতিকে আলিঙ্গন দান করে আনন্দ করতে লাগলেন। সকলেই দিব্য আনন্দে মত্ত হয়ে গেলেন।

——o——

রুক্মীবধ

তস্মিন্নভ্যুদয়ে রাজন্ রুক্মিণী রামকেশবৌ।

পুরং ভোজকটং জগ্মুঃ সাম্বপ্রদ্যুম্নকাদয়ঃ॥ (১০।৬১।২৬)

রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নের বিবাহ ভোজকট নগর নিবাসী রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীর সঙ্গেও হয়েছিল। রুক্মীর সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক আদৌ ভালো ছিল না। অতএব তাঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হওয়া এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। রুক্মবতীর স্বয়ংবর সভায় প্রদ্যুম্ন উপস্থিত ছিলেন। পরম সৌন্দর্যসম্পন্ন প্রদ্যুম্নকে দেখে মনে হত যেন স্বয়ং কামদেব দাঁড়িয়ে আছেন। রুক্মবতী স্বয়ংবর সভাতেই তাঁর সৌন্দর্য ও গুণে মোহিত হয়ে তাঁর গলাতেই মাল্যদান করেছিলেন। প্রদ্যুম্ন মহাবীর ছিলেন। তিনি একলাই স্বয়ংবর সভাতে উপস্থিত রাজাদের পরাজিত করেছিলেন।

যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা অপমানিত হওয়ায় রুক্মীর হৃদয়ের ক্রোধাগ্নি তখনও অশান্ত সেইসঙ্গে তার শ্রীভগবানের সঙ্গে শত্রুতা ছিল তবুও সে ভগিনী রুক্মিণীর প্রসন্নতার হেতু নিজ ভাগিনেয় প্রদ্যুম্নকে কন্যাদান করেছিল। অতঃপর সেই ভগিনীকেই প্রসন্ন করবার জন্য রুক্মী নিজ পৌত্রী রোচনার বিবাহ রুক্মিণীর পৌত্র আর তার নিজ দৌহিত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে দিয়েছিল। রুক্মী জানত যে এইরূপ বিবাহ সম্বন্ধ ধর্মানুকূল নয় তবুও স্নেহ বন্ধনে বদ্ধ হয়ে সে এইরূপ করেছিল।

অনিরুদ্ধর বিবাহানুষ্ঠানে সম্মিলিত হওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, রুক্মিণী, প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব আদি দ্বারকাবাসীর ভোজকট নগরে আগমন হয়েছিল। যখন বিবাহানুষ্ঠান শেষ হল তখন কলিঙ্গরাজ আদি অহংকারী রাজাগণ রুক্মীকে বলল—'তুমি পাশা খেলায় শ্রীবলরামকে আহ্বান করো এবং পরাজিত করো। শ্রীবলরাম পাশায় তত অভ্যস্ত নন কিন্তু তাঁর

খেলার আগ্রহ প্রবল।' তাদের প্ররোচনায় রুক্মী শ্রীবলরামকে পাশা খেলতে আমন্ত্রণ জানাল আর স্বয়ং তাঁর সঙ্গে পাশা খেলতে বসল। শ্রীবলরাম প্রথমে শত, পরে সহস্র ও দশ সহস্র মোহর বাজি রেখে রুক্মীর কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন। রুক্মীর জয় হলে কলিঙ্গরাজ শ্রীবলরামকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতে লাগল আর উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগল। শ্রীবলরাম তাতে কুপিত হলেন।

অতঃপর রুক্মী এক লক্ষ মোহর বাজি ধরল। এই দান শ্রীবলরাম জিতলেন। কিন্তু রুক্মী ধূর্ততা সহকারে এইকথা বলতে লাগল যে জয় তারই হয়েছে। এইবার শ্রীবলরাম অতীব ক্রোধান্বিত হয়ে গেলেন। তাঁর হৃদয়ে অসন্তোষ ভয়ানক আকার ধারণ করল। শ্রীবলরাম এইবার ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে দশ কোটি মোহর বাজি ধরলেন। এইবারও দ্যূতক্রীড়া নিয়মানুসার জয় শ্রীবলরামের হল। কিছু কপটতা আশ্রয় করে রুক্মী বলল—'আমি জিতেছি। এই দ্যূতক্রীড়ায় বিশেষজ্ঞ কলিঙ্গরাজ আদি সভাসদ এর বিচার করবেন।' হঠাৎ আকাশবাণী হল—'যদি ধর্মানুসার খেলা হয় তাহলে এই বাজি শ্রীবলরাম জিতেছেন। রুক্মীর কথা সঠিক নয়।'

রুক্মীর শিয়রে মৃত্যু অপেক্ষা করছিল। সে আকাশবাণীকে অগ্রাহ্য করল আর শ্রীবলরামের উপর তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে বলে বসল—'ওহে শ্রীবলরাম ! আপনারা তো বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ে গোচারণ করতেই অভ্যস্ত। পাশা ক্রীড়া আপনি জানবেন কেমন করে ? এই দ্যূতক্রীড়া রাজাদের পক্ষেই শোভা পায় আপনার মতন গোয়ালাদের নয়।' রুক্মীর কথায় ও তার সঙ্গী রাজাদের ব্যঙ্গবিদ্রুপে শ্রীবলরাম এইবার ভয়ানক মূর্তি ধারণ করলেন। তিনি মুদ্গার তুলে নিলেন আর সেই মাঙ্গলিক সভাতেই রুক্মীকে বধ করলেন। ঘটনা দেখে যে কলিঙ্গরাজ এতক্ষণ অট্টহাস্য করছিল সে পলায়ন করতে লাগল। সে দশ পা মাত্র গিয়েছিল কিন্তু শ্রীবলরাম তাকে ধরে ফেললেন ও রাগে তার দন্তরাজি উৎপাটন করে দিলেন। অন্যান্য রুক্মীর অনুগত রাজারাও শ্রীবলরামের কোপ থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না। শ্রীবলরামের মুদগর আঘাতে কেউ ভগ্নবাহু, কেউ ভগ্নজঙ্ঘা আর কেউ ভগ্ন মস্তক হয়ে পলায়ন করল।

রুক্মীবধ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিছুই বললেন না। প্রসঙ্গ সমর্থন করলে রুক্মিণী অসন্তুষ্ট হবেন আর না করলে অগ্রজ শ্রীবলরাম রুষ্ট হবেন। তিনি ভক্তদের এই শিক্ষা দিলেন যে যদি মৌন থাকা কল্যাণকর হয় তাই করা বিধেয়। অনিরুদ্ধ বিবাহ ও শত্রুনাশ যুগল কর্ম সমাপন করে সকলেই নববধূ রোচনাকে নিয়ে দ্বারকাপুরীতে প্রত্যাগমন করলেন।

—o—
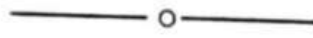
উষা-অনিরুদ্ধ মিলন

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গূঢ়ং ব্রহ্মণি বাঙ্‌ময়ে।

য়ং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলম্‌॥ (১০।৬৩।৩৪)

বাণরাজ-কন্যা উষা স্বপ্নে এক অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষের উষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করে তাকে লাভ করবার কামনায় মত্ত হয়ে গিয়েছিল। স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ ছিলেন শ্রীঅনিরুদ্ধ যিনি কামাবতার শ্রীপ্রদ্যুম্নের সন্তান। পুত্র পিতার অসামান্য রূপের অধিকারী ছিলেন। শ্রীপ্রদ্যুম্নকে দেখে অনেকেই তাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে ভুল করতেন। এমন রূপে আকৃষ্ট হওয়া বাণরাজকন্যার পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা বলাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আশ্চর্য সেইখানেই যে, সেই রূপবান পুরুষকে উষা পূর্বে কখনো দেখেইনি।

বাণরাজ ভক্ত প্রহ্লাদের বংশধর তাই তাঁর উপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা নিত্য বিদ্যমান। বাণাসুর মহাত্মা বলির পুত্র যাঁকে শ্রীভগবান বামনাবতার রূপে উদ্ধার করেছিলেন। শোণিতপুর শাসনকালে বাণাসুর উদার ও বুদ্ধিমান বলে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। দেবাদিদেব মহাদেবের অনন্য ভক্ত বাণাসুর তার সহস্র হস্তে মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য কালে বাদ্য বাজিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করেছিল। ভগবান শংকর পরম ভক্তবৎসল ও শরণাগতরক্ষক। তিনি বাণাসুরকে বর প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। বাণাসুর বর প্রার্থনা করেছিলেন স্বয়ং শংকরকেই তার নগররক্ষকরূপে থাকার জন্য। দেবাদিদেব তাও স্বীকার করে নিজেকে বাণাসুরের নগররক্ষকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন।

উষাকে বিষণ্ন ও অন্যমনস্ক দেখে বাণরাজার মন্ত্রীতনয়া চিত্রলেখা কারণ জানতে চাইল। সখীর কাছে মনের ব্যথা উজাড় করে দিয়ে উষার মন হালকা হল। সে চিত্রলেখাকে সাহস করে সব কথা বলল। চিত্রলেখা সখীকে সান্ত্বনা

দিয়ে বলল— 'যদি তোমার প্রাণবল্লভ ত্রিভুবনে বর্তমান থাকেন আর তুমি তাকে চিনতে সমর্থ হও তবে আমি তোমার বিরহ বেদনা অবশ্যই শান্ত করে দেব।' চিত্রলেখা অঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। সে বলল—'সখী ! আমি চিত্র অঙ্কন করে তোমাকে দেখাচ্ছি। তার মধ্যে তোমার প্রাণবল্লভকে চিনিয়ে দাও। চিনতে পারলে সে যেখানেই থাক আমি এনে দেব তোমার কাছে।' এই বলে চিত্রলেখা বহু দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ ও মানুষের চিত্র অঙ্কন করল। মানুষের মধ্যে সে প্রথমে বৃষ্ণিবংশের শ্রীবসুদেবের পিতা, স্বয়ং শ্রীবসুদেব, শ্রীবলরাম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিত্র অঙ্কন করল। শ্রীপ্রদ্যুম্নের চিত্র দেখেই উষা লজ্জিত হল। যখন সে শ্রীঅনিরুদ্ধের চিত্র দেখল তখন লজ্জায় তার মাথা নিচু হয়ে গেল। অতঃপর সে মুচকি হেসে জানাল যে ইনিই তার প্রাণবল্লভ।

চিত্রলেখা যোগবিদ্যাও জানত। সে সেই রাত্রেই আকাশ পথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হয়ে শ্রীঅনিরুদ্ধকে এক সুন্দর পালঙ্কে শায়িত অবস্থায় দেখল। চিত্রলেখা যোগসিদ্ধির প্রভাবে শ্রীঅনিরুদ্ধকে স্থানান্তরিত করে শোণিতপুর নিয়ে চলে এল আর তাঁকে সখী উষার কাছে এনে দিল। প্রাণবল্লভকে কাছে পেয়ে বাণরাজকন্যা উষা আনন্দ আতিশয্যে কমলসম প্রস্ফুটিত হয়ে গেল। সে নিজ প্রাণবল্লভের সঙ্গে তার মহলেই বিচরণ করতে লাগল আর তাঁকে প্রেমে বশীভূত করে ফেলল। সুরক্ষিত অন্তঃপুরের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ ছিল না। কাল আপন গতিতে এগিয়ে চলল। শ্রীঅনিরুদ্ধ প্রিয়তমার প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে সব কিছু ভুলে গেলেন। তিনি দ্বারকাপুরীর বাইরে কতদিন কাটাচ্ছেন তার হিসেব রাখতে সক্ষম হলেন না।

এমন সময়ে উষা সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ায় প্রহরায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে তা বাণাসুরের কানে পৌঁছতে সময় লাগল না। পুরুষ প্রবেশ অসম্ভব, এমন অন্তঃপুরে এমন ঘটনা সত্য কিনা দেখবার জন্য বাণাসুর স্বয়ং কন্যার মহলে ছুটে এল। সেইখানে এসে সে আশ্চর্য হয়ে গেল এই দেখে যে এক পুরুষ তার কন্যা উষার সঙ্গে অক্ষ ক্রীড়া করছে। অপরিচিত রাজপুত্রের এ

হেন আচরণ বাণাসুরের পক্ষে সহ্য করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সে সৈন্যদের আদেশ দিল আক্রমণ করবার জন্য। শ্রীঅনিরুদ্ধ দেখলেন যে প্রতিরোধ অতি আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তাই তিনি এক পরিঘ দ্বারা সৈন্যদের বাধা দিলেন। তাঁর আক্রমণে সৈন্যদল ভগ্নমস্তক, ভগ্নবাহু, ভগ্নজঙ্ঘা হয়ে সেই স্থান থেকে পলায়ন করল। এইবার বাণাসুর স্বয়ং শ্রীঅনিরুদ্ধকে নাগপাশে আবদ্ধ করল। প্রাণবল্লভকে বন্দী অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে প্রিয়তমা উষা শোকে বিহ্বল হয়ে অশ্রুমোচন করতে লাগল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে শ্রীঅনিরুদ্ধের বাণাসুর কর্তৃক বন্দী হওয়ার ঘটনা জানলেন। শ্রীঅনিরুদ্ধ বর্ষার চার মাস নিরুদ্দেশ ছিলেন। তাঁর জন্য দ্বারকাপুরীতে সকলেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। যখন যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, শ্রীপ্রদ্যুম্ন আদি সকলেই বারো অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে বাণাসুরের রাজধানী শোণিতপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁদের সৈন্যবাহিনী শোণিতপুরকে ঘিরে ফেলল। দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং নিজবরে শোণিতপুর রক্ষণে নিযুক্ত। অতএব প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হল। যাদব সৈন্য সকলকে পরাস্ত করতে সক্ষম হলেও ভগবান শংকরকে পরাজিত করা অসম্ভব হয়ে উঠল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তখন শূলপাণির সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। চক্রপাণি ও শূলপাণির যুদ্ধ এক বিরল ঘটনা। ব্রহ্মাস্ত্র নিষ্ক্রিয় করতে ব্রহ্মাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র নিষ্ক্রিয় করতে পার্বতাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র নিষ্ক্রিয় করতে পর্জন্যাস্ত্র ও পাশুপাতাস্ত্র নিষ্ক্রিয় করতে নারায়ণাস্ত্র পর্যন্ত ব্যবহার করা হল। অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জৃম্ভনাস্ত্র প্রয়োগে মহাদেবের হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্য রেহাই পাওয়া গেল।

এতক্ষণ বাণাসুর সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। যখন সে দেখল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সৈন্যবাহিনীকে তছনছ করে দিচ্ছেন তখন সে নিজেই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য এগিয়ে এল। রণোন্মত্ত বাণাসুর সহস্র হস্তে পাঁচশত ধনুকে দুটি করে শর লাগিয়ে শরবর্ষণ করতে লাগল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক সঙ্গে তার সমস্ত ধনুক ছেদন করে দিলেন ও তার সারথি, রথ ও অশ্বসকল বধ করলেন। বাণাসুর অন্য এক রথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হলে

চক্রপাণি সুদর্শন চক্র ধারণ করলেন ও তার দ্বারা বাণাসুরের হস্তসকল ছেদন করতে লাগলেন। যখন মাত্র চারটি হস্ত অবশিষ্ট তখন ভগবান শংকর আবার ছুটে এসে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন।

তিনি ভগবান চক্রপাণিকে বললেন—'ভগবন্ ! এই বাণাসুর আমার প্রিয়, কৃপাপ্রাপ্ত ও সেবক। আমি তাকে অভয় দান করেছি। এ আপনার কৃপাপ্রাপ্ত প্রহ্লাদের বংশধর। আপনি এর উপর কৃপা করুন।'

ভগবান চক্রপাণি উত্তর দিলেন—'ভগবন্ ! হে মহাদেব ! আমি বাণাসুরকে বধ কখনই করব না কারণ আমি প্রহ্লাদকে তার বংশ রক্ষার কথা বলেছি। আমি তো আপনার কথা রাখবার জন্য বাণাসুরকে তার সমকক্ষ বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সুযোগ দিয়েছি। আশাকরি তার সাধ পূরণ হয়েছে। আমি তাকে অভয় দান করলাম।'

অহংকারে মত্ত অবস্থায় বলা কথা বাণাসুরের মনে পড়ে গেল ; তাই তো সে দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে চেয়েছিল। আর মহাদেব বলেছিলেন যে তার সাধ একদিন পূরণ হবে। সে তখন এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। অতঃপর সে শ্রীঅনিরুদ্ধ ও কন্যা উষাকে রথে আরোহণ করিয়ে শ্রীভগবানের নিকটে নিয়ে এল।

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের সম্মতি নিয়ে বস্ত্রালংকার বিভূষিতা উষা ও শ্রীঅনিরুদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সম্মুখে রেখে দ্বারকা প্রস্থান করলেন। দ্বারকায় তাঁদের শুভাগমন সংবাদ পূর্বে দেওয়া হয়েছিল। শ্রীঅনিরুদ্ধ ও উষা নববরবধূরূপে দ্বারকায় প্রবেশ করলে পরিবেশ আনন্দময় হয়ে উঠল।

———o———

নৃগরাজ উপাখ্যান

দেবদেব জগন্নাথ গোবিন্দ পুরুষোত্তম।

নারায়ণ হৃষীকেশ পুণ্যশ্লোকাচ্যুতাব্যয়॥ (১০।৬৪।২৭)

দানবীরদের মধ্যে অগ্রগণ্য রাজা নৃগ মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্র ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে রাজা নৃগ কর্তৃক দান করা ধেনুর সংখ্যা পৃথিবীর ধূলিকণা, আকাশের নক্ষত্র ও বর্ষার ধারার সমতুল্য ছিল। সৎ উপায়ে অর্জিত ধনসম্পদ দ্বারা তিনি তাঁর রাজত্বকালে এই দান করেছিলেন। দান করা ধেনুসকল দুগ্ধবতী, তরুণ, সহজ স্বভাব, সুন্দরদর্শন, সুলক্ষণা ও কপিলা সবৎসা হত। ধেনু সকলকে দানের পূর্বে সুবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ ও রৌপ্যমণ্ডিত খুরযুক্ত করে বস্ত্রালংকার ও মাল্য বিভূষিতা করা হত। কেবল সেই সকল ব্রাহ্মণসন্তান দান গ্রহণের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতেন যাঁরা যুবাবস্থায়ই প্রতিষ্ঠিত, সদ্গুণসম্পন্ন, ক্লেশযুক্ত পরিজন সহায়ক, দম্ভরহিত তপস্বী, বেদ পাঠে নিত্যযুক্ত, শিষ্যদের নিত্য বিদ্যাদানে সচেষ্ট ও সচ্চরিত্র। দানের পূর্বে ব্রাহ্মণদেরও বস্ত্রাভূষণে অলংকৃত করা হত। তিনি ধেনু ছাড়া ভূমি, সুবর্ণ, বাসগৃহ, অশ্ব, হস্তী, দাসীসহিত কন্যা, পর্বতসম তিল, রৌপ্য, শয্যা, বস্ত্র, রত্ন, গৃহসামগ্রী, রথ আদিও প্রভূত দান করেছিলেন আর জনগণের কল্যাণে বহু যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন ও কূপ পুষ্করাদিও খনন করিয়ে দিয়েছিলেন।

এমন দানবীরের জীবনেও কিঞ্চিত অসতর্কতা হেতু দান করা দ্রব্যের জন্য বিষম ধর্মসংকট নেমে এসেছিল। কোনো এক অপ্রতিগ্রাহী তপস্বী ব্রাহ্মণের ধেনু দলছুট হয়ে নৃগরাজার ধেনুসকলের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। ঘটনা তাঁর অজ্ঞাতে ঘটেছিল। সেই ধেনু উত্তমরূপে সজ্জিতা হয়ে নৃগ রাজা কর্তৃক এক অন্য ব্রাহ্মণকে দান করা হয়ে যায়। দানগ্রহণ করে প্রসন্ন চিত্তে

যখন ব্রাহ্মণ ধেনুসহ পথে যাচ্ছিলেন তখন ধেনুর প্রকৃত প্রভু ধেনুকে চিহ্নিত করে তা তাঁর ধেনু বলে দাবি করেন। ঘটনা দানগ্রাহী ব্রাহ্মণকে সমস্যায় ফেলে। তিনি যেহেতু সেই ধেনু রাজা নৃগ কর্তৃক কৃত দানরূপে লাভ করেছিলেন, তাই ধেনু তাঁর নিজের বলে বলেন। প্রসঙ্গ ক্রমশ জটিল হয়ে যায় যখন দুইজনেই সেই ধেনুর দাবি ছাড়তে অস্বীকার করেন।

কলহে লিপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণদ্বয় ধেনুসহ রাজা নৃগের কাছে বিচারের জন্য উপস্থিত হন। প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ বললেন—'রাজা নৃগ আমাকে ধেনু দান করেছেন তাই ধেনুর অধিকার আমার।' প্রকৃত স্বামী বললেন—'তাই যদি হয় তা হলে রাজা নৃগ আমার ধেনু অপহরণ করেছেন।' তাঁদের বক্তব্য রাজা নৃগকে বিপদে ফেলল। তিনি ধর্মসংকটের মুখে দাঁড়িয়ে দুইজনের কাছেই দাবি ত্যাগ করবার জন্য অনুনয়-বিনয় করলেন। তিনি এও বললেন যে যিনি দাবি ত্যাগ করবেন তাঁকে এক লক্ষ ধেনু দান করবেন। তিনি আরও বললেন যে অজান্তে কৃত অপরাধের জন্য তাঁরা কৃপা করুন আর অশুচি নরকে পতিত হতে যাতে না হয় তাই করুন। প্রকৃত প্রভু অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বলে গেলেন যে এর বদলে অন্য কিছু নেওয়া সম্ভব নয়। এই বলে তিনি স্থান ত্যাগ করলেন। প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ বললেন যে এই ধেনুর পরিবর্তে এক লক্ষ উৎকৃষ্ট ধেনু কেন আরও দশ সহস্র গাভীও চাই না। তিনিও এই বলে স্থান ত্যাগ করলেন।

কালের নিয়মে যথাকালে রাজা নৃগের আয়ুঃশেষ হল আর যমদূতগণ তাঁকে যমালয়ে নিয়ে গেল। যমরাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন— 'কী আগে ভোগ করতে চান ? শুভকর্মফল না অশুভ কর্মফল ? আপনার দানকর্মের উপার্জিত দীপ্তিমান লোকের অন্ত দেখা যাচ্ছে না।' রাজা নৃগ বললেন—'হে যমরাজ ! আমি আগে অশুভ কর্মফল ভোগ করতে চাই।' যমরাজ 'তাই হোক' বলবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা নৃগ এক গিরগিটিরূপে এক কূপে পতিত হলেন।

রাজা নৃগকে কূপমধ্যে গিরগিটিরূপে যদুবংশীয় রাজকুমারগণ প্রথম দেখেন। রাজকুমার সাম্ব, প্রদ্যুম্ন আদি সকলে চিত্তবিনোদন নিমিত্ত উপবনে

গমন করেছিলেন আর তৃষ্ণার্ত হয়ে কূপ সন্নিকটে এসেছিলেন। সেই প্রাণীকে উদ্ধার করতে অসমর্থ হয়ে তাঁর পিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই সংবাদ দেন ও রাজা নৃগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হন। অতঃপর সেই গিরগিটি শ্রীভগবানের স্পর্শ লাভ করে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ এক স্বর্গীয় দেবমূর্তিতে পরিবর্তিত হয়ে যান। তাঁর অঙ্গে অদ্ভুত বস্ত্রালংকার ও পুষ্পমাল্য শোভায়মান ছিল। সর্বজ্ঞ শ্রীভগবান সবই জানতেন তবুও সর্বসাধারণের কল্যাণে তাঁর কাছ থেকেই পূর্ণ বিবরণ পেলেন। রাজা নৃগের পাপকর্মফল ভোগ হয়ে গিয়েছিল। তিনি সচ্চিদানন্দ সর্বান্তর্যামী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্তবস্তুতি করে প্রণাম নিবেদন করলেন ও উত্তম বিমানে আরোহণ করে চলে গেলেন।

নৃগরাজ উপাখ্যান দানীকে আরও সতর্ক হতে বলে। ব্রাহ্মণদের দান করবার সময়ে আরও সাবধান হওয়া প্রয়োজন কারণ ব্রাহ্মণের ধন হলাহল থেকেও মারাত্মক। হলাহল বিষের চিকিৎসা হওয়া সম্ভব কিন্তু ব্রাহ্মণের ধন অপহরণের কোনো চিকিৎসা হয় না। অগ্নি নির্বাপণ জলদ্বারা সম্ভব হয় কিন্তু ব্রাহ্মণের ধনরূপ অরণি থেকে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় তা সমস্ত কুলকে সমূলে উৎপাটিত করে। এই পরম সত্য শ্রীভগবান স্বয়ং সমর্থন করেন।

———o———

সংকর্ষণের শিক্ষাদান

নমস্তে সর্বভূতাত্মন্ সর্বশক্তিধরাব্যয়।
বিশ্বকর্মন্ নমস্তেঽস্তু ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ॥ (১০।৬৮।৪৮)

দুর্যোধন কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ংবর সভায় একটি বিশেষ ঘটনা কৌরবদের ক্রোধের কারণ হল। জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব বড় বড় যোদ্ধাদের পরাজিত করে লক্ষ্মণাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন। কৌরবগণ এই ঘটনাকে স্পর্ধা আখ্যা দিয়ে যাদবদের উচিত শিক্ষা দেবেন ঠিক করে বললেন— 'যাদবরা অসন্তুষ্ট হলে তারা আমাদের কী করবে ? আমাদের দান করা ধনধান্যে পরিপূর্ণ মেদিনী ভোগ করছে আর আমাদেরই ক্ষতি করছে।' অতএব সাম্বকে ধরে আনবার জন্য কর্ণ, শল্য, ভূরিশ্রবা, যজ্ঞকেতু ও দুর্যোধনাদি বীরগণ একসঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করলেন। এই যুদ্ধযাত্রায় প্রবীণদেরও সম্মতি ছিল।

মহাবীর সাম্ব দেখলেন যে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছেন, তিনি তাঁর ধনুর্বাণ নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। কৌরব সৈন্যকে পরিচালনে স্বয়ং কর্ণ উপস্থিত। সাম্ব একলাই ছয় কৌরব বীরদের উপর এক সঙ্গে ছয়টি করে শর নিক্ষেপ করে কৌরবদের প্রশংসা অর্জন করলেন। চারটি শর চার অশ্বের উপর, একটি শর সারথির উপর আর শেষ শর মহান বীরদের উপর একসঙ্গে বর্ষিত হয়েছিল। এদিকে কৌরব পক্ষের ছয় বীর সাম্বকে একসঙ্গে আক্রমণ করে তাঁকে রথহীন করে দিলেন। সাম্বের চার অশ্ব, সারথিকে একযোগে আক্রমণ করে এবং ধনুক ছেদন করে, কৌরবগণ সাম্বকে বন্দী করে ফেললেন। অতঃপর বন্দী সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে নিয়ে কৌরবগণ মহানন্দে হস্তিনাপুর ফিরে এলেন। বিজয়োৎসব হতে লাগল হস্তিনাপুরে।

ঘটনা বিবরণ যদুবংশীয়দের গোচরে আসতে তাঁরা কৌরবদের উপর অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। সম্পূর্ণ বিবরণ দেবর্ষি নারদের কাছে পেয়ে যাদবগণ

মহারাজ উগ্রসেনের অনুমতি নিয়ে কৌরবদের উপর আক্রমণ করবার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। কলহপ্রধান কলিযুগে শ্রীবলরাম পাপ-তাপ নিবারকরূপে পরিচিত। তিনি কৌরবদের সঙ্গে যাদবদের কলহকে পছন্দ করছিলেন না। যদিও যাদবগণ যুদ্ধযাত্রায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি তাঁদের কোনো রকমে শান্ত করলেন আর স্বয়ং সূর্যসম জ্যোতির্ময় রথে আরোহণ করে হস্তিনাপুর গমন করলেন। তিনি সঙ্গে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও যদুবংশীয় প্রবীণ ব্যক্তিগণকে নিয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে ভগবান শ্রীবলরামকে গ্রহ পরিবৃত চন্দ্রদেব মনে হচ্ছিল। হস্তিনাপুর উপনীত হয়ে শ্রীবলরাম নগরের উপকণ্ঠে এক উপবনে বাস করতে থাকলেন। কৌরবদের মতিগতি জানবার উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীউদ্ধবকে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করলেন।

শ্রীউদ্ধব কৌরবদের সভায় গমন করে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মপিতামহ, দ্রোণাচার্য, বাহ্লীক এবং দুর্যোধনের যথাযথ বন্দনা অভ্যর্থনা করলেন ও শ্রীবলরামের আগমনের সূচনা দিলেন। পরম হিতৈষী এবং প্রিয়তম শ্রীবলরামের আগমনের সংবাদ অগবত হয়ে কৌরবগণ অতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁরা শ্রীউদ্ধবের বিধিপূর্বক সৎকার করে হস্তে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি ধারণ করে শ্রীবলরামকে অভ্যর্থনা করতে গেলেন। অতঃপর অবস্থা ও সম্বন্ধ বিচার করে তাঁকে গোদান ও অর্ঘ্য প্রদানও করলেন। যারা শ্রীবলরামের প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন তাঁরা মস্তক অবনত করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। কুশল বিনিময়ান্তে শ্রীবলরাম অতি ধীর ও গম্ভীর স্বরে কৌরবদের উপদেশ দিলেন।

শ্রীবলরাম বললেন—'সর্বসমর্থ রাজাধিরাজ মহারাজ উগ্রসেন এক আদেশ দিয়েছেন। তোমরা সকলে তা একাগ্রচিত্তে সাবধানে শোনো আর তা অবিলম্বে পালন করো। তিনি বলেছেন— 'আমরা জানি যে তোমরা অধর্ম পথে কয়েকজন একসঙ্গে মিলে ধর্মাত্মা সাম্বকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করে রেখেছ। আমরা সম্বন্ধ অটুট রাখবার জন্য তোমাদের এই কার্যের প্রতিবাদ করিনি।'

এই আদেশে স্পষ্টভাবেই নির্দেশ আছে যে সাম্ব ও নববধূকে প্রত্যর্পণ

করে কৌরবগণ যেন সুসম্বন্ধ বজায় রাখে। শ্রীবলরামের কথার মধ্যে শৌর্যবীর্য ও তাঁর শক্তির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। তাঁর কথা শুনে কৌরবগণ যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

তাঁরা বলতে লাগলেন—'এ এক আচ্ছা আবদার ! এদের হল কী ? পাদুকা মস্তকে উঠতে চায় যে ! এই যাদবদের সঙ্গে আমাদের কোনো এক সময়ে বৈবাহিক সম্বন্ধ হয়েছিল তাতে তারা জাতে উঠে আমাদের সঙ্গে এক সারিতে বসে খেতে শুরু করে। আমরাই এদের রাজসিংহাসন দিয়ে রাজা করে আমাদের সমপর্যায়ভুক্ত করেছিলাম। এই যদুবংশীয়গণ চামর, ব্যজন, শঙ্খ, শ্বেতছত্র, মুকুট, রাজসিংহাসন ও রাজোচিত শয্যা ব্যবহার করে, কারণ আমরা তা জেনেশুনে সহ্য করে গিয়েছি। যথেষ্ট হয়েছে। যদুবংশীয়দের আর রাজোচিত বৈভব থাকবার প্রয়োজন নেই ; তা ব্যবহারের অধিকার তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া উচিত। রাজোচিত চিহ্নসকল দিয়ে আমরাই সর্পকে দুগ্ধ পান করিয়েছিলাম। সিংহের গ্রাস ভেড়া নিতে চায় ! ভীম, দ্রোণ, অর্জুন আদি কৌরবগণ না চাইলে ইন্দ্রেরও কোনো বস্তু উপভোগ করবার ক্ষমতা নেই।'

কৌরবগণ কৌলিন্য, বাহুবল ও ধনসম্পদের অহংকারে মত্ত ছিলেন। তাঁরা শ্রীবলরামের প্রতি সাধারণ ভদ্রতাও প্রদর্শন না করে এইসকল কটু কথা বলে হস্তিনাপুর ফিরে গেলেন। ঘটনায় ভগবান শ্রীবলরাম ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলেন। তিনি হেসে উঠে বললেন— 'মদমত্তকে পথে আনবার জন্য দণ্ডের প্রয়োজন হয়। সকলে যুদ্ধের প্রস্তুতি করছিল আমি তাদের শান্ত করে শান্তি কামনায় এইস্থানে এলাম আর তার ফল এই হল। এদের কলহ যদি পছন্দ হয় তাই হোক। ত্রিলোকের স্বামী ইন্দ্রাদি লোকপাল যাঁর আদেশ পালন করেন সেই উগ্রসেন নাকি রাজাধিরাজ নন—কেবল ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় যাদবদের রাজা ! যিনি সুধর্মাসভাকে অধিকার করে তাতে নিবাস করেন আর দেবতাদের পারিজাত বৃক্ষ তুলে নিয়ে এসে তা উপভোগ করেন সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও রাজসিংহাসনের অধিকারী নন ! সমগ্র জগৎ সেবিত ভগবতী লক্ষ্মী স্বয়ং যাঁর শ্রীপাদপদ্ম সেবা করেন সেই লক্ষ্মীপতি

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাকি ছত্র, চামর আদি রাজোচিত চিহ্ন ব্যবহারের উপযুক্ত নন ! আমরা পাদুকা আর তারা মস্তক ! এদের শাস্তি দিতেই হবে। এই সকল বাক্যবাণ ব্যবহারের মাসুল তাদের গুণতেই হবে। পৃথিবী থেকে কৌরব নামই মুছে দেব।'

প্রবল ক্রোধে রক্তবর্ণ ভগবান শ্রীবলরাম এইবার নিজের লাঙল তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি লাঙলের সুতীক্ষ্ণ অগ্র দিয়ে বারে বারে আঘাত করে হস্তিনাপুরকে উপড়ে ফেললেন আর তা নিমজ্জিত করে দেওয়ার জন্য গঙ্গার দিকে টানতে লাগলেন।

হলাকর্ষণে হস্তিনাপুর এমনভাবে কাঁপতে শুরু করল যেন তা জলে ভাসছে। যখন কৌরবগণ দেখলেন যে নগর গঙ্গায় পড়ে যাচ্ছে তখন তারা ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁরা সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে নিয়ে সকলে সেই সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীবলরামের শরণাগত হয়ে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন— 'হে লোকাভিরাম শ্রীবলরাম ! আপনি জগতের আধার স্বয়ং অনন্তনাগ। আমরা আপনার প্রভাব বিস্মৃত হয়েছিলাম। আমরা মূঢ়মতি। আমাদের বুদ্ধিবিভ্রম হয়েছিল। আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ। আপনি সহস্রশীর্ষ, অনায়াসে পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করে থাকেন। আপনি অনন্ত। প্রলয়কালে জগৎকে নিজের মধ্যে লীন করে নিয়ে এক অদ্বিতীয়রূপে শয়ন করে থাকেন। হে ভগবান ! আপনি জগতের স্থিতি ও পালন হেতু বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ ধারণ করে আছেন। আপনার এই ক্রোধ প্রদর্শন বিদ্বেষ অথবা ঈর্ষাবশত নয়। তা জগৎকে শিক্ষাদান হেতু। হে সর্বশক্তিধারক অবিনাশী শ্রীভগবান ! আমরা আপনার শরণাগত হলাম। আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। হে বিশ্বসৃষ্টিকর্তা ! আমরা আপনাকে বার বার প্রণাম জানাই। আপনি কৃপা করে আমাদের রক্ষা করুন।'

কৌরবদের নগর টলমল করছিল। তারা ভয়ানক শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সমগ্র কৌরবকুল ভগবান শ্রীবলরামের শরণাগত হয়ে তাঁর স্তবস্তুতি করতে থাকলে শ্রীবলরাম তৎক্ষণাৎ ক্রোধ ত্যাগ করলেন। অতঃপর তিনি প্রসন্ন হয়ে তাঁদের অভয় প্রদান করলেন। লক্ষ্মণা দুর্যোধনের অতি প্রিয় কন্যা ছিল।

তাই কন্যার বিবাহ উপলক্ষে প্রচুর যৌতুক, রথ ও দাসীও দান করা হল। যদুবংশ শিরোমণি ভগবান শ্রীবলরাম পাত্রপক্ষরূপে যৌতুক গ্রহণ করলেন ও নবদম্পতি সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে সঙ্গে করে দ্বারকা যাত্রা করলেন। দ্বারকায় সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি কৌরবদের ব্যবহারের কথা সকলকে জানালেন। কৌরবদের শিক্ষালাভ ঘটনা সকলকে প্রীত করল।

শ্রীবলরামের পরাক্রমের সাক্ষীরূপে হস্তিনাপুর এখনও দক্ষিণদিকে উচ্চ ও গঙ্গার দিকে অবনমিত। সংকর্ষণ ভগবান এইভাবেই প্রিয় কৌরবদের শিক্ষাদান করেছিলেন।

———o———

বহুরূপে সম্মুখে তোমার

ব্রহ্মন্ ধর্মস্য বক্তাহং কর্তা তদনুমোদিতা।

তচ্ছিক্ষয়ঁল্লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদঃ॥ (১০।৬৯।৪০)

যখন দেবর্ষি নারদ শুনলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরাকসুরকে (ভৌমাসুরকে) বধ করে স্বয়ং ষোড়শ সহস্র রাজকন্যাদের উদ্ধার করে তাঁদের একই লগ্নে পৃথক পৃথক গৃহে বিবাহ করেছেন তখন তাঁর শ্রীভগবানের বৈভব দেখতে ঔৎসুক্য জাগল। পূর্বে যোগমায়া আশ্রয় করে শ্রীব্রহ্মার গোপালক ও গোবৎস হরণ কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বহু গোপালক ও গোবৎস রূপ ধারণ করে এক বৎসর কাল হরণের কথা সকলের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন আর শ্রীব্রহ্মা, শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণের কথা স্বীকার করে শ্রীভগবানের সখাদের ও গোবৎস-সকলকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব শ্রীভগবান বহুরূপ ধারণ করতে সক্ষম জেনেও দেবর্ষি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে চাইলেন যে শ্রীভগবান এইবার কেমন করে বহুরূপে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করছেন ! অতএব তাঁর দ্বারকায় আগমন হল।

দ্বারকা তখন পুষ্পিত উপবন ও উদ্যানসমূহে পরিশোভিত ছিল ; বিহঙ্গকুলের কাকলি ও ভ্রমরকুলের গুঞ্জন সেই সকল পুষ্পোদ্যানসকলকে মনোরম করে রেখেছিল। সরোবরসকল নীলপদ্ম, লালপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, কুমুদাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। হংস ও সারসের উচ্চ কূজন দ্বারকাপুরীতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। স্ফটিক ও রজতমণ্ডিত মহামরকতমণি প্রভায় সমুদ্ভাসিত নয় লক্ষ প্রাসাদসকলের অনুপম শোভা দ্বারকাকে সৌন্দর্যের শিখরে নিয়ে গিয়েছিল। রাজপথ, সাধারণ পথ, চৌমাথা, পণ্যবীথিকা, আস্তাবল, সভামণ্ডপ ও দেবমন্দিরসকল নগরকে মনোহর করে রেখেছিল।

পথসকল সুবাসিত ও উত্তমরূপে সিঞ্চিত ছিল। ধ্বজ পতাকা এত বেশি সংখ্যক ছিল যে তা সূর্যালোকও আড়াল করছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরের এক বিশেষ সৌন্দর্য ছিল। তার নির্মাণ কলাকৌশল প্রত্যক্ষ করে মনে হত যেন বিশ্বকর্মা তাঁর সমস্ত কলাকৌশল এটি নির্মাণ করবার সময়ে উজাড় করে দিয়েছিলেন। অনন্তর তিনি সেই অন্তঃপুরে শ্রীভগবানের ষোড়শ সহস্রাধিক গৃহসমূহের মধ্যে এক অনুপম গৃহে প্রবেশ করলেন। সেই ভবনে বিদ্রুমরত্নময় স্তম্ভসকল, বৈদূর্যমণিময় পল্লব এবং দেওয়াল ও ভিত্তি নীলকান্তমণি খচিত ছিল। চন্দ্রাতপসকল মুক্তামালার ঝালরে পরিশোভিত ছিল। আসবাবসমূহ হস্তীদন্ত নির্মিত ছিল। দাসদাসী সকল উত্তম বস্ত্রালংকারে সজ্জিত থেকে নিজ নিজ কর্মে ব্যস্ত ছিল। রত্নপ্রদীপসকল অন্ধকার নিবারণ করছিল। অগুরু ধূপের ধূম্র গবাক্ষপথে নির্গত হচ্ছিল।

দেবর্ষি নারদ সেইভবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পত্নী রুক্মিণীর সঙ্গে দেখলেন যিনি চামর ব্যজন করে তাঁর সেবা করছিলেন। দাসীসমূহের প্রাচুর্য থাকলেও শ্রীভগবানের সেবায় তাঁর পত্নী স্বয়ং শ্রীরুক্মিণী যুক্ত ছিলেন। দেবর্ষির আগমন প্রত্যক্ষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পত্নীর পালঙ্ক থেকে নেমে এলেন। ব্রাহ্মণভক্ত শ্রীভগবান দেবর্ষির চরণে কিরীটভূষিত মস্তক অবনত করে প্রণাম করলেন এবং করজোড়ে তাঁকে নিজ আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর পাদপ্রক্ষালন করে পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান মাঙ্গলিক বস্তুসকল সহযোগে শাস্ত্রোক্ত বিধিতে দেবর্ষির পূজা করলেন। তাঁরপর স্তুতিবাক্যসকল শ্রবণ করে দেবর্ষিও তাঁকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে নিত্যযুক্ত থাকবার কৃপা প্রার্থনা করলেন।

যোগেশ্বরদেরও ঈশ্বর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার রহস্য জানবার জন্য অতঃপর দেবর্ষি নারদ তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর ভবনে গমন করলেন। দেবর্ষি নারদ দেখলেন যে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রাণপ্রিয়া ও উদ্ধবের সঙ্গে পাশা খেলছেন। সেইখানেও ভগবান উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন,

আসন দান করলেন এবং বিবিধ সামগ্রী দ্বারা শ্রীনারদের ভক্তি সহকারে পূজার্চনা করলেন। এইবারও শ্রীভগবান শ্রীনারদকে বললেন—'আপনি এইখানে কবে এলেন ? আমার মতন অপূর্ণকামের পক্ষে আপনার কী সেবা করা সম্ভব ? তবুও সেবা করবার সুযোগ দিয়ে আমাদের জন্ম সার্থক করুন।' তাঁর কথোপকথনে বোঝা যাচ্ছিল যে শ্রীনারদের সঙ্গে তাঁর এই প্রথম সাক্ষাৎ বহুদিন পর হল। শ্রীনারদ তখন উঠে অন্য এক গৃহে গমন করলেন।

সেই গৃহে দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিশুপুত্রগণের লালনপালন করছেন। সেইখান থেকে তিনি অপর এক গৃহে গমন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্নানের জন্য প্রস্তুত হতে দেখলেন। এইভাবে দেবর্ষি ক্রমান্বয়ে অন্যান্য গৃহেও গমন করলেন। তিনি দেখলেন—কোথাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ করছেন, কোথাও বেদপাঠ, হোম, অতিথিসেবা, তর্পণ ও বলিপ্রদান —এই পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান করে ব্রাহ্মণভোজন করাচ্ছেন আর যজ্ঞাবশেষ স্বয়ং ধারণ করছেন। কোথাও তিনি দেখলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যাহ্নিকে বসেছেন আর কোথাও মৌন হয়ে গায়ত্রী জপ করছেন। এক জায়গায় তিনি দেখলেন যে শ্রীভগবান হস্তে ঢাল তরবারি ধারণ করে উত্তম তরবারি চালনার কৌশল আয়ত্ত করছেন।

তিনি কোথাও দেখলেন—ভগবান অশ্ব, গজ অথবা রথ আরোহণ করে বিচরণ করছেন। কোথাও দেখলেন শ্রীভগবান পালঙ্কে শয়ন করে আছেন আর অন্য কোথাও বন্দীজন তাঁর স্তুতি করছেন। তিনি কোনো জায়গায় দেখতে পেলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবাদি অমাত্যদের সঙ্গে কোনো গম্ভীর বিষয়ে পরামর্শ করছেন আর কোথাও দেখলেন—তিনি অতি উত্তম বারবণিতাদের সঙ্গে জলকেলিতে মগ্ন রয়েছেন। তিনি কোথাও দেখলেন —ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের বস্ত্রাভরণে সুসজ্জিত গোদান করছেন আর কোনো গৃহে দেখলেন—তিনি মঙ্গলময় ইতিহাস পুরাণসমূহ শ্রবণ করছেন।

তিনি কোনো গৃহে দেখতে পেলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পত্নীর সঙ্গে হাস্যকৌতুকে যুক্ত রয়েছেন। কোথাও তিনি ধর্ম সেবন করছেন আর কোথাও অর্থসেবন করে ধনসংগ্রহ ও ব্যবসায় নিযুক্ত রয়েছেন ; আর

কোথাও ধর্মানুকূল গৃহস্থোচিত বিষয়সকল ভোগ করছেন।

কোনো গৃহে দেবর্ষি দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একান্তে বসে প্রকৃতির অতীত পরমপুরুষকে ধ্যান করছেন। আর অন্য এক ভবনে দেখলেন যে তিনি গুরুজনদের উপভোগ্য ভোগসামগ্রী প্রদান করে তাঁদের সেবাশুশ্রূষা করছেন।

দেবর্ষি নারদ দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কারও সঙ্গে যুদ্ধের কথা আলোচনা করছেন আর অন্য স্থানে সন্ধির কথা বলছেন। কোথাও তিনি ভগবান শ্রীবলরামের সঙ্গে বসে সজ্জনদের মঙ্গল চিন্তা করছেন। তিনি অন্য এক জায়গায় দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথাকালে পুত্র ও কন্যাসকলের মহাসমারোহে বিবাহকার্যে নিযুক্ত। কোথাও তিনি কন্যা-জামাতা বিদায়ে ব্যস্ত আর অন্য কোথাও তাদের তিনি আগমনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

দেবর্ষি নারদ কোনো এক গৃহে দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান করে সমস্ত দেবতাদের যজন-পূজন করছেন ; আর অন্য কোথাও কূপ, উদ্যান, মঠ আদি নির্মাণ করে পূর্ত ধর্মানুষ্ঠান আচরণ করছেন। কোথাও তিনি উত্তম যাদবগণ পরিবৃত হয়ে সিন্ধুদেশীয় অশ্বে আরোহণ করে মৃগয়া করছেন এবং যজ্ঞে আবশ্যক মেধ্য পশুদেরই বধ করছেন।

তিনি কোথাও দেখতে পেলেন যে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কোথাও প্রজাদের মধ্যে আর কোথাও অন্তঃপুরের গৃহাদিতে ছদ্মবেশে সকলের অভিপ্রায় জানবার উদ্দেশ্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন। এইভাবে নরলীলায় রত হৃষীকেশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার বৈভব দেবর্ষি নারদ দেখলেন।

তখন দেবর্ষি নারদ বললেন—'হে যোগেশ্বর ! হে আত্মদেব ! আপনার যোগমায়া ব্রহ্মাদি অতি বড় মায়াবীগণেরও অগম্য। আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবায় নিত্যযুক্ত থাকায় সেই রহস্য আমি জানি কারণ তা স্বয়ংই আমার সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে যায়। আকাশ বাতাস আপনার যশে পরিপূর্ণ। আমাকে আজ্ঞা দিন আমি আপনার ত্রিভুবনপাবন লীলা সংকীর্তন করে সেই সকল লোকে বিচরণ করব।' শ্রীভগবান জানালেন যে তিনি একাধারে উপদেশক, পালনকর্তা ও অনুমোদনকর্তা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে গৃহস্থদের পবিত্রতা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণ করছিলেন। যদিও তিনি এক তবুও দেবর্ষি নারদ তাঁকে প্রত্যেক ভার্যার মহলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তাঁর যোগমায়ার পরম ঐশ্বর্য অবলোকন করে দেবর্ষি নারদের বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রইল না।

যা দেবর্ষি দেখেছেন তাই অন্য সকলেও দেখে থাকেন। তিনি যোগমায়ার রহস্য জানতেন বলে শ্রীভগবানকে চিনতে পেরেছেন। কিন্তু শ্রীভগবান যে এখনও বিভিন্ন রূপ ধরে গৃহস্থোচিত উত্তম ধর্মাচরণ করে যাচ্ছেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা যে তিনি আমাদের সেই ক্ষমতা যেন দেন যাতে আমরা তাঁকে নিত্য কর্মে আমাদের সঙ্গেই বিচরণে থাকার সময়ে চিনতে পারি। ভক্ত তাঁর পরম প্রিয়। তিনি ভক্তকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। আমরা তাঁর নিত্য সঙ্গ লাভ করি কিন্তু তা বুঝতে পারি না কারণ তাঁর যোগমায়ার রহস্য যে আমাদের অজানা। 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'—এ যে পরম সত্য।

———o———

সখা

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ॥ (১০।৮১।৪)

দারিদ্র্যক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে চলেছেন সখা সন্দর্শনে। আনন্দের কারণ বহুদিন পরে সখার সাক্ষাৎকার লাভ হবে। ব্রাহ্মণ সুদামা ব্রহ্মজ্ঞানী, বিষয়াসক্তিরহিত, শান্তচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয়। সংগ্রহ পরিগ্রহে উদাসীন ব্রাহ্মণ প্রারব্ধানুসারে লব্ধ বস্তুর উপর নির্ভর করেন তাই দারিদ্র্য তাঁর নিত্য সঙ্গী। তাঁর পতিব্রতা ব্রাহ্মণীও পতির মতন অল্পে তুষ্ট ; ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর তিনি পতি অনুকূল হয়ে সব কষ্ট নীরবে সহ্য করে যান। তিনিও ব্রাহ্মণের ন্যায় কৃশ দেহ ; তাঁরও অঙ্গে জীর্ণ পুরাতন বসন।

ব্রাহ্মণের সখা যে সে ব্যক্তি নন। তিনি যদুকুলপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি ভক্তবাঞ্ছাতরু শরণাগতবৎসল ও ব্রাহ্মণভক্ত বলে পরিচিত। ব্রাহ্মণী চেয়েছিলেন যে তাঁর পতি দ্বারকায় গমন করে সখার নিকট ধনসম্পদ যাচনা করুন কারণ দারিদ্র্য তখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। ব্রাহ্মণ কিন্তু ভার্যার অনুরোধে প্রথমে রাজি হতে পারেননি কারণ সখ্য লাভ করে তুচ্ছ সম্পদ লাভের কামনা করা তাঁর কল্পনাতীত। অবশেষে তিনি সখার কাছে যেতে রাজি হয়েছিলেন এই মনে করে যে সাক্ষাৎকার লাভ তো হবে আর তাতে যদি দারিদ্র্য মোচনে সখা নিজে প্রয়াসী হন তাহলে তা গ্রহণ করবার কথা ভেবে দেখাও যেতে পারে। ভার্যার দুর্দশা যে তাঁকে মাঝে মাঝে উদাস করে তোলে !

যথাসময়ে ব্রাহ্মণ সুদামার দ্বারকা প্রবেশ হল। দ্বারকায় সুরক্ষার কড়াকড়ি। তিন সৈন্যব্যূহ ও তিন কক্ষ তিনি অতিকষ্টে অতিক্রম করলেন। দ্বারকার বৈভব দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সখা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ

সহস্রাধিক মহিষীগণের পৃথক পৃথক ভবনসমূহের সম্মুখে দীনহীন কৃশ ব্রাহ্মণ নিজেকে বেমানান মনে করতে লাগলেন। তাঁর ভয় হল যদি সেই সান্দীপনি মুনির আশ্রম গুরুকুলের সখা আজ তাঁকে চিনতে অস্বীকার করেন তখন তিনি কী করবেন ? ভয় ও আনন্দে মগ্ন হয়ে সসংকোচে তিনি অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভার্যাদের এক শ্রেষ্ঠ ভবনে প্রবেশ করলেন।

তিনি শ্রীরুক্মিণী দেবীর ভবনে প্রবেশ করেছিলেন যেখানে শ্রীভগবান স্বয়ং ভার্যার সঙ্গে সুরম্য পালঙ্কে অবস্থান করছিলেন। শ্রীভগবান সখাকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং আনন্দে তাঁকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে আলিঙ্গন দান করলেন। মলিনবসন ব্রাহ্মণ সুদামা দেখলেন যে তাঁর প্রিয় সখা সাক্ষাৎকারের আনন্দে অশ্রুমোচন করছেন। কমললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তারপর সখাকে হাত ধরে নিয়ে এসে সেই পালঙ্কে উপবেশন করালেন আর মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সহযোগে তাঁর পূজার্চনা করলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণভক্ত শ্রীভগবান স্বয়ং ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন করলেন ও সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন। তিনি সখার অঙ্গে দিব্যগন্ধ, চন্দন, অগুরু ও কুমকুম লেপন করে দিলেন আর সুগন্ধ ধূপ ও দীপ সহযোগে তাঁর আরতি করলেন। তাম্বূল দান ও গোদানও বাদ গেল না।

মলিন ও জীর্ণ বসন কৃশ ও দুর্বল বদন ব্রাহ্মণ সুদামা সখার এইরূপ ব্যবহারে যেন সেই গুরুকুলের প্রিয় সখাকেই খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর প্রাথমিক সংকোচের অবসান হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং ভগবতী শ্রীরুক্মিণীদেবী তাঁকে স্বহস্তে চামর ব্যজন করছিলেন। কিন্তু অন্তঃপুরের অন্যান্য রমণীগণ তাঁদের নির্মলকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই আপাতদৃষ্টিতে অহেতুকী সৌজন্য প্রকাশকে আশ্চর্যজনক মনে করে মলিন বসন ব্রাহ্মণের দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ ব্রাহ্মণ ভাবলেন যে সখা তাঁকে চিনতে পেরেছেন তো ? তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে সখা তাঁর কথা জানতে পেরে গিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সখার হস্ত ধারণ করে গুরুকুলে অবস্থান কালের ঘটনাসকল আলোচনা করতে শুরু করলেন। তাঁদের দুইজনকে গুরুপত্নীর কাষ্ঠ আহরণে অরণ্যে প্রেরণ, অরণ্যে অকালে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও প্রবল বজ্রপাত,

দুর্যোগে সন্ধ্যাগমনে তাঁদের পথ হারানো ও অরণ্যে পথভ্রষ্ট হয়ে বিচরণ ও দিবাগমনে সান্দীপনি মুনি কর্তৃক তাঁদের উদ্ধারলাভ সবকিছুই আলোচিত হল।

সর্বজ্ঞ শ্রীভগবান সখার দারিদ্র্যের কথা সবই জানতেন। সখাকে আরও সহজ হওয়ার জন্য তিনি বললেন যে শুভবুদ্ধি নিষ্কাম ভক্ত তাঁকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করলেই তিনি সেই ভক্তিপূত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করে থাকেন। ব্রাহ্মণ আগমন কালে গৃহ থেকে ব্রাহ্মণী দ্বারা যাচনা করা চার মুষ্টি চিঁড়া এক বস্ত্রখণ্ডে বেঁধে এনেছিলেন সখাকে উপহার দেওয়ার জন্য। ঐশ্বর্যসম্পন্ন দ্বারকায় সেই চিঁড়া উপহার বার করে দিতে ব্রাহ্মণের সংকোচ হচ্ছিল। শ্রীভগবান যখন সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন যে সখা তাঁর জন্য কী উপহার এনেছেন, তখন ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য প্রদর্শনকারী মলিন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন করা চিঁড়া বস্ত্র থেকে বার করে দিতে চাইলেন না। 'এইটা আবার কী ?' বলে এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই গোপন করে রাখা চিঁড়ার পুঁটুলি বার করে আনলেন আর তার থেকে এক মুষ্টি গ্রহণ করে সখাকে জানালেন যে এই বস্তু তাঁর অতি প্রিয়। দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ করতে উদ্যত হলে শ্রীরুক্মিণীদেবী তাঁকে বিরত করে বললেন যে আর গ্রহণ করবার দরকার নেই। এইভাবে ব্রাহ্মণের লজ্জা, ভয় সবই শ্রীভগবান হরণ করে নিয়ে তাঁর সখাকে হীনতামুক্ত করলেন।

ব্রাহ্মণ সুদামা রাত্রিযাপন করে বৈকুণ্ঠ বাসের অনুভূতি পেলেন। দিবাগমনে ব্রাহ্মণ সানন্দে গৃহাভিমুখে গমন করলেন। বিদায়কালে সখা ব্রাহ্মণকে ধনসম্পদ দান করে বিব্রত করলেন না। ব্রাহ্মণ ভাবলেন যে ধনসম্পদের প্রভাবে যাতে সখার বিস্মরণ না হয় তাই তিনি ধনসম্পদ দান করেননি। তিনি সখার সাক্ষাৎকার লাভের কামনায় এসেছিলেন এবং তা তিনি পেয়েছেন। তাই প্রত্যাগমন কালে ব্রাহ্মণ আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলেন।

সেবা-পূজা, আদর-আপ্যায়ন আদির কথা ভাবতে ভাবতে ব্রাহ্মণ যথাকালে নিজ গৃহ সন্নিকটে উপনীত হলেন। স্থান চিনতে তাঁর অসুবিধা হচ্ছিল কারণ তাঁর পরিচিত স্থান তখন সূর্য, অগ্নি, চন্দ্রসম দেদীপ্যমান

অট্টালিকায় পরিবেষ্টিত। বিভিন্ন স্থানে পুষ্পিত উদ্যান-উপবন, বিহঙ্গকুলের কলকাকলি ও ভ্রমরের গুঞ্জন, উত্তম বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত জনগণ ব্রাহ্মণকে আশ্চর্যান্বিত করল। এমন সময়ে গীতবাদ্য সহকারে তাঁর অভ্যর্থনা হতে দেখে তিনি তাঁর সখার বৈভবের কথা স্মরণ করলেন। তিনি দেখলেন যে তাঁরই পর্ণকুটির এক দেদীপ্যমান অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে। এমন সময়ে পতির আগমনবার্তা লাভ করে ব্রাহ্মণী মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবীসম গৃহ থেকে নির্গত হয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে পতিকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ব্রাহ্মণ দেখলেন যে ব্রাহ্মণী সুবর্ণহারধারিণী দাসীগণের মধ্যে দেবীর মতন বিরাজমান। পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনের ন্যায় শত শত মণিময় স্তম্ভে পরিশোভিত নিজ ভবনে প্রবেশ করলেন। তিনি বুঝলেন যে তাঁর পত্নীর মনোরথ পূরণের জন্য তাঁর সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রচুর ঐশ্বর্য প্রদান করেছেন।

এ কথা সুবিদিত যে ঐশ্বর্যজনিত মদমত্ত ব্যক্তিগণ সাধারণত সেই জন্মরহিত সর্বজ্ঞ ভগবানকে বিস্মরণ করে থাকে। তাই অদূরদর্শী ভক্তকে তিনি বিবিধ সম্পদ, রাজ্যাদি ঐশ্বর্য আদি বিভূতি প্রদান করেন না। তিনি যেমন ভক্তকে ভালোবাসেন তিনিও চান ভক্ত তাঁকে ভালোবাসা দিক। ভক্ত এক পা এগিয়ে এলে তিনি দশ পা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সঙ্গদান করে থাকেন। তাই তাঁর শরণাগত হয়ে থাকাই কল্যাণকর।

———o———

সংকটে শংকর

মুক্তং গিরিশমভ্যাহ ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।

অহো দেব মহাদেব পাপোঽয়ং স্বেন পাপ্মনা॥ (১০।৮৮।৩৮)

বৃকাসুর ছিল শকুনি নামক অসুরের পুত্র। দুষ্টবুদ্ধি বৃকাসুরের একদিন দেবর্ষি নারদের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল। সে দেবর্ষির কাছে জানতে চাইল যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মধ্যে কোন্ দেবতাকে প্রসন্ন করা সহজ। দেবর্ষি তাকে জানালেন—'হে অসুররাজ ! তুমি দেবাদিদেব গিরিশের আরাধনা করো। ওই পথে সিদ্ধিলাভ করা সহজ। তিনি অল্পে তুষ্ট আর অল্পে রুষ্ট। রাবণ ও বাণাসুর অসহায় অবস্থায় কেবলমাত্র ভগবান শংকরের স্তবস্তুতি করেছিল ; তাতেই তিনি প্রসন্ন হয়ে তাদের অতুলনীয় ঐশ্বর্য প্রদান করেছিলেন।' এ কথা সকলেরই জানা যে ভগবান শংকরের বরে শক্তিমান রাবণ কৈলাস উৎপাটন করে আর বাণাসুর সেই তাঁকেই পুররক্ষক নিযুক্ত করে সংকটে ফেলেছিল।

দেবর্ষি নারদের কাছে উপদেশ লাভ করে বৃকাসুর কেদার তীর্থে গমন করল এবং অগ্নিকে ভগবান শংকরের মুখ জ্ঞানে যজ্ঞ করতে লাগল। সে নিজ দেহের মাংস কেটে কেটে আহুতি দিতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্তব-স্তুতি করতে লাগল। এইভাবে ছয় দিন উপাসনা করেও তাঁর ভগবান শংকরের দর্শন লাভ হল না। সে সপ্তম দিবসে কেদার তীর্থে অবগাহন করে নিজ সিক্ত কেশযুক্ত মস্তক ছেদন করতে উদ্যত হল।

জগতে যখন কেউ দুঃখে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয় তখন সকলেই করুণা করে তাকে সেই কার্য থেকে বিরত করে থাকে। বৃকাসুরের ক্ষেত্রে সেই একই ব্যাপার হল। পরম দয়ালু ভগবান শংকর আত্মহত্যার আগেই অগ্নিকুণ্ড থেকে অগ্নিদেবসম আবির্ভূত হলেন আর বৃকাসুরের হাত ধরে

আত্মহত্যা থেকে বিরত করলেন। তাঁর স্পর্শ লাভ করে বৃকাসুর পুনরায় আগের মতো পূর্ণদেহ লাভ করল।

তখন ভগবান শংকর বৃকাসুরকে বললেন—'হে প্রিয় বৃকাসুর ! যথেষ্ট হয়েছে ; বিরত হও। আমি তোমাকে বরদান করতে প্রস্তুত। তুমি তোমার অভিলষিত বর চেয়ে নাও। তোমার দেহকে এত উৎপীড়ন করবার প্রয়োজন ছিল না ; আমি তো শরণাগত ভক্তদের অর্পণ করা জলেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকি।'

ভগবান শংকরের কাছে সেই পাপিষ্ঠ বৃকাসুর এক ভয়াবহ বর প্রার্থনা করে বসল। সে বলল—'আমি যার মাথার উপর হাত রাখব তার যেন সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়।' তার এই প্রার্থনা শুনে ভগবান শংকরও দুর্মনা হয়ে পড়লেন কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই হেসে 'তথাস্তু' বলে দিলেন। এইরূপ বরদান করে তিনি যেন সর্পকে অমৃত প্রদান করে দিলেন।

বর লাভ করেই বৃকাসুর নিজমূর্তি ধারণ করল। তার মনে দেবী পার্বতীকে হরণ করবার লালসা জাগল। সে বরের সামর্থ্য পরীক্ষা করবার নিমিত্ত ভগবান মহাদেবের মস্তকেই নিজের হাত স্থাপন করতে উদ্যত হল। এইবার নিজ প্রদত্ত বর ভগবান শংকরকেই শঙ্কিত করে তুলল। তিনি পলায়ন করে বাঁচতে চাইলেন কিন্তু বৃকাসুর তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করল। স্বর্গ, পৃথিবী ও দিগন্ত পার করে ভগবান শংকর বৃকাসুর থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভ করবার পথ না জানা থাকায় অন্যান্য দেবতাগণ সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। শেষে তিনি প্রকৃতিমণ্ডলের অন্ধকারের অতীত দীপ্তিশালী বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করলেন। সেই বৈকুণ্ঠে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ অবস্থান করেন যিনি সর্বত্যাগী সাধুদের পরম গতি ও সমগ্র জগৎকে অভয় প্রদান করে শান্তভাবে বিরাজমান। তিনি দেখলেন যে ভগবান শংকর ভয়ানক সংকটে রয়েছেন। তিনি তখন নিজ যোগমায়া অবলম্বন করে ব্রহ্মচারী রূপ ধরে ধীরে ধীরে বৃকাসুরের দিকে অগ্রসর হলেন।

বৃকাসুর দেখল যে এক ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছেন। ব্রহ্মচারী বেশধারী শ্রীভগবান মুঞ্জ মেখলা, কৃষ্ণাজিন, দণ্ড ও

রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করে ছিলেন। তাঁর অঙ্গ থেকে প্রজ্বলিত অগ্নিসম জ্যোতি নির্গত হচ্ছিল। তিনি হস্তে কুশ ধারণ করে ছিলেন। বৃকাসুর ব্রহ্মচারীকে দেখে সবিনয় প্রণাম নিবেদন করলেন।

ব্রহ্মচারী বললেন—'হে শকুনিনন্দন বৃকাসুর ! আপনাকে ভয়ানক পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে। বহু দূর থেকে আসছেন নাকি ? বোধহয় আপনার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। দেহকে কষ্ট দিচ্ছেন কেন ? দেহের দ্বারাই তো সমস্ত কামনা পূর্তি হয়ে থাকে। আপনি তো এখন সব দিক দিয়ে সমর্থ। যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমাকে বলুন, কারণ জগতে তো বহু কার্য পরামর্শ করে আরও ভালোভাবে করা সম্ভব হয়ে থাকে।'

শ্রীভগবানের মধুময় কথা শুনে বৃকাসুর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিল। অতঃপর সে যথাক্রমে তপস্যা, বর লাভ ও ভগবান শংকরকে তাড়া করবার কথা সবই বলে দিল। শ্রীভগবান তো সর্বজ্ঞ তবুও বৃকাসুরের মুখ থেকে কথা শুনে তাকে পরামর্শ দান করলেন।

ব্রহ্মচারী বললেন—'ও এই কথা ! তাহলে বলি। আমরা কিন্তু ভগবান শংকরের কথা আদৌ বিশ্বাস করি না। আপনি তা জানেন না ? ওই রুদ্রদেব তো দক্ষ প্রজাপতির অভিশাপে পৈশাচভাব প্রাপ্ত হয়ে এখন প্রেত ও পিশাচ সকলের রাজা হয়ে বসে আছেন।

হে দানবরাজ ! আপনি এত মহান ও শক্তিশালী হয়েও এই রকম বর দেওয়ার ক্ষমতা আদির উপর বিশ্বাস ধারণ করেন ? আপনার যদি রুদ্রদেবের উপর জগদ্‌গুরু জ্ঞান এখনও থাকে আর তাঁর কথার উপর বিশ্বাস থাকে তাহলে তা কেমন সত্য তা নিজের মাথার উপর হাত রেখেই দেখে নিন। তারপর না হয় সেই মিথ্যাবাদীকে তাঁর যোগ্য শাস্তি প্রদান করবেন ; তাঁকে বধ করবেন।'

শ্রীভগবান বিষ্ণুর কথা শুনে বৃকাসুর মোহিত হয়ে পড়েছিল। অদ্ভুত ও সুমিষ্ট কথা শুনে তার ক্ষণিক বুদ্ধিবৈকল্য হল। সে বরের অক্ষমতা প্রমাণ করবার জন্য নিজের মস্তকের উপর হাত রাখল। মস্তকের উপর হস্ত স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং বৃকাসুর

বজ্রাহতের ন্যায় ভূতলে পতিত হল।

এইভাবে পাপিষ্ঠ বৃকাসুর নিহত হলে দেবগণ, পিতৃগণ ও গন্ধর্বগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। আকাশ বাতাসে জয়ধ্বনি হতে লাগল ; সঙ্গে সঙ্গে 'নমো নমঃ', 'সাধু সাধু' রবও শোনা গেল। ভগবান শংকর এইভাবে এক ভয়ানক সংকট থেকে মুক্তি লাভ করলেন। তখন ভগবান পুরুষোত্তম মহাদেবের স্তুতি করলেন।

শ্রীভগবান বিষ্ণু বললেন—'হে দেবদেব মহাদেব ! এই দুষ্ট নিজ পাপেই ধ্বংস হল। হে পরমেশ্বর ! জগতে মহাপুরুষের নিকট অপরাধ করে কারও মঙ্গল কখনো হয় ? আর আপনি তো স্বয়ং জগদ্গুরু বিশ্বেশ্বর, আপনার নিকট অপরাধ করে কুশলে থাকা তো আদৌ সম্ভব নয়।'

———○———
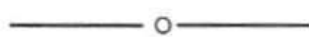
ভক্ত ও ভগবান

দেবাঃ ক্ষেত্রাণি তীর্থানি দর্শনস্পর্শনার্চনৈঃ।

শনৈঃ পুনন্তি কালেন তদপ্যর্হত্তমেক্ষয়া॥ (১০।৮৬।৫২)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত শ্রুতিদেব বিদেহের রাজধানী মিথিলাতে বাস করতেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ভগবদ্ভক্তিতেই পূর্ণ, পরম শান্ত, জ্ঞানী ও বৈরাগ্যবান ছিলেন। তিনি কামনারহিত থেকে যা পেতেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। প্রারব্ধানুসারে তিনি জীবন ধারণ নিমিত্ত সামগ্রী লাভ করে আনন্দে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মপালনে তৎপর থাকতেন। দেশের রাজাও ব্রাহ্মণের মতন ভক্তিমান ছিলেন। রাজা তখন বহুলাশ্ব ; তিনিও অহংকাররহিত ছিলেন। অতএব শ্রুতিদেব ও বহুলাশ্ব দুইজনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত ছিলেন।

একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হয়ে দারুককে রথ আনতে বললেন আর তাতে আরোহণ করে দ্বারকা থেকে বিদেহ দেশের দিকে প্রস্থান করলেন। শ্রীভগবানের সঙ্গে নারদ, বামদেব, অত্রি, বেদব্যাস, পরশুরাম, অসিত, আরুণি, শুকদেব, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয়, চ্যবন আদি ঋষিগণও গিয়েছিলেন। পথে তাঁদের পূজার্চনা নিমিত্ত নাগরিকবৃন্দ ও গ্রামবাসীগণ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। শ্রীভগবান এই সময়ে আনর্ত, ধন্ব, কুরুজাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পাঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কৌশল, অর্ণ আদি বহু দেশের নর-নারীদের সাক্ষাৎ দর্শন দিয়ে ধন্য করেছিলেন। পথে ভক্তগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সরল উন্মুক্ত হাস্য ও প্রেমে পূর্ণ কৃপাকটাক্ষযুক্ত বদনমণ্ডলের মকরন্দসুধা পান করে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি দৃষ্টিদ্বারা পরম কল্যাণ ও তত্ত্বজ্ঞানও বিতরণ করেছিলেন। অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিদেহ দেশে উপস্থিত হলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমন বার্তা নাগরিকবৃন্দ ও গ্রামবাসীদের পরম আনন্দে পরিপূর্ণ করেছিল। তাঁরা মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সহিত অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে তাঁদের চিত্ত ও বদনমণ্ডল প্রেম ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তাঁরা সেই মুনিদের ও তার সঙ্গে শ্রীভগবানকে দেখে যুক্তকরে অবনত মস্তকে প্রণাম করেছিলেন। তাঁদের দর্শন করবার পরম সৌভাগ্য লাভ করে তাঁরা ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন।

মিথিলা অধিপতি বহুলাশ্ব ও শ্রুতিদেব দুইজনই ভাবলেন যে শ্রীভগবান তাঁদেরই উপর অনুগ্রহ করে পদার্পণ করেছেন। তাঁরা দুই জনই শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে সকলের সঙ্গে আতিথ্য গ্রহণ করবার আবেদন জানালেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুইজনেরই প্রার্থনা স্বীকার করে উভয়কে প্রসন্ন করবার নিমিত্ত একই সময়ে দুইজনের কাছেই গমন করলেন। দুইজনই ভাবলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল আমার গৃহেই পদার্পণ করেছেন অন্য কোথাও যাননি।

বিদেহরাজ বহুলাশ্ব স্থিতধী ব্যক্তি ছিলেন। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ও ঋষিমুনিগণ তাঁর গৃহে এসেছেন তা তাঁর কাছে পরম গৌরবের ছিল। তিনি অতিথিসকলকে অতি সুন্দর আসনে উপবেশন করালেন। তখন তাঁর বিচিত্র দশা। প্রেমাতিশয্যে ও ভক্তি প্রাবল্যে তিনি গদগদ হয়ে ছিলেন ; নয়নযুগল প্রেমাশ্রু ক্ষরণ করতে তৎপর ছিল। তিনি পূজ্যতম অতিথিদের পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে পাদপ্রক্ষালন করলেন ও সেই পাদোদক নিজ আত্মীয়স্বজন সমেত মস্তকে ধারণ করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীভগবানের ও ভগবদ্‌ভক্তস্বরূপ ঋষিদের গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, অলংকার, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য, ধেনু, বৃষ আদি সমর্পণ করে পূজার্চনা করলেন। যখন সকলে আহার্য ধারণ করে তৃপ্ত হয়ে গেলেন তখন তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল নিজ অঙ্কে ধারণ করে তা সেবা করতে করতে স্তুতি করতে লাগলেন। ভক্ত যে শ্রীভগবানের নিজ স্বরূপ শ্রীবলরাম, অর্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মী ও পুত্র ব্রহ্মা থেকে বেশি প্রিয় তাই প্রমাণ করবার জন্য শ্রীভগবান তাঁর মতন সাধারণ ভক্তকে দর্শন দিয়েছেন, এই কথা বহুলাশ্ব স্বীকার করে নিলেন। তিনি প্রার্থনা

করলেন যেন শ্রীভগবান মুনিঋষিদের সঙ্গে সেইখানে বসবাস করেন যাতে তাঁদের পদরজে নিমিবংশ পবিত্র হয়ে যায়। সকলের জীবনদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা বহুলাশ্বের প্রার্থনা স্বীকার করে মিথিলাবাসী জনগণের কল্যাণে সেইখানে কিছুদিন পর্যন্ত অবস্থান করলেন।

যেমন রাজা বহুলাশ্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিমণ্ডলকে পদার্পণ করতে দেখে আনন্দমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন তেমনই ব্রাহ্মণ শ্রুতিদেব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং মুনিদের গৃহে পদার্পণ করতে দেখে আনন্দ বিহ্বল হয়ে গেলেন। তিনি প্রণাম নিবেদন করে নৃত্য করতে লাগলেন। অতঃপর শ্রুতিদেব মাদুর, পিঁড়ি, কুশাসন পেতে তার উপর অতিথিদের উপবেশন করালেন, স্বাগত ভাষণ আদি দ্বারা তাঁদের অভিনন্দিত করলেন ও নিজ ভার্যা সহিত অতি আনন্দে সকলের পাদপ্রক্ষালন করলেন। মহান সৌভাগ্যবান শ্রুতিদেব ভগবান ও ঋষিদের পাদোদকে নিজ গৃহকে ও আত্মীয়স্বজনকে সিঞ্চিত করে দিলেন। তাঁর সকল মনোরথ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি আনন্দে মত্ত হয়ে পড়েছিলেন। তদনন্তর তিনি ফল, গন্ধ, সুবাসিত জল, সুগন্ধি মৃত্তিকা, তুলসী, কুশ, কমল আদি অনায়াসলব্ধ পূজাসামগ্রী এবং সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকারী অন্নদ্বারা তাঁদের আরাধনা করলেন। শ্রুতিদেব নিজেকে গৃহস্থাশ্রমের অন্ধকার কূপে পতিত মনে করতেন ; তিনি সমস্ত তীর্থকে তীর্থের মর্যাদা প্রদানকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর নিবাসস্থান ঋষিমুনিদের পদরজ লাভকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। যখন সকলে আতিথ্য স্বীকার করে বিশ্রাম করতে লাগলেন তখন শ্রুতিদেব নিজ স্ত্রী-পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তাঁদের সেবার নিমিত্ত উপস্থিত হলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধারণ করে স্তুতি করতে লাগলেন। তিনি ভগবানকে কী সেবা করবেন তাই জিজ্ঞাসা করলেন ?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'হে শ্রুতিদেব ! এই সকল মহান মুনিঋষিগণ তোমার উপর অনুগ্রহ করবার জন্যই এইখানে এসেছেন। এঁরা পদরজ দান করে জনগণের ও লোকসমূহের কল্যাণের জন্যই বিচরণ করছেন ; সকলকে পবিত্র করছেন। দেবতা, পুণ্যক্ষেত্র এবং তীর্থ আদি তো দর্শন, স্পর্শ, অর্চন

আদি দ্বারা ধীরে ধীরে বহুদিন ধরে পবিত্র করে থাকে কিন্তু এই সকল মহাপুরুষগণ নিজ দৃষ্টিদান করেই সকলকে পবিত্র করে থাকেন। দেবতাদিতে যে পবিত্র করবার শক্তি বিদ্যমান থাকে তাও এইসকল মহাপুরুষদের কৃপা-দৃষ্টিদানে লাভ হয়ে থাকে। জগতে ব্রাহ্মণ যদি তপস্যা, বিদ্যা, সন্তোষ, আমার উপাসনা এবং আমার ভক্তিতে যুক্ত থাকে তাহলে তা অতি উৎকৃষ্ট।

আমার এই চতুর্ভুজরূপও ব্রাহ্মণদের থেকে বেশি প্রিয় নয় কারণ ব্রাহ্মণ সর্ববেদময় আর আমি সর্বদেবময়। বুদ্ধিরহিত মানব এই কথা না জেনে কেবল বিগ্রহাদিতেই পূজ্য বুদ্ধি রাখে এবং গুণের মধ্যেও দোষদর্শন করে আমারই আত্মস্বরূপ জগদ্‌গুরু ব্রাহ্মণের তিরস্কার করে। অতএব হে শ্রুতিদেব ! তুমি এই সকল ব্রহ্মর্ষিদের আমারই স্বরূপ জ্ঞানে পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে পূজার্চনা করো। আমার পূজা তাতেই হয়ে যাবে।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ লাভ করে শ্রুতিদেব শ্রীকৃষ্ণ ও সেই সকল ব্রহ্মর্ষিদের একাত্মভাবে আরাধনা করলেন ও তাঁদের কৃপায় তিনি ভগবদ্‌স্বরূপ লাভ করলেন। রাজা বহুলাশ্বও সেই একই গতি লাভ করলেন। আশ্চর্য হতে হয় এই দেখে যে, যেমন ভক্ত ভগবানকে ভক্তি করে তেমনই ভগবানও ভক্তদের ভক্তি করেন। ভক্তযুগলকে প্রসন্ন করবার জন্য শ্রীভগবান দুই ভক্তের নিকটই এককালে কিছুদিন অবস্থান করে এক বিরল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন।

———o———

আত্মসৌভাগ্য বর্ণনা

মাং তাবদ্ রথমারোপ্য হয়রত্নচতুষ্টয়ম্।
শার্ঙ্গমুদ্যম্য সন্নদ্ধস্তস্থাবাজৌ চতুর্ভুজঃ॥ (১০।৮৩।৩২)

একবার প্রলয়কালসম সর্বগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন আত্মকল্যাণ ও পুণ্যার্জন হেতু সমন্তপঞ্চক তীর্থ কুরুক্ষেত্রে বহুজনের আগমন হয়েছিল। সমাগত ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের সকল প্রান্ত থেকে এসেছিলেন। যদুবংশীয়দের মধ্যে প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধ ও কৃতবর্মা দ্বারকায় থেকে গিয়েছিলেন ; অন্য সকলে এসেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পাটরানীসকলও এসেছিলেন। সমাগত রাজাদের মধ্যে মৎস্য, উশীনর, কৌশল, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কৈকয়, মদ্র, কুন্তি, আনর্ত, কেরল দেশের রাজারা ছিলেন। তা ছাড়া এসেছিলেন যদুবংশের পরম হিতৈষী বন্ধু নন্দ আদি গোপ ও শ্রীভগবানকে দর্শন করবার অভিলাষে পরিপূর্ণ গোপিনীগণও। এইখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়ে তাঁদের অধ্যাত্মজ্ঞান দান করেছিলেন। সেই উপদেশের স্মরণ-মননে গোপিনীদের সঞ্চিত অভিমান খর্ব হয়েছিল আর তাঁদের জীবকোষ-বিশিষ্ট লিঙ্গশরীর নষ্ট হয়েছিল। তাঁরা শ্রীভগবানে নিত্যযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

যাদব ও কৌরব কুলবধূগণ মিলিত হয়ে শ্রীভগবানের ত্রিভুবন বিখ্যাত লীলাসকল আলোচনা করেছিলেন। দ্রৌপদী এইসময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাটরানীদের কাছে জানতে চাইলেন যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মায়ায় লৌকিক প্রথা অবলম্বন করে কেমনভাবে তাঁদের পাণিগ্রহণ করেছিলেন ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভার্যাগণ একে একে তা বর্ণনা করে দ্রৌপদীকে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

শ্রীরুক্মিণী বললেন—‘হে শ্রীদ্রৌপদী ! জরাসন্ধাদি রাজাগণ চাইতেন যে আমার বিবাহ যেন শিশুপালের সঙ্গেই হয় ; তাই তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবান আমাকে তাঁদের হাত থেকে সিংহের মতন ছিনিয়ে এনেছিলেন। জগতের সকল অজেয় বীরদের কিরীটে যে তাঁর পদরজ বর্তমান। হে দ্রৌপদী ! আমি কামনা করি যে শ্রীভগবানের সেই সমস্ত সম্পত্তি ও সৌন্দর্যের আশ্রয়স্থল তাঁর শ্রীপাদপদ্মকে জন্ম-জন্মান্তরে যেন আরাধনা করবার জন্য আমি লাভ করি আর যেন আমি তা সেবা করতে পারি।’

শ্রীসত্যভামা বললেন—‘হে শ্রীদ্রৌপদী ! আমার জনক অযুক্ত প্রসেনের মৃত্যুতে অতিশয় বিষণ্ণ ছিলেন, তাই তিনি তাঁর বধের কলঙ্ক লেপন শ্রীভগবানের উপর করেছিলেন। সেই কলঙ্ক মুছে ফেলবার জন্য শ্রীভগবান ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে পরাজিত করলেন আর সেই স্যমন্তক মণি এনে আমার জনককে দিয়েছিলেন। মিথ্যা কলঙ্ক লেপন কারণে আমার জনক ভীত হয়ে পড়েছিলেন। যদিও তিনি আমার বিবাহ অন্যত্র স্থির করে ফেলেছিলেন তবুও তিনি স্যমন্তকমণির সঙ্গে আমাকেও শ্রীভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করেছিলেন।’

শ্রীজাম্ববতী বললেন—‘হে শ্রীদ্রৌপদী ! আমার পিতা ঋক্ষরাজ জাম্ববান জানতেন না যে আমার স্বামী স্বয়ং ভগবান সীতাপতি। তাই তিনি তাঁর সঙ্গে সাতাশ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু যখন পরীক্ষা সম্পূর্ণ হল আর তিনি জানলেন যে তিনি ভগবান স্বয়ং শ্রীরাম। তখন তিনি তাঁর পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করে স্যমন্তক মণির সঙ্গে উপহাররূপে আমাকেও অর্পণ করেছিলেন। আমি জন্মজন্মান্তরে তাঁর দাসী রূপেই থাকতে চাই।’

শ্রীকালিন্দী বললেন—‘হে শ্রীদ্রৌপদী ! যখন শ্রীভগবান জানলেন যে তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ করবার আশা ও অভিলাষে আমি তপস্যা করছি তখন তিনি সখা অর্জুনের সঙ্গে যমুনা তীরে এসেছিলেন আর আমাকে গ্রহণ করেছিলেন। আমি তাঁর গৃহ পরিষ্কার কার্যে যুক্ত দাসী মাত্র।’

শ্রীমিত্রবিন্দা বললেন—‘হে শ্রীদ্রৌপদী ! আমার স্বয়ংবর হচ্ছিল।

সেইখানে শ্রীভগবান এসে সকল নৃপতিদের পরাস্ত করে সিংহবিক্রমে আমাকে পরমসুন্দর দ্বারকাপুরীতে নিয়ে এসেছিলেন। আমার ভ্রাতাগণ আমাকে তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করবার নামে অপকার করতে চেয়েছিল, তিনি তাদের পরাজিত করেছিলেন। আমি তাঁর পাদপ্রক্ষালনের সৌভাগ্য যেন জন্মজন্মান্তরে লাভ করি।'

শ্রীসত্যা বললেন—'হে শ্রীদ্রৌপদী ! আমার পিতা আমার স্বয়ংবর সভায় সমাগত নৃপতিদের পরাক্রম পরীক্ষা করবার জন্য অতি বলবান ও পরাক্রমী সপ্ত সংখ্যক বৃষ ছেড়ে রেখেছিলেন। তাতেই তাঁদের অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। শ্রীভগবান সেই সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গযুক্ত পশুদের অনায়াসে বশ করে নিয়েছিলেন আর তাদের নাকে রজ্জু স্থাপন করেছিলেন। এইভাবে শ্রীভগবান পরাক্রম প্রদর্শন করে চতুরঙ্গ সেনা ও দাসীদের সঙ্গে আমাকে দ্বারকায় নিয়ে এসেছিলেন। পথে যে ক্ষত্রিয়গণ তাঁকে বাধা দান করেছিল তাদের তিনি পরাজিত করেছিলেন। আমি তাঁর নিত্য সেবা করবার কামনা রাখি।'

শ্রীভদ্রা বললেন—'হে শ্রীদ্রৌপদী ! শ্রীভগবান আমার মামাতো ভাই। আমার চিত্ত তাঁর শ্রীচরণে অনুরক্ত ছিল। যখন আমার জনক তা জানতে পারলেন তখন তিনি স্বয়ং শ্রীভগবানকে আমন্ত্রণ করে অক্ষৌহিণী সেনা ও অসংখ্য দাসীর সঙ্গে তাঁর পাদপদ্মে আমাকে সম্প্রদান করেছিলেন। আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন আমি যেন তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সংস্পর্শ পাই। তাতেই আমার পরম কল্যাণ সাধিত হবে।'

শ্রীলক্ষ্মণা বললেন—'হে রানীদেবী ! দেবর্ষি নারদ নিত্য শ্রীভগবানের অবতার ও লীলার সংকীর্তন করে থাকেন। তা শ্রবণ করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে শ্রীলক্ষ্মীদেবী সমস্ত লোকপালদের ত্যাগ করে শ্রীভগবানকেই বরণ করেছিলেন। আমার চিত্ত শ্রীভগবানের চরণে আসক্ত হয়ে গিয়েছিল। হে সাধ্বী ! আমার পিতা বৃহৎসেন আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যখন তিনি আমার মনের কথা জানলেন তখন আমার ইচ্ছাপূরণ হেতু এক উপায় স্থির করলেন। হে মহারানী ! যেমন পাণ্ডববীর অর্জুনকে লাভ করবার জন্য

আপনার জনক স্বয়ংবরে মৎস্যবেধের আয়োজন করেছিলেন। তেমন আমার পিতাও করেছিলেন। আমার স্বয়ংবরের বৈশিষ্ট্য ছিল যে মৎস্য বাইরে থেকে দৃশ্যমান ছিল না কেবল জলেই তার প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছিল। এই স্বয়ংবরের সংবাদ পেয়ে নৃপতিগণ নিজ গুরুদের নিয়ে এসেছিলেন। পরাক্রম ও মহত্ত্ব বিচার করে আমার পিতা তাঁদের অভ্যর্থনাও করেছিলেন। স্বয়ংবর সভাতে বহু নৃপতিগণ ধনুকে জ্যারোপণ করতে সমর্থ না হয়ে বসে পড়েছিলেন। অনেকে ধনুকের জ্যারোপণ কালে ধনুকের আঘাতে আহতও হয়েছিলেন। জরাসন্ধ, অম্বষ্ঠরাজ, শিশুপাল, ভীমসেন, দুর্যোধন ও কর্ণ জ্যারোপণ করেছিলেন বটে কিন্তু মৎস্যের সঠিক অবস্থান নিরূপণ করতে সক্ষম হননি। পাণ্ডববীর অর্জুন জলে মৎস্যের প্রতিবিম্ব দেখে অতি সাবধানে শর নিক্ষেপ করেছিলেন—তাতে লক্ষ্যভেদ হল না, শর মৎস্যকে স্পর্শ করে চলে গিয়েছিল। অতঃপর অন্যান্য নৃপতিসকল আমাকে লাভ করবার লালসা ও লক্ষ্যভেদ করবার চেষ্টা ত্যাগ করেছিলেন।

তখন শ্রীভগবান অনায়াসে ধনুকে জ্যারোপণ করে একবার মাত্র মৎস্যের প্রতিবিম্ব দেখে শর নিক্ষেপ করে মৎস্যকে ভূমিতে নামিয়ে এনেছিলেন। তখন দ্বিপ্রহরের সর্বার্থসাধক 'অভিজিৎ' মুহূর্ত ছিল। তখন পৃথিবীতে জয়ধ্বনি হচ্ছিল ও আকাশে দুন্দুভি বাজতে শুরু করেছিল। মহান দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন। আমি তখন উত্তমরূপে সজ্জিতা হয়ে সকলের সম্মুখে শ্রীভগবানকে মাল্যদান করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, শঙ্খ, ঢোল, কাড়ানাকাড়া বেজে উঠেছিল আর নৃত্যগীত পরিবেশিত হতে শুরু হয়েছিল।

ঘটনা কামাতুর নৃপতিদের ক্রোধান্বিত করে তুলেছিল। চতুর্ভুজ ভগবান নিজ রথে আমাকে তুলে নিয়ে হস্তে শার্ঙ্গধনুক ও কবচ ধারণ করে যুদ্ধ করবার জন্য রথে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সারথি দারুক সকলের সম্মুখেই রথ দ্বারকা অভিমুখে চালিত করেছিলেন। যাঁরা রথের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন তাঁরা ভগ্নবাহু, ভগ্নপদ হয়ে যুদ্ধভূমিতে চিরবিশ্রাম লাভ করেছিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে উত্তমরূপে সুসজ্জিত দ্বারকা নগরে নিয়ে

এসেছিলেন। আমার পিতা যৌতুকরূপে বহু ধনসম্পদ, সৈন্য, দাসদাসী দিয়েছিলেন। আমি পূর্বজন্মে অবশ্যই কোনো তপস্যা করে থাকব, তাই এই জন্মে আমি আত্মারাম শ্রীভগবানের গৃহদাসী হতে পেরেছি।'

ষোড়শ সহস্র পত্নীদের হয়ে শ্রীরোহিণী বললেন—'হে শ্রীদ্রৌপদী ! ভৌমাসুর দিগ্বিজয় কালে অনেক রাজাদের পরাস্ত করে তাঁদের কন্যাসকল আমাদের নিজ মহলে বন্দী করে রেখেছিল। শ্রীভগবান তা জানতে পেরে যুদ্ধে ভৌমাসুর ও তার সৈন্যকে সংহার করেছিলেন এবং স্বয়ং পূর্ণকাম হওয়া সত্ত্বেও আমাদের উদ্ধার করেছিলেন আর পাণিগ্রহণ করে তাঁর দাসী করে নিয়েছিলেন। আমরা জন্মমৃত্যুরূপ ভবসংসার থেকে মুক্তিপ্রদানকারী তাঁর শ্রীপাদপদ্মের নিত্য স্মরণ-মনন করতাম। আমরা সাম্রাজ্য, ইন্দ্রপদ, অথবা উত্তম ভোগ, অণিমাদি ঐশ্বর্য, ব্রহ্মপদ, মোক্ষ অথবা সালোক্য, সারূপ্য আদি মুক্তি কিছুই কামনা করি না। আমরা প্রভুর শ্রীপাদপদ্মরজ নিত্য মস্তকে ধারণ করতে চাই যা তাঁর প্রিয়া লক্ষ্মীর বক্ষঃস্থলের কুমকুমের সুবাসে মণ্ডিত।

সর্বাত্মা ভক্তভয়হারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভার্যাসকলের গভীর প্রেমবৃত্তান্ত কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্য রাজমহিষীদের এবং গোপিনীগণ শ্রবণ করে অতিশয় মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গেলেন।

পাটরানীদের দৈন্যভাব প্রদর্শনের মাধুর্য অপরিসীম। তাঁরা যে শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি ! তাঁরা শ্রীভগবানের আত্মভূতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মরাম হলেও তাঁরা তাঁকে প্রেমদ্বারা বশীভূত করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

———০———

মৃত পুত্রানয়ন

পীত্বামৃতং পয়স্তস্যাঃ পীতশেষং গদাভৃতঃ।
নারায়ণাঙ্গসংস্পর্শপ্রতিলব্ধাত্মদর্শনাঃ ॥ (১০।৮৫।৫৫)

মাতা দেবকী জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সান্দীপনি মুনির আশ্রমে এক অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করেছিলেন ; তাঁরা মৃত গুরুপুত্রকে যমালয় থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এইবার কংসের দ্বারা বধ হওয়া তাঁর নিজ ছয় পুত্রের জন্য তাঁর মন কেমন করে উঠল। তিনি সজল নয়নে পুত্রদের জানালেন যে তিনি তাঁর মৃত পুত্রদের দেখতে চান।

মাতা দেবকীর ইচ্ছার কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম নিজ যোগমায়া আশ্রয় করে সুতল লোকে প্রবেশ করলেন। যখন দৈত্যরাজ বলি দেখলেন যে জগতের আত্মা এবং ইষ্টদেবতা ও তাঁর পরমপ্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরাম সুতল লোকে পদার্পণ করেছেন তখন তাঁর হৃদয় শ্রীভগবানের দর্শনলাভ নিমিত্ত আনন্দে নিমগ্ন হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করলেন। অতঃপর পরমানন্দে পরিপূর্ণ দৈত্যরাজ বলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করলেন। তাঁরা আসনে উপবেশন করলে তিনি সপরিবার শ্রীভগবানের পাদপ্রক্ষালন করে সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন। অতঃপর দৈত্যরাজ বলি বহুমূল্য বস্ত্র, আভরণ, চন্দন, তাম্বূল, দীপ, অমৃততুল্য সুস্বাদু আহার্য এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সহযোগে তাঁর পূজা করলেন এবং সপরিবার তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হলেন। দৈত্যরাজ বারে বারে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম নিজ বক্ষঃস্থল ও মস্তকে ধারণ করলেন। তাঁর হৃদয় প্রেমাতিশয্যে বিহ্বল হয়ে গেল। নেত্রযুগল আনন্দে সজল হয়ে উঠল। দেহে পুলক শিহরণ দেখা গেল। তিনি শ্রীভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন।

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে দৈত্যরাজ ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রজাপতি মরীচির পত্নী ঊর্ণার গর্ভে ছয় পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁরা সকলেই দেবতা ছিলেন। তাঁরা বিশেষ কারণে শ্রীব্রহ্মাকে উপহাস করেছিলেন। সেই পরিহাসরূপ অপরাধ হেতু শ্রীব্রহ্মা তাঁদের অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং তাঁরা অসুর যোনিতে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এইবার যোগমায়া তাঁদের সেইখান থেকে এনে দেবকীর গর্ভে রেখে দিয়েছিল এবং তাঁদের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংস তাঁদের বধ করেছিল। হে দৈত্যরাজ ! দেবকী মাতা সেই পুত্রদের জন্য শোকাতুর হয়ে রয়েছেন। তাঁরা এখন তোমার কাছে আছেন। আমরা মাতার শোক নিবারণ হেতু তাঁদের এখান থেকে নিয়ে যাব। অতঃপর তাঁরা শাপমুক্ত হয়ে আনন্দে নিজ লোকে গমন করবেন। তাঁদের নাম স্মর, উদ্‌গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃৎ ও ঘৃণি। আমার প্রসাদে তাঁদের আবার সদ্‌গতি হয়ে যাবে।'

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৌন ধারণ করলেন। দৈত্যরাজ বলি আবার তাঁর পূজার্চনা করলেন। অবশেষে বালকদের নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দ্বারকায় ফিরে এলেন ; আর বালকদের মাতা দেবকীকে অর্পণ করলেন। মৃত সন্তানদের পুনরুজ্জীবিত দেখে দেবকী দেবীর অন্তর বাৎসল্য স্নেহে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সন্তানদের আলিঙ্গন দান ও ক্রোড়ে স্থান দিয়ে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। তাঁর পয়োধর দুগ্ধযুক্ত হওয়ায় সন্তানগণ মাতৃদুগ্ধ পান করে ধন্য হল। মাতৃদুগ্ধ পান করে ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শের ফলে তাঁদের আত্মসাক্ষাৎকার হয়ে গেল। তাঁরা অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মাতা দেবকী, পিতা বসুদেব এবং শ্রীবলরামকে প্রণাম করলেন। তদনন্তর সকলের সামনেই তাঁরা দেবলোকে প্রস্থান করলেন।

দেবকী দেবী আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে মৃতপুত্রগণ ফিরে এল আবার চলেও গেল। ঘটনাকে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা কৌশলই মনে করলেন। মাতার ইচ্ছায় অসীম পরাক্রমশালী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ এক অনন্ত ও অদ্ভুত পরাক্রম অভিনীত হয়ে গেল।

———o———

পরমধাম দর্শন

নিশাম্য বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুকম্পিতম্॥ (১০।৮৯।৬৩)

একদিন দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণীর সন্তান প্রসবকালে ভূমিষ্ঠ হয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হল। ব্রাহ্মণ নিজ মৃত সন্তানের দেহ নিয়ে রাজপ্রাসাদের দ্বারে এসে তা সেইখানেই রেখে বিলাপ করে বলতে লাগল—'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমার পুত্রসন্তানের মৃত্যুর কারণ দেশের ব্রাহ্মণদ্রোহী, ধূর্ত, কৃপণ ও বিষয়ী রাজার কর্মফলই। যে রাজা হিংসায় প্রবৃত্ত, দুঃশীল ও অজিতেন্দ্রিয় হয় তাকে রাজারূপে সেবাকারী প্রজাগণ দরিদ্র হয়ে কেবল দুঃখই ভোগ করে ও সংকটের সম্মুখীন হয়ে থাকে।' ব্রাহ্মণের এইভাবে নয় পুত্রের মৃত্যু হলে প্রতিবারই সে শিশুর মৃতদেহ রাজপ্রাসাদের দ্বারে ফেলে গেল আর ওই একই কথা বলে গেল। নবম বালকের মৃতদেহ নিয়ে যখন সে রাজপ্রাসাদের দ্বারে এসে ওই কথা বলল তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুনও বসে ছিলেন।

এইকথা শ্রবণ করে অর্জুন বলে উঠলেন—'ব্রহ্মন্! আপনার নিবাসস্থান দ্বারকায় কোনো ধনুর্ধারী ক্ষত্রিয় বাস করে না ? মনে হচ্ছে যেন সকলে যদুবংশীয়গণ ব্রাহ্মণ হয়ে প্রজাপালন না করে যজ্ঞ করতে বসে আছেন। আপনার মানসিক অবস্থার কথা আমি বুঝি। আমি আপনার সন্তানকে রক্ষা করব। আর অসমর্থ হলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব—এই প্রতিজ্ঞা করলাম।'

ব্রাহ্মণ বললেন—'হে অর্জুন ! দ্বারকায় শ্রীবলরাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ধনুর্ধারী শ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন, অদ্বিতীয় যোদ্ধা অনিরুদ্ধ আছেন। তাঁরা যখন আমার সন্তানদের রক্ষা করতে সমর্থ হননি তখন এই কাজ জগদীশ্বরদের পক্ষেও

কঠিন মনে হয়। তুমি তা করবে ? এ তো তোমার মূর্খামি। এই কথার উপর আমার আদৌ ভরসা নেই।'

অর্জুন উত্তর দিলেন—'ব্রহ্মন্! আমি বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন নই। আমি গাণ্ডীবধারী বিশ্ববিখ্যাত অর্জুন। আমার ক্ষমতা আপনি জানেন না। প্রয়োজনে আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও পরাজিত করে আপনার সন্তানকে এনে দেব।'

যখন ব্রাহ্মণীর প্রসবকাল সমাগত হল তখন ব্রাহ্মণ কাতর হয়ে অর্জুনের কাছে ছুটে এসে বললেন—'এইবার তুমি আবার সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করো।' ব্রাহ্মণের কথা শুনে অর্জুন শুদ্ধ জলে আচমন করে ভগবান শংকরকে স্মরণ করলেন আর দিব্যাস্ত্রসকল আহ্বান করলেন ; গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করে তিনি তা হস্তে তুলে নিলেন। অর্জুন শরসকলকে বিভিন্ন অস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে আসন্ন প্রসবকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললেন। শিশু যথাসময়ে জন্মগ্রহণ করল, ক্রন্দন করল কিন্তু চোখের সম্মুখেই সশরীরে আকাশপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল। শিশুকে রক্ষা করা গেল না দেখে ব্রাহ্মণ অর্জুনকে মিথ্যাবাদী আদি বলে যৎপরোনাস্তি অপমান করলেন।

অতঃপর অর্জুন যোগবলে তৎক্ষণাৎ সংযমনপুরীতে গমন করলেন যেখানে ভগবান যমরাজ নিবাস করেন। সেইখানে শিশুকে না দেখতে পেয়ে তিনি ক্রমশ ইন্দ্র, অগ্নি, নির্ঋতি, সোম, বায়ু ও বরুণ আদি পুরীসকল এবং অতলাদি পাতালে, স্বর্গের উপরের মহর্লোকাদি অন্যান্য স্থানেও গেলেন। কিন্তু কোথাও শিশুকে খুঁজে পেলেন না। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে সক্ষম না হয়ে তিনি অবশেষে অগ্নিতে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে এই কার্যে বিরত করে বললেন—'ভাই অর্জুন ! তুমি শুধু শুধু নিজেকে তিরস্কার করছ। আমি ব্রাহ্মণের সমস্ত মৃত সন্তানদের এখনই উপস্থিত করছি। যারা আজ তোমার নিন্দায় মুখর তারাই আমাদের নির্মল কীর্তির জয়গান করবে।'

এইবার সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে নিজ দিব্য রথে আরোহণ করে পশ্চিম দিকে গমন করলেন। তিনি সপ্তপর্বতবিশিষ্ট সপ্ত

দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র ও লোকালোক পর্বত লঙ্ঘন করে নিবিড় অন্ধকারে প্রবেশ করলেন। নিবিড় অন্ধকারে রথের শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প এবং বলাহক নামক চার অশ্বগণ পথ নির্ধারণে অক্ষম হয়ে গেল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর সহস্র সহস্র সূর্যসম তেজস্বী সুদর্শন চক্রকে পথ দেখিয়ে চলতে আদেশ দিলেন। জ্যোতির্ময় চক্র সেই নিবিড় অন্ধকারকে পরাভূত করে এগিয়ে চলল। অবশেষে সুদর্শন চক্রদ্বারা আলোকিত পথে রথ সেই অন্ধকারের শেষ সীমানায় পৌঁছল। সেই স্থান অতীব জ্যোতির্ময় ছিল ; তা দেখে অর্জুন তাঁর চোখ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন।

অতঃপর শ্রীভগবানের রথ দিব্য জলরাশিতে প্রবেশ করল। প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহ হেতু জলে বিশালাকার তরঙ্গ উঠছিল যা অতি সুন্দর মনে হচ্ছিল। সেইখানে এক অতীব সুন্দর প্রাসাদ দেখা গেল যা জ্যোতির্ময় মণিমুক্তাখচিত স্তম্ভে পরিশোভিত ছিল। সেই স্থান উজ্জ্বল জ্যোতিতে আলোকিত ছিল। সেই মহলে ভগবান অনন্ত বিরাজমান ছিলেন। তাঁর শরীর অতীব ভয়ানক ও অদ্ভুত ছিল। তাঁর সহস্র মস্তকের উপর পরম সুন্দর মণি ছিল। অর্জুন দেখলেন যে অনন্ত ভগবানের সুখপ্রদ শয্যায় সর্বব্যাপী মহাপ্রভাবসম্পন্ন পরম পুরুষোত্তম ভগবান বিষ্ণু বিরাজমান রয়েছেন। নবনীরদ অঙ্গ শ্যামসুন্দর কৌষেয় পীতাম্বর ধারণ করে ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রসন্নবদন ও দীর্ঘায়ত মনোহর নয়নযুক্ত। তাঁর রত্নমণ্ডিত কিরীটকুণ্ডলের কান্তিতে তাঁর কুঞ্চিত অলকাবলি আলোকিত ছিল। তিনি আজানুলম্বিত বাহু, সুডৌল সুন্দর অষ্টবাহু। তাঁর গলায় কৌস্তুভ, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন আর কণ্ঠে ছিল মনোরম আজানুলম্বিত বনমালা। অর্জুন দেখলেন যে শ্রীভগবানের নন্দ-সুনন্দাদি পার্ষদ, সুদর্শন চক্র আদি আয়ুধ ও পুষ্টি, শ্রী, কীর্তি ও অজা—এই চার শক্তি এবং সম্পূর্ণ শক্তিসকল তাঁর সেবা করছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বরূপ শ্রীভগবানকে প্রণাম করলেন। অর্জুন তাঁকে দর্শন করে ভীত হয়ে গিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম করলেন দেখে অর্জুনও তাঁকে প্রণাম করলেন। এইবার তাঁরা বদ্ধাঞ্জলি করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এইবার ব্রহ্মাদি লোকপালদের প্রভু শ্রীভগবান স্মিতহাস্য সহকারে

বললেন—'হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে অর্জুন ! আমি তোমাদের দেখবার জন্যই ব্রাহ্মণের সন্তানদের নিজের কাছে আনিয়ে নিয়েছিলাম। তোমরা আমার ইচ্ছায় ধর্মরক্ষা হেতু পৃথিবীতে অবতাররূপে গমন করেছ। ভূভার স্বরূপ সেই দৈত্যদের সংহার করে তোমরা অতি শীঘ্র আমার কাছে ফিরে এসো। তোমরা দুইজন ঋষিবর নর এবং নারায়ণ। যদিও তোমরা পূর্ণকাম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ তবুও তোমরা জগতের কল্যাণে ধর্মাচরণ করো।'

শ্রীভগবানের কাছে এইরূপ আদেশ লাভ করে তাঁরা তাঁকে আবার প্রণাম নিবেদন করলেন এবং অতি আনন্দে ব্রাহ্মণ সন্তানদের নিয়ে একই পথে দ্বারকায় ফিরে এলেন। ব্রাহ্মণের সন্তানগণ আয়ু অনুসারে বড় হয়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন তাদের পিতার হস্তে অর্পণ করলেন।

ভগবান বিষ্ণুর সেই পরমধামকে দর্শন করে অর্জুন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অনুভব করলেন যে জীবের সকল শক্তিসামর্থ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপায় প্রাপ্ত হওয়া।

———o———

যদু-দত্তাত্রেয় সংবাদ

এবং সঞ্জাতবৈরাগ্যো বিজ্ঞানালোক আত্মনি।

বিচরামি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গোঽনহঙ্কৃতিঃ॥ (১১।৯।৩০)

একবার ধর্মের মর্মজ্ঞ রাজা যদু দেখলেন যে এক ত্রিকালদর্শী তরুণ অবধূত ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে বিচরণ করছেন। তিনি অবধূতকে প্রশ্ন করলেন — 'ব্রহ্মন্! আপনি সামর্থ্যযুক্ত, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সুনিপুণ কিন্তু কোনো কর্মে প্রবৃত্ত নন। যখন সংসারে অধিকাংশ ব্যক্তি কাম ও লোভের দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে তখন আপনি নির্বাসন হয়ে কেমন করে নিত্য অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভূতিতে নিমগ্ন থাকেন ? আপনার কথায় যেন মধুক্ষরণ হয়। আপনার আনন্দের উৎস জানতে আমি আগ্রহী।' তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে করজোড়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মহাত্মা যদুর প্রশ্ন শুনে পরম ভাগ্যবান ব্রহ্মবেত্তা অবধূত শ্রীদত্তাত্রেয় বললেন—'রাজন্ ! আমি নিজ বুদ্ধির সাহায্যে বহু গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেছি। তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমি এই জগতে মুক্তভাবে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করি। আমি সেই গুরুদের নাম এবং তাঁদের কাছ থেকে লাভ করা শিক্ষার কথা তোমায় বলব। আমার গুরুদের নাম—'পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, সূর্য, কপোত, অজগর সর্প, সমুদ্র, পতঙ্গ, মৌমাছি, হস্তী, মধুহরণকারী ব্যাধ, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলা নামক বারবনিতা, কুরর পক্ষী, বালক, কুমারী কন্যা, শরনির্মাতা, সর্প, মাকড়সা ও কাচপোকা। আমি এই চব্বিশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেছি এবং এঁদের আচরণ থেকে ইহলোকে শিক্ষাগ্রহণ করেছি। হে বীরশ্রেষ্ঠ যযাতিনন্দন । আমি যাঁর কাছ থেকে যেমন শিক্ষা পেয়েছি তাই তোমায় বলছি।'

(১) পৃথিবীর কাছ থেকে আমি ধৈর্য ও ক্ষমার শিক্ষা নিয়েছি। মানুষ

পৃথিবীর উপর কত আঘাত হানে আর কত উৎপীড়ন করে কিন্তু পৃথিবী প্রতিশোধও নেয় না ক্রন্দনও করে না। জগতে সকল প্রাণীই নিজ প্রারব্ধানুসারে সচেষ্ট থেকে জ্ঞানে অজ্ঞানে আক্রমণ করে বসে কিন্তু পৃথিবী ধৈর্য ধারণ করে সকলকে ক্ষমা করে থাকে। তাই ধৈর্যশীল ব্যক্তি উৎপীড়নে পৃথিবীর মতন অবিচল থেকে অপরকে ক্ষমা করবে। পৃথিবীর বিকার পর্বত ও বৃক্ষ থেকে পরোপকারের শিক্ষা গ্রহণ করাও উচিত।

(২) দেহাভ্যন্তরের প্রাণবায়ু কেবল আহারের ইচ্ছা রাখে ও তা পেলেই সন্তুষ্ট হয়। তার থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করি যে খাদ্যগ্রহণ কেবল জীবন নির্বাহ হেতু ; ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য আদৌ নয়।

বায়ু নিত্য নির্লিপ্ত, কোনো বস্তুর দোষগুণ গ্রহণ করে না। সুগন্ধ, দুর্গন্ধ বহন করলেও তাতে লিপ্ত হয় না। সাধকও বিভিন্ন ধর্ম ও স্বভাবযুক্ত বিষয়ের সংস্পর্শে এসে তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না, তাতে আসক্তি ও বিদ্বেষ রাখবে না ; ব্যাধি-পীড়া, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিত্য বহন করলেও নিজেকে শরীর জ্ঞান না করে আত্মা জ্ঞান করে নিত্য নির্লিপ্ত থাকবে। এইভাবে আমি বায়ুর কাছ থেকে নির্লিপ্ত থাকবার শিক্ষা গ্রহণ করেছি।

(৩) আকাশ সর্বব্যাপী, অসঙ্গ ও অপরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ নয়)। তেমন ভাবেই বিশ্বচরাচরে অবস্থিত আত্মা (ব্রহ্ম) সর্বত্র বর্তমান অর্থাৎ সর্বজীবে ব্যাপ্ত হয়েও কোনো কিছুতেই জড়িয়ে পড়ে না। এ যেন সুতোর লাছিতে ব্যাপ্ত সুতোর মতন অখণ্ড ও অসঙ্গ থাকা। তাই আকাশ থেকে এই শিক্ষা পাই যে আত্মার বিস্তার আকাশসম চিন্তা করতে হয়। তাই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পার্থিব দেহকে আশ্রয় করলেও দেহের ধর্ম সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাকবে।

(৪) জলের কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা পেয়েছি যে সাধকের স্বভাব শুদ্ধ, স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, নির্মল, মধুর ও লোকহিতকর হওয়া উচিত। সঙ্গাদি তীর্থসমূহ যেমন দর্শনে, স্পর্শনে ও নামোচ্চারণে সকলকে পবিত্র করে তেমনভাবেই জল থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী সাধক নিজ দর্শন, স্পর্শ ও নামোচ্চারণে সকলকে পবিত্র করবে।

(৫) অগ্নি স্বভাবত তেজস্বী ও জ্যোতির্ময়। কারও তেজ তাকে দমন

করতে পারে না। তার সংগ্রহ পরিগ্রহ পাত্র নেই, তা উদরে ধারণ করে আর তা গ্রহণ করেও বিভিন্ন বস্তুর দোষে লিপ্ত হয় না। সেইভাবেই সাধক পরম তেজস্বী, তপস্যায় দেদীপ্যমান, ইন্দ্রিয় দ্বারা অপরাভূত, আহার মাত্র সংগ্রহকারী, সকল বিষয় উপভোগ করেও মন ও ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করে রাখে আর কারও দোষ ধারণ করবে না।

অগ্নি কোথাও (কাষ্ঠে) অপ্রকট আর কোথাও প্রকাশিত হয়। সাধকও কোথাও গুপ্ত আর কোথাও প্রকাশিত হয় যাতে কল্যাণকামনাযুক্ত ব্যক্তি তার উপাসনা করতে পারে। সে অগ্নিসম ভিক্ষারূপ যজ্ঞকারীর অতীত ও ভবিষ্যতের অশুভকে ভস্ম করে দেয়।

জ্ঞানী ব্যক্তি প্রদীপ্ত অগ্নিসম শ্রদ্ধা অথবা অশ্রদ্ধায় প্রদত্ত আহার্য সম ভাবে গ্রহণ করে।

সাধক বিচার করবে যে যেমন অগ্নি বিভিন্ন আকারের কাষ্ঠে অবস্থান করে বিভিন্ন আকার ধারণ করে, যা বস্তুত তার নয়, তেমনভাবেই সর্বব্যাপী মায়া রচিত কার্যকারণ রূপ জগতে ব্যাপ্ত থেকেও আত্মা সেই সকল বস্তুর নাম ও রূপের সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখেও তাদের রূপে প্রতীত হয়ে থাকে। আমি অগ্নি থেকে এইরূপ শিক্ষালাভ করেছি।

(৬) চন্দ্রের কাছ থেকে এই শিক্ষাগ্রহণ করেছি যে অজানা গতিসম্পন্ন কালের প্রভাবে চন্দ্রের কলার হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে থাকে কিন্তু চন্দ্রের কোনো পরিবর্তন হয় না ; তেমনভাবেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত অবস্থা লাভ হয় তা সব শরীরের সঙ্গেই সম্বন্ধিত, আত্মার সঙ্গে নয়।

যেমন অগ্নিশিখা অথবা দীপশিখা ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হয় আর নষ্ট হয় কিন্তু জানা যায় না তেমনভাবেই জলপ্রবাহসম বেগশীল কালদ্বারা ক্ষণে ক্ষণে প্রাণী শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়ে থাকে কিন্তু জ্ঞানাভাবে তা দেখা যায় না।

(৭) আমি সূর্যের কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে সূর্য যেমন নিজ কিরণ দ্বারা সমুদ্রের জল আকর্ষণ করে আর সময়ে তা বর্ষণও করে দেয় তেমনভাবে যোগীপুরুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা এক সময়ে বিষয় গ্রহণ করে আর

যথাসময়ে তা ত্যাগ অর্থাৎ দান করে দেয়। কোনো কালেই তার ইন্দ্রিয়ের কোনো বিষয়ে আসক্তি হয় না।

স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি জলের বিভিন্ন পাত্রে প্রতিবিম্বিত সূর্য তাতেই প্রবিষ্টসম হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেখে থাকে কিন্তু তাতে স্বরূপত সূর্য বহু সংখ্যক হয়ে যায় না ; তেমনভাবেই চল-অচল উপাধি ভেদে মনে হয় যেন প্রত্যেক ব্যক্তিতে আত্মা পৃথক পৃথক ভাবে বর্তমান। এই চিন্তা স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির নিজস্ব। বস্তুত আত্মা সূর্যের মতন একই ; স্বরূপত তাতে কোনো ভেদ নেই।

(৮) কপোত তার নিজ সন্তানদের মায়ায় মোহিত হয়ে স্বেচ্ছায় ধরা দেয় আর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দেখে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি যে সংসারের প্রবল আসক্তি পরিণামে দুঃখপ্রদ হয়। এই মানবদেহ লাভ মুক্তির অবারিত দ্বার। যে মানবদেহ লাভ করেও বিষয় ও আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণে নিজ কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে তাতেই মগ্ন থেকে জীবন যাপন করে সে কপোতের মতনই সপরিবারে কষ্ট ভোগ করে থাকে। মানব-দেহ লাভ করা কামনাবাসনা আসক্ত ব্যক্তি যেন বহু উচ্চে আরোহণ করে দ্রুত নিম্নগামী হয়ে থাকে।

(৯) প্রাণীসকল ইচ্ছা ও চেষ্টা না করে আর প্রতিহত করবার চেষ্টা করেও পূর্বকর্মানুসারে দুঃখ ভোগ করে থাকে তেমনভাবে স্বর্গে অথবা নরকে যেখানেই থাক না কেন ইন্দ্রিয়সুখ লাভও হয়ে থাকে। তাই সুখদুঃখের রহস্য জ্ঞান ধারণকারী বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার জন্য ইচ্ছা অথবা চেষ্টা করে না ; যাচনা না করে কামনা না করে অনায়াস প্রাপ্ত বস্তুদ্বারা সে সন্তুষ্ট থাকে। লব্ধ বস্তু শুষ্ক, মধুর অথবা স্বাদযুক্ত, অল্প বা অধিক যাই হোক না কেন বুদ্ধিমান পুরুষ অজগরসম তা ধারণ করে জীবনযাপন করবে এবং উদাসীন থাকবে। যদি খাদ্য লাভ না হয় তাকে প্রারব্ধ ভোগ জ্ঞানে তার জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হবে না। দেহে মনোবল, ইন্দ্রিয়বল ও দেহবল এই তিন থাকলেও সে নিশ্চেষ্ট থাকবে। নিদ্রারহিত হলেও শায়িত থাকবে এবং কর্মেন্দ্রিয় থাকলেও চেষ্টা বিরত থাকবে। অজগরের কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি।

(১০) সমুদ্রের কাছ থেকে আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে সাধক সর্বদা

প্রসন্ন ও গম্ভীর থাকবে ; তার ভাব অসীম, অপার হবে এবং কোনো কারণেই তা বিক্ষুব্ধ হবে না। সমুদ্র যেমন বর্ষাকালে বেলাভূমি অতিক্রম করে না আর গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় না তেমনভাবেই ভগবদ্‌পরায়ণ সাধক বস্তু প্রাপ্তিতে সুখে উৎফুল্ল ও দুঃখে কাতর হয় না।

(১১) আমি পতঙ্গের কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেছি। পতঙ্গ আগুনে আকৃষ্ট হয়ে তাতেই পুড়ে মরে। সেই রকম অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে ঘোর অন্ধকার নরকে পতিত হয়ে নিজ সর্বনাশ ডেকে আনে। রূপের আসক্তি মায়া মাত্র যা জীবকে ঈশ্বর অথবা মোক্ষ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত করে। যে মূঢ় কামিনীকাঞ্চন, বস্ত্র অলংকার আদি বিনাশশীল পদার্থে নিত্য আকৃষ্ট এবং তার সম্পূর্ণ চিত্তবৃত্তি সেই সকল উপভোগ করবার জন্য লালায়িত সে নিজ বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে পতঙ্গসম ধ্বংস হয়ে থাকে।

(১২) মৌমাছি বিভিন্ন পুষ্প থেকে মধুসঞ্চয় করে মৌচাকে সঞ্চয় করে রাখে কিন্তু অপরে সেই মৌচাক ভেঙে মধু নিয়ে যায়। তেমনভাবেই সাধক সকল শাস্ত্র থেকে সার বস্তু অবশ্যই আহরণ করবে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় সে করবে না। সন্ন্যাসীর কাছে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য কোনো পাত্র থাকবে না। হাত তার গ্রহণ পাত্র ও উদর তার ধারণ পাত্র হবে। সে সায়ংকালের অথবা আগামীকালের জন্য সঞ্চয় করবে না। সঞ্চয় করলেই তার জীবন মৌমাছির মতন হয়ে যাবে আর তার জন্য প্রাণ ত্যাগও করতে হতে পারে। আমি এই শিক্ষা মৌমাছির কাছে পেয়েছি।

(১৩) হস্তী যেমন হস্তিনীর স্পর্শ সুখের জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ফাঁদে পড়ে তেমনভাবে সন্ন্যাসী কাষ্ঠনির্মিত নারীও যেন না স্পর্শ করে। বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো নারীকে ভোগ্যরূপে না ভাবে, অন্যথায় সে হস্তীসম অধিক বলবান পুরুষদের দ্বারা নিগৃহীত হবে। হস্তীর কাছে আমি এই শিক্ষালাভ করেছি যে নারী সংস্পর্শের আসক্তি মানুষের বন্ধন ও মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে।

(১৪) মধু আহরণকারী ব্যাধ যেমন মৌমাছির সঞ্চিত মধু হরণ করে। সেইরূপে দান ও উপভোগ বর্জিত লোভী ব্যক্তির কষ্টার্জিত ধনও অন্য কেউ

ভোগ করে থাকে। মধুহরণকারী ব্যাধের কাছে আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে কেবল সঞ্চয় হেতু অর্থ একত্র করবে না তা সদ্ব্যবহার করবে।

(১৫) আমি হরিণের কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে অরণ্যনিবাসী সন্ন্যাসী কখনো বিষয় উদ্দীপনকারী গান শুনবে না কারণ হরিণ ব্যাধের গানে মোহিত হয়েই ধরা পড়ে যায়।

(১৬) এইবার আমি মৎস্যের কাছে লাভ করা শিক্ষার কথা বলছি। মৎস বঁড়শি সংলগ্ন মাংসের লোভে মৃত্যুবরণ করে থাকে। তেমনভাবেই খাদ্য লোভী নির্বুদ্ধি মানুষও জিভের বশীভূত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলের উপর জয়লাভ করে থাকে কিন্তু তাতে তার রসনা ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় না। খাদ্যগ্রহণ না করলে তা রসনা ইন্দ্রিয়কে আরও প্রবল করে তোলে। জিতেন্দ্রিয় হওয়ার জন্য রসনা ইন্দ্রিয়ও বশীভূত হওয়া প্রয়োজন।

(১৭) প্রাচীনকালে বিদেহনগর মিথিলায় পিঙ্গলা বারবনিতার বাস ছিল। স্বেচ্ছাচারিণী, রূপবতী পিঙ্গলা বস্ত্র-ভূষণে সেজেগুজে কোনো ধনী পুরুষকে আকৃষ্ট করবার জন্য এক রাত্রে দ্বারে প্রতীক্ষা করছিল। এইভাবে নিদ্রাশূন্য হয়ে ব্যাকুল চিত্তে তার অর্ধরাত্রি কেটে গেল। তখন সে নিজ বৃত্তিতে বৈরাগ্য অনুভব করল। তার নিজ দেহকে অপবিত্র জ্ঞান হল। সে যে এত দিন আত্মদানী, অবিনাশী এবং পরম প্রিয়তম পরমাত্মাকে ধ্যান না করে অন্য পুরুষকে কামনা করত তার জন্য তার অনুশোচনা জাগল। সে অন্য পুরুষের মিলনের আশা ত্যাগ করে শান্ত হয়ে সুখে নিদ্রাগমন করল। পিঙ্গলার কাছে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি যে আশাই পরম দুঃখ, অনাসক্তিই পরম সুখের।

(১৮) কোনো এক দুর্বল কুরর পক্ষীকে (সাদা চিল) মাংসখণ্ড নিয়ে যেতে দেখে অন্যান্য বলবান পক্ষীগণ সেই মাংসখণ্ড ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তাকে ঠোকরাতে লাগল। এইভাবে তাড়া খেয়ে যখন সেই পক্ষী মাংসখণ্ড ত্যাগ করল তখন সে সুখ লাভ করল। কুরর পক্ষীর কাছে আমার লাভ করা শিক্ষা হল যে প্রিয় বস্তুর আসক্তিই সাংসারিক দুঃখের কারণ ; আসক্তি ত্যাগ করলেই অনন্ত সুখ লাভ করা যায়।

(১৯) আমার মান অপমানের বোধ নেই এবং সাংসারিক ব্যক্তির যে সকল চিন্তা থাকে তাও নেই। আমি নিজ আত্মাতেই রমণ করি এবং তাঁর সঙ্গেই ক্রীড়া করি। এই শিক্ষা আমি বালকের কাছে লাভ করেছি। এই জগতে দুই রকমের ব্যক্তিই নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দে মগ্ন থাকে—এক নিষ্পাপ শিশু আর অন্য জন গুণাতীত পুরুষ।

(২০) আমি কুমারী কন্যার কাছেও শিক্ষা গ্রহণ করেছি। কুমারী অতিথি সৎকার নিমিত্ত গৃহাভ্যন্তরে ধান ভানছিল। শঙ্খ বলয়ে শব্দ হয়ে দৈন্যদশা পরিচায়ক ধানভানা শব্দ অতিথিদের কর্ণগোচর হচ্ছে দেখে সে একটা বলয় ছাড়া অন্য সকল ভেঙে ফেলেছিল আর স্বচ্ছন্দে অতিথি সেবা করতে সক্ষম হয়েছিল। কুমারীর কাছে আমি এই শিক্ষা লাভ করলাম যে বহুজনের একত্রে বসবাস কোলাহলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই যোগী একাকী বাস করবে।

(২১) শর নির্মাতার কাছ থেকে আমি মনের একাগ্রতার শিক্ষা গ্রহণ করেছি। শর নির্মাতা, শর নির্মাণকালে তার কাছ থেকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজা চলে গেলেও তা সে জানতে পারেনি। আসন এবং শ্বাসপ্রশ্বাসকে জয় করে বৈরাগ্য এবং অভ্যাস দ্বারা মনকে বশীভূত করে শ্রীভগবানে যুক্ত করতে হয়। মন পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাতে স্থির হয়ে গেলে তা ধীরে ধীরে কর্মবাসনার ধূলিতে বিধৌত করে দেয়। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে রজোগুণী ও তমোগুণী বৃত্তিসকল ত্যাগ করে ইন্ধন ছাড়া অগ্নিসম শান্ত হয়ে যায়। এইভাবে চিত্ত আত্মাতে নিত্যযুক্ত ও স্থির হয়ে গেলে বাইরের ও ভিতরের কোনো পদার্থের অবস্থিতি অনুভূত হবে না। এ হল যোগের কথা।

(২২) সর্পের কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে সন্ন্যাসীর সর্পসম একাকী বিচরণ করা উচিত। সংঘ অথবা মঠ নির্মাণের প্রয়োজন নেই। সন্ন্যাসী এক স্থানে নিবাস করবে না, প্রমাদ করবে না আর গুহাদিতে বাস করবে ; বাহ্য আচরণে সন্ন্যাসী চিহ্নিত হবে না। সন্ন্যাসী কারও সাহায্য গ্রহণ করবে না আর কম কথা বলবে। এই অনিত্য দেহের জন্য গৃহ নির্মাণের ঝামেলায় পড়া ব্যর্থ ও দুঃখজনক হয়ে থাকে। সর্প অপরের নির্মিত গৃহে অবস্থান করে ও আরামে কালাতিপাত করে।

(২৩) মাকড়সা নিজের লালা দিয়ে জাল প্রস্তুত করে, তার মধ্যেই

অবস্থান করে এবং তা আবার নিজেই গ্রাস করে। তেমনভাবেই পরমেশ্বর এই জগৎকে নিজ শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেন, তিনিই জীবরূপে তাতে বিহার করেন এবং আবার তা নিজের মধ্যে লীন করে নেন। শ্রীভগবানের বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করবার শিক্ষা আমি মাকড়সার কাছ থেকে লাভ করেছি। তিনিই সকলের অধিষ্ঠান। সকলের আশ্রয় ; কিন্তু স্বয়ং নিজের আশ্রয় নিজ আধারেই অবস্থান করেন। তাঁর অন্য কোনো আধার নেই। শ্রীভগবান এই বিশ্বের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ দুইই ; এই বিশ্ব তাতেই অবস্থিত এবং অন্তে তা শ্রীভগবানেই লীন হয়ে যায়।

(২৪) আমি কাচপোকা থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে যদি জীব স্নেহে, বিদ্বেষ অথবা ভয়ে জেনে শুনে একাগ্র হয়ে নিজ মন কিছুতে সংলগ্ন করে সে সেই বস্তুর স্বরূপ লাভ করে ; যেমন কাচপোকা একটি কীটকে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালে নিজ বাসস্থানে বন্দী করে রাখে এবং সেই কীট ভয়ে তার চিন্তা করতে করতে নিজ পূর্বদেহ ত্যাগ না করেই তার দেহের অনুরূপ হয়ে যায়। কংস ভয়ে, শিশুপাল দ্বেষ করে শ্রীভগবানের সারূপ্য লাভ করেছিল।

শ্রীভগবান নিজ অচিন্ত্য শক্তি মায়ার দ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, মৎস্য আদি বহু প্রকারের যোনি সৃষ্টি করলেন ; কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তখন তিনি মানব শরীর সৃষ্টি করেছিলেন। এই মানব শরীর এমন বুদ্ধিযুক্ত যে তা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করতে সক্ষম। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি শরীরের পতন না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করবে। বিষয় ভোগ তো সকল যোনিতেই সম্ভব তাই তার সংগ্রহ নিমিত্ত এই অমূল্য জীবন হারানো ঠিক নয়।

গম্ভীর বুদ্ধি অবধূত দত্তাত্রেয় রাজা যদুকে এইরূপ উপদেশ দান করে বললেন যে তিনি পূর্বোক্ত গুরুদের নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন আর তিনি বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে একাকী অহংকাররহিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করছেন। এইকথা শুনে যদুবংশের প্রবর্তক রাজা যদু সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করে সমদর্শী হলেন ও শ্রীভগবানে চিত্ত সমাহিত করলেন।

———○———

জনৈক তিতিক্ষু ব্রাহ্মণের ইতিহাস

সুখদুঃখপ্রদো নান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ।
মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ॥ (১১।২৩।৬০)

দেবগুরু বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব শ্রীভগবানকে দুর্জন ব্যক্তিগণের কৃত তিরস্কারে অনুভূত চিত্তবৈকল্য থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ জিজ্ঞাসা করায় তিনি ভক্তকে এক তিতিক্ষু ব্রাহ্মণের প্রাচীন ইতিহাস বলেন। এই বিবরণেই উদ্ধব নিজ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন। সেই বিবরণ আজও ভক্তদের সঠিক পথ নির্দেশ করে সর্বকালের সমাধানরূপে স্বীকৃত।

প্রাচীনকালে উজ্জয়িনী নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। কৃষিকার্য ও ব্যবসাসূত্রে সে প্রভূত ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছিল। ব্রাহ্মণ প্রকৃতিতে কৃপণ, কামনাবাসনা যুক্ত ও লোভী ছিল। কারণে অকারণে সে ক্রোধান্বিত হত।

ব্রাহ্মণ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও অতিথিদের সঙ্গে কখনো সদ্ব্যবহার করত না ; কারও ক্ষুধা-তৃষ্ণার তোয়াক্কা করত না। অপরিমিত ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়েও সে ধর্মকর্ম করত না। অন্যদের সুখে থাকতে দিত না, এমনকী নিজেও তা ভোগে লাগাত না। তার কার্পণ্য ও দুষ্ট স্বভাবে তার সন্তানসন্ততি, বন্ধুবান্ধব, দাসদাসী ও সহধর্মিণী—সকলেই দুঃখী থাকত এবং মনে মনে তার অনিষ্ট কামনাই করত। অতএব তার ভালো করার কেউ ছিল না। ইহলোক-পরলোক দুই স্থানেই তার পতন হয়েছিল। সে যক্ষের মতন ধনসম্পদ আগলে রাখত। বহুদিন পর্যন্ত এইরূপ জীবন যাপন করায় পঞ্চমহাযজ্ঞের ভাগী দেবতাগণ তার উপর অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের অসন্তোষে তার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত পুণ্যও ক্ষীণ হয়ে এল, যে পুণ্যবলে তার ধনসম্পদ এতদিন অক্ষত ছিল। সেই বহু পরিশ্রম ও সুকৃতি দ্বারা অর্জিত ধনসম্পদ আত্মীয়স্বজনগণ কেড়ে নিল আর কিছু চুরি হয়ে গেল। কিছু ভাগ

অগ্নি আদি দৈবী কোপে ভস্মীভূত হল। কিছু সাধারণ মানুষ দখল করে নিল আর অবশিষ্ট অংশ কর ও জরিমানা হিসেবে শাসক আদায় করে নিল। এইভাবে সেই ব্রাহ্মণের সকল ধনসম্পদ তাকে ত্যাগ করে চলে গেল। ধনসম্পদে তার না হল ধর্মলাভ আর না হল ভোগ। ধনসম্পদ হাতছাড়া হওয়ায় আত্মীয়স্বজন সকলও তার সঙ্গ ত্যাগ করল। এইবার তাঁকে এক অতি ভয়ানক চিন্তা গ্রাস করল। ধনসম্পদ বিনাশে তার অন্তর্জ্বালা হতে লাগল। মনে ধিক্কার জন্মাল। এইভাবে চিন্তা করতে করতে তার সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা ও প্রবল বৈরাগ্য হল।

এইবার ব্রাহ্মণ মনে মনে বলতে লাগল—'হায় হায় ! কেন আমি নিজেকে অনর্থক এইভাবে কষ্ট দিলাম। যে ধনসম্পদ অর্জনের জন্য আমি হাড়ভাঙা পরিশ্রম করলাম তা না ধর্মকর্মে লাগল আর না আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগে লাগল।'

প্রায়শ দেখা যায় যে কৃপণ পুরুষের ধনসম্পদে কখনো সুখ ভোগ হয় না। ইহলোকে তারা ধন উপার্জনের ও তার রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তায় জর্জরিত হয় আর মৃত্যুর পরে ধর্মপালন না করবার জন্য নরকে গমন করে। যেমন অল্প শ্বেতীর দাগ দেহের সৌন্দর্যকে ম্লান করে দেয় তেমনভাবেই অল্প লোভও যশস্বীর বিশুদ্ধ যশ ও গুণীর বিশুদ্ধ গুণ ম্লান করে দেয়। ধনার্জন, সংবর্ধন, সংরক্ষণ এবং ব্যয় কার্যে ও তার বিনাশ ও উপভোগে সর্বত্র কঠিন পরিশ্রম, ভয়, চিন্তা ও ভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়। চুরি, হিংসা, অসত্য ভাষণ, দম্ভ, শম, ক্রোধ, গর্ব, অহংকার, ভেদবুদ্ধি, বৈরী মনোভাব, অবিশ্বাস, স্পর্ধা, লাম্পট্য, জুয়া ও মাদক গ্রহণ—এই সকল মানবের ধনসম্পদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তাই কল্যাণ কামনায় যুক্ত ব্যক্তি স্বার্থ ও পরমার্থ বিরোধী অর্থ নামক অনর্থকে দূর থেকেই বিদায় সম্ভাষণ করে। ধনসম্পদ সকলকে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুব্ধ করে, ক্রুদ্ধ করে। তা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে, কলহ সৃষ্টি করে, প্রাণ নাশের কারণও হয়ে দেখা দেয়।

দেবতাদেরও আকাঙ্ক্ষিত মানবজন্ম এবং পরমশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদেহ লাভ

করেও যে তা সদ্ব্যবহার করে না সে তার প্রকৃত স্বার্থ পরমার্থ বিনাশ করে আর অশুভগতি লাভ করে। এই মানবদেহ মোক্ষ ও স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। যে তা লাভ করেও অনর্থসৃষ্টিকারী ধনসম্পদে নিত্যযুক্ত থাকে সে বুদ্ধিমান কখনো নয়। যে ব্যক্তি দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, প্রাণী, আত্মীয়স্বজন ও ধনসম্পদের অন্যান্য ভাগীদারদের তাদের ভাগ দিয়ে সন্তুষ্ট রাখে না আর নিজেও তা উপভোগ করে না সেই যক্ষসম ধনসম্পদরক্ষক কৃপণ অবশ্যই অধোগতি লাভ করে। আমি আমার কর্তব্য থেকে চ্যুত হয়েছি। আমি প্রমাদে নিজ আয়ু, ধনসম্পদ ও বলবিক্রম হারিয়েছি। বিবেকযুক্ত ব্যক্তিগণ যে সম্পদ দ্বারা মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করে থাকেন তা আমি হেলায় হারিয়েছি। এখন এই বৃদ্ধাবস্থায় কী করব ? অতিবড় বিদ্বানগণও ধনসম্পদের ব্যর্থ তৃষ্ণায় নিত্য দুঃখ ভোগ করে থাকেন।

এই মানব শরীর কালের গ্রাস মাত্র। এর ধনসম্পদে, ধনসম্পদ প্রদানকারী দেবতাদের ও ব্যক্তিদের, ভোগবাসনাসকল ও তার পূরণ-কারীদেরও পুনঃপুন জন্মমৃত্যু আবর্তে নিক্ষেপকারী সকাম কর্মে কী প্রয়োজন ? শ্রীভগবান যে আমার উপর প্রসন্ন তাতে সন্দেহ নেই কারণ তিনিই কৃপা করে আমাকে এই বোধ প্রদান করেছেন যে বৈরাগ্যই ভবসাগর অতিক্রমের একমাত্র তরণী। আমি আমার অবশিষ্ট আয়ু তপস্যায় অতিবাহিত করব আর শরীরকে বিশুষ্ক করে দেব।'

ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে পরিবর্তন এল। সে শান্ত হয়ে মৌনব্রতধারী সন্ন্যাসী হয়ে গেল। তার চিত্তে আর স্থান, বস্তু অথবা ব্যক্তির উপর আসক্তি রইল না। সে নিজ মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে বশীভূত করে ফেলল। সেই ভিক্ষু অবধূত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাকে দেখতে পেলেই দুষ্ট ব্যক্তিগণ তাকে উত্ত্যক্ত করতে লাগল। তার দণ্ড কেড়ে নিত, ভিক্ষাপাত্র ছিনিয়ে নিত। কেউ তার কমণ্ডলু, রুদ্রাক্ষমালা, কাঁথা, বস্ত্র এধার-ওধার নিক্ষেপ করত। তাকে দেবে বলে বস্ত্র দেখিয়েও দিত না। অবধূত মাধুকরী করে নগরের সীমানার বাইরে গিয়ে নদীতীরে আহার গ্রহণের প্রস্তুতিকালে তাকে দুষ্ট ব্যক্তিগণ ভয়ানক বিরক্ত করতে লাগল। তারা তার মৌনব্রত ধারণকে বুঝতে না পেরে তার উপর

বিরূপ মন্তব্য করতে লাগল। প্রহার, চোর অপবাদ, বন্ধন, বকধার্মিক রূপে টিটকারি সবই জুটে গেল তার কপালে। শীতগ্রীষ্ম আদি দৈব পীড়া আর দুর্জনদের ভৌতিক পীড়া তাকে ধর্মপালন থেকে বিচ্যুত করতে সমর্থ হল না। সবকিছুতেই সে নির্বিকার থেকে পূর্বজন্ম অথবা কৃতকর্মফল রূপে গ্রহণ করে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিত্যযুক্ত রইল। শ্রীভগবান তাকে আপন করে নিলেন।

অবশেষে সে সবদিক বিচার করে এই সত্যে উপনীত হল যে জগতে সুখ অথবা দুঃখ আসে তার প্রধান কারণ মন ; মানুষ, দেবতা, শরীর, গ্রহ, কর্ম অথবা কাল নয়, এই মনই অত্যন্ত বলবান। তা বিষয়, তার কারণ গুণসকল আর তার সঙ্গে যুক্ত বৃত্তিসকল সৃষ্টি করেছে। সেই বৃত্তি অনুসারেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বহু রকম কর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে যা জীবের গতি নির্ধারণ করে। সমস্ত চেষ্টা মনের। তার সঙ্গে বসবাস করলেও আত্মা কিন্তু নিষ্ক্রিয় ; তা জ্ঞানশক্তি প্রধান। জীবের সনাতন সখা ও দর্শক মাত্র। দান ধর্মপালন, যম, বেদাধ্যয়ন, সৎকর্ম ও ব্রহ্মচর্যাদি ব্রত সকল মনকে একাগ্র করবার জন্যই হয়ে থাকে।

সুখ অথবা দুঃখ পঞ্চভূত নির্মিত শরীর দ্বারা সৃষ্ট ও অনুভূত হয়ে থাকে। সেখানে আত্মা তো দর্শক মাত্র। দেবতাসকল শরীরে বর্তমান। তাই দেবতাকে সুখ অথবা দুঃখ দেওয়া বা অনুভব করা কেমন করে সম্ভব ?

আত্মাকে সুখ অথবা দুঃখের কারণ ভাবলে ভাবতে হয় আত্মা তো অভিন্ন ? আত্মা ছাড়া অন্য কেউ তো আদৌ নেই। আর অন্য যদি কিছু প্রতীত হয় তা তো মিথ্যা। তাতে সুখ, দুঃখ অথবা ক্রোধ হয় কেমন করে ?

যদি গ্রহকে সুখ অথবা দুঃখের নিমিত্ত ধরা হয় তাতে তো আত্মার কিছুই এসে যায় না। গ্রহের প্রভাব তো শরীরের উপর হয়ে থাকে কিন্তু আত্মা তো গ্রহ অথবা দেহের থেকে পৃথক এক সত্তা। তাহলে ক্রোধ করব কার উপর ? সুতরাং গ্রহের উপর ক্রোধ করেই বা লাভ কী ?

যদি কর্মকে সুখ অথবা দুঃখের জন্য দায়ী করা হয় তাতে তো আত্মার কিছু এসে যায় না। আত্মা তো নির্বিকার ও সাক্ষীমাত্র। সুখ অথবা দুঃখ তো

একান্তভাবেই অচেতন শরীরের হয়ে থাকে।

কাল সুখ অথবা দুঃখের কারণ হতে পারে না কারণ কাল তো আত্মস্বরূপই। অগ্নি অগ্নিকে দহন করে না তেমনভাবেই আত্মস্বরূপ কাল নিজ আত্মাকে সুখ অথবা দুঃখ দিতে পারে না। আত্মা শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ আদি দ্বন্দ্বের অতীত। আত্মা প্রকৃতির স্বরূপ, ধর্ম, কার্য, লেশ, সম্বন্ধ ও গন্ধ সকলরহিত। তাই আত্মার কোনোরকম দ্বন্দ্বের স্পর্শ হয় না। তাতো জন্মমৃত্যু চক্রে আবর্তনকারী অহংকারেরই হয়ে থাকে। যে এই কথা জানে সে কোনো নিমিত্তে ভীত হয় না। প্রাচীনকালের মহান ঋষিমুনিগণ এই পরমাত্মনিষ্ঠার শরণাগত থাকতেন। তাই তাঁর শরণাগত থেকে মুক্তি ও প্রেমপ্রদাতা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবার দ্বারা দুরন্ত অজ্ঞানসাগরকে অনায়াসে পার করা যায়। এই হল সার বস্তু।

ধনসম্পদ হারিয়ে ব্রাহ্মণের কল্যাণই হয়েছিল। তার সমস্ত ক্লেশের অবসান হয়েছিল। সে বৈরাগ্য অবলম্বন করে সন্ন্যাস নিয়ে জগতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে লাগল। দুষ্টদের প্ররোচনা তাকে প্রভাবিত করল না। সে নিজ ধর্মে অটল থেকে পরমানন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শ্রীভগবান যখন প্রেমময়, তাঁর শরণাগত থাকলে আর কাকে ভয় হবে ?

এই বৃত্তান্ত উদ্ধবকে বলে শ্রীভগবান তার বৃত্তিসকল তাঁতে তন্ময় করে দিতে বলেছিলেন। তিনি এও বলেছিলেন যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে মনকে বশীভূত করে তাতে নিত্যযুক্ত থাকাই সমস্ত যোগসাধনার সার বস্তু। তাঁর উদ্ধবকে উপলক্ষ করে এ হল সকল ভক্তদের দেওয়া উপদেশ ; প্রেমময় আহ্বান।

———o———

মায়ার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ

মহামরকতশ্যামং শ্রীমদ্বদনপঙ্কজম্।

কম্বুগ্রীবং মহোরস্কং সুনাসং সুন্দরভ্রুবম্॥ (১২।৯।২২)

মৃকণ্ড ঋষির পুত্র মার্কণ্ডেয়। পিতা পুত্রের সকল সংস্কার নির্দিষ্ট সময়েই করলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়ন করে তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে সম্পন্ন হয়ে গেলেন। তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করে শান্তভাবে অবস্থান করতেন। মস্তকে প্রলম্বিত জটা ছিল। বল্কল পরিধান করে হস্তে কমণ্ডলু ও দণ্ড ধারণ করতেন। তাঁর অঙ্গে যজ্ঞোপবীত ও মুঞ্জ মেখলা শোভায়মান থাকত। তাঁর সম্বল ছিল কৃষ্ণাজিন, রুদ্রাক্ষমালা ও কুশ। সেই সকল তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করবার জন্যই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সায়ংসন্ধ্যা অগ্নিহোত্র, সূর্যোপস্থান, গুরুবন্দনা, ব্রাহ্মণ সৎকার, মানস পূজা এবং 'আমি পরমাত্মারই স্বরূপ'—এইরূপ ভাব রেখে শ্রীভগবানের আরাধনা করতেন। তিনি সায়ংসন্ধ্যা ভিক্ষা যাচনা করে শ্রীগুরুর চরণে নিবেদন করে দিতেন এবং মৌন হয়ে যেতেন। শ্রীগুরুর আদেশ হলে তিনি একবার খাদ্য গ্রহণ করতেন, না হলে উপবাস করতেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় এইরূপ তপস্যা ও স্বাধ্যায়তে যুক্ত থেকে কোটি বৎসর শ্রীভগবানের আরাধনা করেছিলেন এবং সেই মৃত্যুকেও জয় করেছিলেন যা অতি বড় যোগীদের পক্ষেও কঠিন ছিল। শ্রীমার্কণ্ডেয়-এর মৃত্যুবিজয় প্রত্যক্ষ করে ব্রহ্মা, ভৃগু, শংকর, দক্ষ প্রজাপতি, ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রগণ ও মানব, দেবতা, পিতৃপুরুষগণ ও অন্য সকল প্রাণী অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী এবং যোগী শ্রীমার্কণ্ডেয় এইভাবে তপস্যা স্বাধ্যায় এবং সংযম আদির দ্বারা অবিদ্যাদি সকল ক্লেশ নিবারণ করে শুদ্ধান্তঃকরণে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মার ধ্যান করতে লাগলেন। যোগী মার্কণ্ডেয় মহাযোগ দ্বারা নিজ চিত্ত ভগবানের

স্বরূপের সঙ্গে যুক্ত রাখলেন। এইভাবে সাধনা করতে করতে ছয় মন্বন্তর কাল কেটে গেল।

সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্র যখন শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যার কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি শঙ্কিত ও ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি তাই তপস্যাতে বিঘ্ন দান করতে আরম্ভ করলেন। তিনি এই কর্মে শ্রীমার্কণ্ডেয় আশ্রমে গন্ধর্ব, অপ্সরা, কাম, বসন্ত, মলয়ানিল, লোভ ও মদকে পাঠালেন। আশ্রম ছিল হিমালয়ের উত্তরে যেখানে পুষ্পভদ্রা নামক নদী প্রবাহিত ও চিত্রা নামক শিলা বর্তমান। শ্রীমার্কণ্ডেয় আশ্রম অতি পবিত্র স্থান চতুর্দিকে সবুজ বৃক্ষরাশির শোভা ও তারপর লতাগুল্ম অলংকরণ। বৃক্ষ সমাবেশের মাঝে পুণ্যাত্মা ঋষিগণের নিবাস। নির্মল জলাশয় সকল ঋতুতেই পরিপূর্ণ থাকে। ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের পঞ্চম স্বরে কুহুতান, মত্ত ময়ূরের পাখা বিস্তার করে কলানৈপুণ্য প্রদর্শনকারী নৃত্য আর মত্ত পক্ষীদের নির্মল ক্রীড়াবিন্যাস সমস্ত পরিবেশকে নিত্য আনন্দময় করে রাখে।

এমন পবিত্র আশ্রমে ইন্দ্র প্রেরিত বায়ুর প্রবেশ ঘটল। বায়ু, শীতল ঝরনা থেকে ক্ষুদ্রাকার জলবিন্দু সংগ্রহ করল ও সুগন্ধিত পুষ্পদলকে আলিঙ্গন করে কামভাবকে উত্তেজিত করে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে লাগল। কামদেবের প্রিয় সখা বসন্তও ধীরে ধীরে নিজ মায়া বিস্তার করল। সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় চন্দ্র মনোহর কিরণজাল বিস্তার করতে লাগল। লতা আলিঙ্গনে আবদ্ধ বৃক্ষের ডাল ধরণি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফল-ফুল গুচ্ছ সকল অতি নয়নাভিরাম হয়ে উঠল। বসন্তের সাম্রাজ্য দেখে কামদেবের সেইখানে প্রবেশ হল। তাঁর সঙ্গে গীতবাদ্যে পারদর্শী গন্ধর্বগণ এবং স্বর্গের বহু অপ্সরাগণ চলেছিল। কামদেব তাদের মধ্যমণি হয়ে হস্তে পুষ্পধনুক ও সম্মোহন বাণ নিয়ে এগোলেন।

তখন মার্কণ্ডেয় মুনি অগ্নিহোত্র করে শ্রীভগবানের উপাসনা করছিলেন। তাঁর নেত্রকপাট বন্ধ ছিল। তিনি অগ্নিদেবসম মূর্তিমান হয়ে বসেছিলেন। অপ্সরাদের নৃত্য, গন্ধর্বদের গীতবাদ্য, মুনির ধ্যান ভঙ্গ করতে চেষ্টা করতে লাগল। কামদেব এইবার তাঁর পুষ্পনির্মিত ধনুকে পঞ্চমুখ শর স্থাপন

করলেন। ইন্দ্রপ্রেরিত বসন্ত ও লোভ মুনির মনকে বিচলিত করবার চেষ্টা করতে লাগল। অপ্সরা পুঞ্জিকস্থলী কাম উদ্দীপক ছলাকলা প্রয়োগ করল। কিন্তু সবই বিফলে গেল। কামদেব নিজ সেনাসহ পরাজিত ও নিস্তেজ হয়ে ফিরে গেলেন।

মার্কণ্ডেয় মুনি তপস্যা, স্বাধ্যায়, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা শ্রীভগবানে চিত্ত সংলগ্ন করবার চেষ্টা করছিলেন। এইবার তাঁর উপর কৃপা বর্ষণ করবার জন্য মুনিজন-নয়ন-মনোহর নরোত্তম নর এবং ভগবান নারায়ণ আবির্ভূত হলেন। একজন গৌরবর্ণ আর অন্যজন শ্যামবর্ণ। তাঁদের নয়ন আয়ত প্রস্ফুটিত কমলসম ছিল। চতুর্ভুজ অঙ্গে একজনের ছিল মৃগচর্ম আর অন্যজনের বল্কল। ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি দেবতাদের পূজ্য নর-নারায়ণ হস্তে কুশ, অঙ্গে যজ্ঞোপবীত, দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করে ছিলেন। হস্তে বেদও ছিল। দীর্ঘদেহ নর-নারায়ণ ভগবানের দেহ থেকে বিদ্যুৎসম পীতকান্তি নির্গত হচ্ছিল। মার্কণ্ডেয় মুনি দেখলেন যে ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ নর-নারায়ণের আগমন হয়েছে। তিনি আসন থেকে উঠে ধরণির উপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তাঁর অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূত হল, নয়নযুগল প্লাবিত হল। তাঁদের আসন দান করে পরমপ্রীতি সহকারে মার্কণ্ডেয় মুনি পাদ-প্রক্ষালন করলেন ; অতঃপর অর্ঘ্য, চন্দন, ধূপ ও মাল্য আদি দ্বারা তাঁদের পূজার্চনা করলেন। তদনন্তর তিনি তাঁদের স্তুতি করতে লাগলেন।

ভগবান নারায়ণ তখন মার্কণ্ডেয় মুনিকে বললেন—'হে সম্মানিত শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি ! তুমি একাগ্রতা, তপস্যা, স্বাধ্যায়, সংযম ও আমার ভক্তিতে সিদ্ধি লাভ করেছ। তুমি তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা করে নাও।' মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—'আপনার মনোহর স্বরূপ দর্শনেই আমি কৃতকৃত্য হয়ে গিয়েছি। আমি ধন্য হয়ে গিয়েছি। আপনার আদেশ অনুসারে এক বর যাচনা করছি। আমি সেই মায়া দর্শন করতে চাই যাতে মোহিত হয়ে সকল লোক ও লোকপাল অদ্বিতীয় বস্তু ব্রহ্মে বহু প্রকারের ভেদাভেদ দর্শন লাভে সমর্থ।' ভগবান 'তথাস্তু' বলে বদরিকাশ্রম গমন করলেন।

মার্কণ্ডেয় মুনি ভগবানের মায়া দর্শন নিমিত্ত অপেক্ষারত রইলেন। তিনি

সেই চিন্তায় এমন নিমগ্ন হয়ে ছিলেন যে ভগবানের পূজার্চনার কথাও তাঁর বিস্মরণ হয়ে গেল। একদিন সন্ধ্যাকালে পুষ্পভদ্রা নদীতীরে মার্কণ্ডেয় মুনি ভগবানের উপাসনায় তন্ময় ছিলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠল। অতি ভয়ংকর শব্দে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল। আকাশে ভয়াবহ মেঘ দেখা গেল। মুহুর্মুহু বজ্রপাত হতে লাগল। রথদণ্ডসম স্ফীত জলধারা পৃথিবীর উপর পড়তে লাগল। মার্কণ্ডেয় মুনি দেখলেন চতুর্দিক থেকে চারটি সমুদ্র পৃথিবীকে গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে আসছে। ঝড়ে সমুদ্রে বিশালাকার ঢেউ উঠতে লাগল আর সমুদ্রে ঘূর্ণিজল দেখা গেল। কর্ণবিদারণকারী ভয়ানক শব্দে চতুর্দিক ভরে গেল। সামুদ্রিক জলচর প্রাণীগণকে অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করতে দেখা গেল। তখন সর্বত্র জলময় হয়ে গেল। মনে হল যেন জলরাশিতে কেবল ধরণি নয় স্বর্গও ডুবে যাচ্ছে। প্রবল বেগে বায়ুপ্রবাহ ও মুহুর্মুহু ব্রজপাত সম্পূর্ণ জগৎকে সন্তপ্ত করে তুলল। যখন মার্কণ্ডেয় মুনি দেখলেন যে সেই জলপ্রলয়ে সমগ্র পৃথিবী নিমজ্জিত হল তিনি প্রাণীসমূহের সহিত নিজেও ভীত হলেন আর উদাসীন হয়ে গেলেন। তাঁর সম্মুখে প্রলয় সমুদ্রের ভয়ংকর জলপ্রাচীর ভেঙে পড়ছিল। তিনি সমুদ্রতে দ্বীপ, বর্ষপর্বত সহিত সমস্ত পৃথিবীকে নিমজ্জিত হতে দেখলেন। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ স্বর্গ, জ্যোতির্মণ্ডল (গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাসকল) এবং দিকের সঙ্গে ত্রিলোক জলে নিমজ্জিত হয়ে গেল। তখন একমাত্র মহামুনি মার্কণ্ডেয়ই জীবিত রইলেন। তখন তিনি উন্মত্ত দৃষ্টিহীনসম জটা বিস্তার করে ইতস্তত প্রাণ রক্ষা হেতু ছুটে বেড়াতে লাগলেন। তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল ছিলেন। জলচর হিংস্র প্রাণীগণ তাঁকে আক্রমণ করতে লাগল। তিনি বায়ুর ও জলপ্রাচীরের আঘাতে সন্তপ্ত হলেন। ইতস্তত ছুটতে ছুটতে তিনি অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তিনি ক্লান্ত ছিলেন। তাঁর পৃথিবী ও আকাশের স্মৃতিও রইল না। ঘূর্ণিজল, জলপ্রাচীরের প্রবল আঘাত, জলচর প্রাণীদের পরস্পরের উপর আক্রমণ তাঁকে শোকগ্রস্ত ও মোহগ্রস্ত করে তুলল। এইভাবে মার্কণ্ডেয় মুনি বিষ্ণুভগবানের মায়ার প্রভাবে মোহিত হয়ে রইলেন। প্রলয়কালের সমুদ্রে বিচরণ করতে করতে লক্ষ-কোটি বৎসর কেটে গেল।

একদিন তিনি পৃথিবীর এক দ্বীপের উপর এক ক্ষুদ্র বটবৃক্ষ দেখতে পেলেন। সেই বৃক্ষে সবুজ পাতা ও লাল ফল শোভা পাচ্ছিল। বটবৃক্ষের ঈশান কোণে একটি ডাল ছিল তাতে পত্রদ্বারা রচিত একটি দোলা তিনি দেখতে পেলেন। তারই মধ্যে অতি সুন্দর এক শিশু শায়িত ছিল। সেই শিশুর অঙ্গ থেকে উজ্জ্বল আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছিল যাতে সেই স্থান আলোকময় হয়ে ছিল। শিশু মরকতমণিসম শ্যামবর্ণ ছিল। বদনমণ্ডলে তার অপূর্ব সৌন্দর্য ছিল। শিশুর গ্রীবা চিত্তাকর্ষক, শুক চঞ্চুসম সুন্দর নাসিকা ও মনোহর ভ্রূযুগলসম্পন্ন ছিল। কুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ অলকাবলী কপোলকে অনুপম সৌন্দর্য প্রদান করেছিল ও তা শ্বাস-প্রশ্বাসে আন্দোলিত হচ্ছিল। শিশু অঙ্গে যেন অনন্ত সৌন্দর্যের সমাবেশ ছিল। শিশু নিজ করকমলযুগল দ্বারা চরণকমল ধারণ করে তা মুখ দিয়ে লেহন করছিল। এই দিব্য দৃশ্য মার্কণ্ডেয় মুনিকে বিস্ময়ান্বিত করল।

সেই দিব্য শিশুর দর্শন লাভেই মার্কণ্ডেয় মুনির সমস্ত ক্লান্তির অবসান হল। আনন্দে তাঁর হৃদয়কমল ও নেত্রকমল প্রস্ফুটিত হয়ে গেল। অঙ্গে অনুভূত হল পুলক শিহরণ। তিনি শিশুর পরিচয় জানবার জন্য তার সমীপে গমন করলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি তখনও শিশুর সমীপে উপনীত হননি তিনি শিশুর নাসাপথে মশকের ন্যায় তার উদরে প্রবেশ করে গেলেন। তিনি শিশুর উদরের ভিতর সেই সকল সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করলেন যা তিনি প্রলয়ের পূর্বে দেখেছিলেন। তিনি মোহের বশীভূত হয়ে কিছুই বিচারে সক্ষম হলেন না। তিনি শিশুর উদরে আকাশ, অন্তরীক্ষ, জ্যোতির্মণ্ডল, পর্বত, সমুদ্র, দ্বীপ, বর্ষ, দিকসকল, দেবতা, দৈত্য, বন, দেশ, নদীসকল, নগর, খনি, কৃষকদের গ্রাম, কুঁড়েঘর, আশ্রম, বর্ণ, তাদের আচার ব্যবহার, পঞ্চমহাভূত, ভূত নির্মিত প্রাণীদেহ ও পদার্থ, অনেক যুগ, কল্প ভেদে যুক্ত কাল আদি সব কিছু দেখলেন। তিনি জগতের ব্যবহারের দেশ, কাল, বস্তুসকলও দেখতে পেলেন। তিনি হিমালয় পর্বত, পুষ্পভদ্রা নদী, তার তীরবর্তী নিজ আশ্রম ও তথায় বসবাসকারী ঋষিদেরও দেখলেন। এইভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বকে দেখতে দেখতেই তিনি সেই দিব্য শিশুর প্রশ্বাসে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং আবার

প্রলয়কালীন সমুদ্রে এসে পড়লেন। তিনি দেখলেন যে সমুদ্রের মধ্যে পৃথিবীর দ্বীপে সেই বটবৃক্ষ আগের মতনই রয়েছে এবং পাতার দোলায় সেই শিশু শায়িত আছে। তার অধরে প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ মৃদুমন্দ মুচকি হাসি ছিল এবং শিশু প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রীমার্কণ্ডেয়র দিকে দেখছিল। এইবার মার্কণ্ডেয় মুনি শিশুরূপে ক্রীড়ারত ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানকে আলিঙ্গন দান করবার জন্য অতি কষ্টে তাঁর কাছে যেতে চাইলেন। তিনি শিশুরূপী ভগবানের নিকটে পৌঁছাবার পূর্বেই শিশু অন্তর্হিত হয়ে গেল এবং মার্কণ্ডেয় মুনি দেখলেন যে তিনি পূর্ববৎ আশ্রমে উপবিষ্ট রয়েছেন।

অতঃপর আকাশ পথে হরপার্বতীর আগমন হল। ভগবান শংকর অতঃপর শুদ্ধাত্মা মার্কণ্ডেয় মুনির হৃদয়ে প্রবেশ করেন। মুনিবর ভগবান শংকরকে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সহযোগে পূজার্চনা করলেন ; সঙ্গে তিনি মহাদেবীরও পূজা করেন। দেবদেব মহাদেবের কাছ থেকে তিনি এই বর লাভ করেন— 'তোমার সমস্ত ভক্তি প্রতিনিয়ত অধিষ্ঠিত থাকবে। তোমার পবিত্র যশ কল্প পর্যন্ত প্রসারিত হবে। তুমি অজর, অমর হবে। তোমার ব্রহ্মতেজ সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। তুমি সমস্ত জ্ঞানের এক অধিষ্ঠানরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত স্বরূপ স্থিতি লাভ করবে। তুমি পুরাণের আচার্যরূপে পূজিত হবে।'

মার্কণ্ডেয় চরিত্র এইভাবে ভগবান চক্রপাণির প্রভাব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।

———o———

॥ শ্রীহরিঃ ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচিপত্র

(১) 1118 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী)
(২) 763 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)
(৩) 556 গীতা-দর্পণ (বোর্ডবাইন্ডিং)
(৪) 13 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (পদচ্ছেদ, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ)
(৫) 1393 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (মূল শ্লোক ও বঙ্গানুবাদ, বোর্ডবাইন্ডিং)
(৬) 496 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (মূল শ্লোক ও বঙ্গানুবাদ)
(৭) 1444 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (ক্ষুদ্রাকারে, বোর্ডবাইন্ডিং)
(৮) 1455 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (লঘু আকারে)
(৯) 1736 গীতা প্রবোধনী
(১০) 395 গীতা-মাধুর্য
(১১) 954 শ্রীরামচরিতমানস (গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত, অখণ্ড সংস্করণ)
(১২) 1577 শ্রীমদ্ভাগবত (প্রথম খণ্ড)
(১৩) 1744 শ্রীমদ্ভাগবত (দ্বিতীয় খণ্ড)
(১৪) 1785 ভাগবতের মণিমুক্তো
(১৫) 1662 শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(১৬) 1574 সংক্ষিপ্ত মহাভারত (প্রথম খণ্ড)
(১৭) 1660 সংক্ষিপ্ত মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড)
(১৮) 1603 উপনিষদ্
(১৯) 1604 পাতঞ্জলযোগ
(২০) 275 কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়
(২১) 1456 ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়
(২২) 1119 ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?
(২৩) 1306 কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি
(২৪) 1102 অমৃত-বিন্দু
(২৫) 1305 প্রশ্নোত্তর মণিমালা
(২৬) 1122 মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?
(২৭) 1784 প্রেমভক্তিপ্রকাশ তথা ধ্যানাবস্থায় প্রভুর সঙ্গে বার্তালাপ
(২৮) 1115 তত্ত্বজ্ঞান কি করে হবে ?
(২৯) 816 কল্যাণকারী প্রবচন
(৩০) 1460 বিবেক চূড়ামণি
(৩১) 1454 স্তোত্ররত্নাবলি
(৩২) 1303 সাধকদের প্রতি
(৩৩) 1452 আদর্শ গল্প সংকলন
(৩৪) 1453 শিক্ষামূলক কাহিনী
(৩৫) 276 পরমার্থ পত্রাবলী
(৩৬) 903 সহজ সাধনা
(৩৭) 955 তাত্ত্বিক প্রবচন
(৩৮) 956 সাধন এবং সাধ্য

(৩৯) 1478 মানব কল্যাণের শাশ্বত পথ
(৪০) 1541 সাধনার দুটি প্রধান সূত্র
(৪১) 1358 কর্ম রহস্য
(৪২) 1580 অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়
(৪৩) 1651 হে মহাজীবন ! হে মহামরণ !!
(৪৪) 1469 সর্ব সাধনার সারকথা
(৪৫) 1322 শ্রীশ্রীচণ্ডী
(৪৬) 1496 পরলোক ও পুনর্জন্মের সত্য ঘটনা
(৪৭) 1415 অমৃত বাণী
(৪৮) 428 আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন
(৪৯) 312 আদর্শ নারী সুশীলা
(৫০) 625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম
(৫১) 762 গর্ভপাত করানো কি উচিত আপনিই ভেবে দেখুন
(৫২) 1293 আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি পালনীয় কর্তব্য
(৫৩) 1103 মূলরামায়ণ ও রামরক্ষাস্তোত্র
(৫৪) 296 সৎসঙ্গের কয়েকটি সারকথা
(৫৫) 450 ঈশ্বরকে মানব কেন ? নাম জপের মহিমা ও আহার শুদ্ধি
(৫৬) 449 দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া ও গুরুতত্ত্ব
(৫৭) 330 ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৫৮) 451 মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া
(৫৯) 443 সন্তানের কর্তব্য
(৬০) 626 হনুমানচালীসা
(৬১) 469 মূর্তিপূজা
(৬২) 848 আনন্দের তরঙ্গ
(৬৩) 849 মাতৃশক্তির চরম অপমান
(৬৪) 1140 ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব
(৬৫) 1319 কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা
(৬৬) 1359 পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি
(৬৭) 1356 সুন্দরকাণ্ড
(৬৮) 1513 মূল্যবান কাহিনী
(৬৯) 1579 সাধনার মনোভূমি
(৭০) 1581 গীতার সারাৎসার
(৭১) 1659 শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম
(৭২) 1743 শ্রীশিবচালীসা
(৭৩) 1742 শরণাগতি
(৭৪) 1786 মূল শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয়রামায়ণম্
(৭৫) 1795 মনকে বশ করার কয়েকটি উপায় ও আনন্দের তরঙ্গ
(৭৬) 1797 স্তবমালা
(৭৭) সত্যনিষ্ঠ সাহসী বালক-বালিকাদের কথা
(৭৮) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (মূল) ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

বৃহৎ আকারে সচিত্র কাহিনী

(৭৯) 1075 ওঁ নমঃ শিবায়
(৮০) 1787 মহাবীর হনুমান
(৮১) 1043 নবদুর্গা
(৮২) 1096 কানাই
(৮৩) 1097 গোপাল
(৮৪) 1098 মোহন
(৮৫) 1123 শ্রীকৃষ্ণ
(৮৬) 1292 দশাবতার
(৮৭) 1439 দশমহাবিদ্যা
(৮৮) 1495 ছবিতে চৈতন্য লীলা
(৮৯) 1652 নবগ্রহ